465325

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-চরিতচর্চার মূল্যায়ন

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-চরিতচর্চার মূল্যায়ন

পিএইচ ডি ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

CFT

উপস্থাপনায়
মোঃ নুরুন্নবী

Dhaka University Library
465325

465325

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-চরিতচর্চার মূল্যায়ন

পিএইচ ডি ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপনায়
মোঃ নুরুন্নবী

তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন

465325

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এপ্রিল ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা–১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯২০-৭৩/৬২৯০, ৬২৯১

DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
Phone : 9661920-73/6290, 6291

স্মারক নং ....

Date. ১৬/৮ ....20 ২২

প্রত্যয়নপত্র

গবেষক মোঃ নুরুন্নবী কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত 'বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)- চরিতচর্চার মূল্যায়ন' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি :

১. এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত।

২. এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম।

৩. এটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে এই শিরোনামে পিএইচ ডি ডিগ্রীর জন্য কোন গবেষণা সন্দর্ভ লিখিত হয়নি।

এ গবেষণা সন্দর্ভটি পিএইচ ডি ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখেছি এবং পিএইচ ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

(প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)- চরিতচর্চার মূল্যায়ন শীর্ষক আমার পিএইচ ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ মূলত এ গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক আমার প্রিয় শিক্ষক, বিদগ্ধ পণ্ডিত প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন স্যারের চিন্তার ফসল। তাঁর অনুপ্রেরণা, দিক-নির্দেশনা, পরামর্শ না থাকলে এ গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা কখনো সম্ভব হতো না। আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ ও চির ঋণী। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিফল দান করুন।

ড. মুজতবা হোছাইন স্যারের প্রিয়ভাজন ছাত্র বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক ড. আবু তাহের মুহাম্মদ মান্‌জুর আমার গবেষণাকর্মের শিরোনাম নির্বাচনে সহায়তা থেকে শুরু করে এর সমাপ্তি পর্যন্ত নানা স্তরে নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর ঋণ শোধরানোর নয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারি অধ্যাপক অগ্রজ সীরাত গবেষক ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন সময়ে সময়ে এই গবেষণায় যে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন তা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এ অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন করতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, ন্যাশনাল আর্কাইভস, জাতীয় গ্রন্থ ভবন, ড. আবু তাহের মুহাম্মদ মান্‌জুর সহ বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের নিজস্ব লাইব্রেরী থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা ছাড়া এ গবেষণার কাজ সম্পন্ন করা সহজ হতো না। সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমার বড় খালু বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ্ব মোঃ মঈন উদ্দীন গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক এবং মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। আমি তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা মিয়া ও মাতা মিসেস কামরুন্নাহার গবেষণার বিষয়ে নিয়মিত খোঁজ খবর নিয়ে যোগ্য অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন। আল্লাহ তাঁদের হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন।

মারওয়াহ ট্রাভেলসের স্বত্ত্বাধিকারী আলহাজ্ব হাফেয মাহবুব আলাউদ্দীন-এর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। বিশেষত তাঁর প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ আমার কাজকে সহজতর করেছে।

আমার স্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার কাজী শাকিলা বেগম সব সময় আমাকে গবেষণা কাজ সম্পাদনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

সর্বোচ্চ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে প্রিয় ছোট ভাই শামসুল হুদা সোহেল কম্পিউটারে শেষ মুহূর্তের প্রয়োজনীয় কাজ দরদী মন নিয়ে না করে দিলে থিসিস জমা দেয়া সম্ভবই হতো না। আমি তার এ শ্রম আল্লাহ যেন কবুল করে নেন তা-ই দু'আ করছি। ইহ-পরকালীন জগতে তার কল্যাণকর সফলতা কামনা করছি।

আমার গবেষণাকর্মে বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে উত্তম বিনিময় এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রদর্শিত পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

(মোঃ নূরুন্নবী)

১৫. ০৪. ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রত্যয়নপত্র/ ৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকার/ ৫

সংকেত সূচী/ ৭

ভূমিকা/ ৮-১১

অধ্যায় : এক

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চা : সূচনা ও বিকাশ.....১২-৩৮

অধ্যায় : দুই

হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চা বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধ : বিষয় বিন্যাস ও পর্যালোচনা.....৩৯-২০২

[১. কুর'আনের আলোকে, ২. আবির্ভাব ও 'আরব, ৩. নূরে মুহাম্মদী, ৪. নবুওয়াত, খতমে নবুওয়াত ও রিসালাত, ৫. রাহমাতুল্লিল আলামীন, ৬. ইসলাম প্রচার, ৭. ব্যক্তিগত, দৈনন্দিন ও পারিবরিক জীবন, ৮. ইবাদত, ৯. বিশিষ্টতা, ১০. মি'রাজ, ১১. পোশাকনীতি, ১২. শ্রেষ্ঠত্ব, ১৩. আদর্শ, ১৪. মানবতা-উদারতা, ১৫. ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের সাথে সম্পর্ক, ১৬. নারী ও শিশু, ১৭. চিকিৎসা বিধান, ১৮. তাসাওউফ, ১৯. জিহাদ, যুদ্ধবন্দী ও প্রতিরক্ষা, ২০. হিজরত ও মাদানী জীবন, ২১. সমাজ ব্যবস্থা, ২২. শিক্ষাব্যবস্থা, ২৩. অর্থব্যবস্থা, ২৪. রাষ্ট্র, প্রশাসন, পররাষ্ট্র ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা, ২৫. সংস্কারক, ২৬. উম্মাহ, ২৭. জীন, ২৮. ভাষণ, ২৯. স্বপ্ন, ৩০. ভবিষ্যত বাণী, ৩১. সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা, ৩২. পার্থিব শেষ দিনগুলো, ৩৩. হায়াতুন্নবী, ৩৪. শাফি'উল মুযনিবীন, ৩৫. আখলাক, ৩৬. হুব্বে রাসূল (সা), ৩৭. সন্ত্রাস সংঘর্ষ ও শান্তি, ৩৮. মানবাধিকার, ৩৯. মু'জিযা, ৪০. মূল্যায়ন এবং ৪১. সীরাত চর্চা]।

অধ্যায় : তিন

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চা : মূল্যায়ন ও দিকনির্দেশনা.....২০৩-২১৯

[*মূল্যায়ন*- ইসলাম পূর্ব-যুগ; মানবীয়তা ও নবুওয়তী বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন প্রসঙ্গ; 'অনন্য ও অনুপম' শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গ; যুদ্ধ ও জিহাদ প্রসঙ্গ; 'আইন প্রণেতা' প্রসঙ্গে; বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনা; 'ধার্মিক ও সাম্প্রদায়িক' প্রসঙ্গে; 'অসাধারণ' 'বিরল' শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে; রাসূলুল্লাহ (সা) চরিত উপস্থাপনায় যথার্থবোধ প্রসঙ্গে; ইসলামী জ্ঞান ও ভাষা প্রয়োগের ভারসাম্যতা প্রসঙ্গে।

সমস্যা ও দিকনির্দেশনা- ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যাচার ও অপবাদ; পাশ্চাত্যে বিকৃত সীরাতচর্চার প্রভাব; অপসংস্কৃতির প্রভাব; সামাজিক কুসংস্কার; গণসচেতনা সৃষ্টি; রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব; মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন; বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়ক ওয়েব সাইট; স্বতন্ত্র সীরাত লাইব্রেরী; সীরাত ইন্সটিটিউটের প্রয়োজনীয়তা]।

উপসংহার.....২২০-২২৪

গ্রন্থপঞ্জি.....২২৫-২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

(সা)	:	সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম
(রা)	:	রাযিয়াল্লাহু 'আনহু
(আ)	:	'আলায়হিস সালাম
(রহ)	:	রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি
হি	:	হিজরী
খ্রি	:	খ্রিষ্টাব্দ
ব	:	বঙ্গাব্দ
ই ফা বা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
জা সী ক বা	:	জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ
বা এ	:	বাংলা একাডেমী
ঢা বি	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তা বি	:	তারিখ বিহীন
লি	:	লিমিটেড
খ	:	খণ্ড
পৃ	:	পৃষ্ঠা
সং	:	সংস্করণ
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
সম্পা.	:	সম্পাদিত
অনূ.	:	অনূদিত
মৃ	:	মৃত
আনু.	:	আনুমানিক
Ed.	:	Edition
Op. Cit.	:	Open Cito
ibid.	:	Ibidem
P	:	Page
pp	:	Pages
N. d.	:	Nil dated
Vol.	:	Volume

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশ্বজগতের অপার রহমত, বিশ্বমানবতার প্রদীপ্ত আলোর দিশারী। তাঁর মাধ্যমে সুমহান ইসলাম লাভ করেছে পরিপূর্ণতা। তিনি সর্বকালের, সর্বযুগের মানবজাতির শাশ্বত আদর্শ। কুর'আন মজীদে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে 'রাহমাতুল্লিল 'আলামীন', 'উসওয়াতুন হাসানা', 'খাতেমুন নাবিয়্যিন', 'সাইয়্যিদুল মুরসালীন' অভিধায় অভিহিত করেছেন। তিনি সাম্য, মৈত্রী, মানবাধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বে স্বর্ণযুগের স্রষ্টা। তাঁর আগমনে বিশ্বমানবতা লাভ করেছে কল্যাণময় পথের দিক-নির্দেশনা, তাওহীদের শিক্ষা, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা, মানবিক মূল্যবোধ ও মর্যাদার গভীর চেতনা। তাঁর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব, অনুপম চরিত্র মাধুর্য, অতুলনীয় সততা, ভারসাম্যপূর্ণ আচার-আচরণ ও কর্মপন্থা, উন্নততর আদর্শ, মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরম আস্থা ও নির্ভরতা, সৃষ্টির প্রতি অগাধ প্রেম ও ভালোবাসা, সুদৃঢ় মনোবল ও সুন্দরতম জীবনব্যবস্থা উপস্থাপনে তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট মানুষ হিসেবে মহিমাময় মর্যাদায় অভিষিক্ত ও অধিষ্ঠিত।

মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনের ঘটনাবলী, বৈশিষ্ট্য, মুসলিম উম্মাহ্‌র ভেতরে তো অবশ্যই, বাইরেও দেশে-দেশে বিভিন্ন ভাষিক সমাজে আলোচিত-পর্যালোচিত হয়েছে। মহানবী (সা)-এর জীবনচরিত বা সীরাতুন্নবী (সা) রূপে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র জীবনাদর্শের অনুসারী। এ ভূ-খণ্ডের কবি-সাহিত্যিকগণ সুদীর্ঘকাল থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র জীবনী রচনা করে আসছেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর (রা)-এর শাসনামলে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি) বাংলায় আবূ ওয়াক্কাস মালিক ইব্‌ন ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাফ (রা,) 'উরওয়া ইব্‌ন আছাছা (রা), কায়স ইব্‌ন হুযায়ফা (রা) ও আবূ কায়স ইব্‌ন আল-হারিস (রা) প্রমুখ সাহাবীর আগমন ঘটে। এ সময় থেকেই হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এ দেশের মানুষের আগ্রহ বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে তা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে, আলোচনা ও বিশ্লেষণের বিষয়ে পরিণত হতে থাকে। এ ধারা আজও বলিষ্ঠভাবে অব্যাহত রয়েছে।

ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভকালে (১২০৩ খ্রি) বঙ্গে মুসলিম বিজয় অর্জিত হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমূহ কল্যাণ সাধিত হয়। এদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে তুর্কীদের হাতে। ফলে এদেশে ক্রমাগত ইসলামী পরিবেশ গড়ে ওঠে। মধ্যযুগের (পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী) বাংলাদেশে যে বিপুল ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হয় রাসূলচরিত এবং তৎসংক্রান্ত কাব্য অন্যতম শাখা।

বাংলাদেশে প্রধানত বাংলা গদ্য সহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-চরিতচর্চা ব্যাপকভাবে হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে 'মুহাম্মদ (সা)' শব্দ সর্বপ্রথম কখন ব্যবহৃত হয় এ নিয়ে গবেষকগণ ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেন নি। তবে বিভিন্ন বিশ্লেষণ থেকে ধারণা করা যায়, রামাই পণ্ডিত রচিত শূন্য পুরানের নিরঞ্জনের রুষ্মা (১২৯৫ খ্রি) কবিতায় 'মুহাম্মদ' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে হযরত মুহাম্মদ (সা)-চরিতচর্চা একটি বিশেষ মর্যাদামণ্ডিত ধারা হিসেবে চিহ্নিত। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন ও আর্দশের মূল্যায়নধর্মী রচনা এদেশের সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতিতে সুদীর্ঘকাল ধরে ব্যাপক অবদান রেখে চলছে।

মুহাম্মদ (সা)-চরিতচর্চা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এ ধারায় সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্য, মতভিন্নতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা)-চরিতচর্চায় কোথাও যুক্তি, কোথাও ভক্তি, আবার কোথাও এ দু'য়ের সমন্বয়, কোথাও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দৃষ্টিগোচর হয়। সীমিত ক্ষেত্রে হলেও যুক্তির নিরিখে মুহাম্মদ (সা)-চরিত রচনাও লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকের মিশনারীদের রচিত মুহাম্মদ (সা)-চরিত রচনাসমূহ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অবমূল্যায়ন ও বিদ্দিষ্ট। ঐ শতকের সপ্তম-অষ্টম দশকে হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখকদের রচিত মুহাম্মদ (সা) জীবনীসমূহ সমন্বয়বাদী চেতনার ফসল।

বাংলা সাহিত্যের সীরাত গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করলে এই স্বচ্ছ ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়ে কাব্য সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ রচিত হয় নি। এসব কাব্যে মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শেরও খণ্ডিত রূপ উপস্থাপিত হয়েছে। গদ্য সাহিত্যের গ্রন্থাবলীতেও রাসূল (সা)-কে পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপন করা অনেকাংশে সম্ভব হয় নি। কোন কোন গ্রন্থে কেবল রাসূল জীবনী, কোনটাতে খণ্ডিত আদর্শ, আবার কোনটায় রয়েছে যুদ্ধ কিংবা কোন বিশেষ ঘটনাবলীর উপস্থাপনা। প্রবন্ধ সাহিত্যে রাসূল (সা) উপস্থাপনায় রয়েছে অংশ বিশেষের বহুল আলোচনা। সার্বিকভাবে মুহাম্মদ (সা)-কে সমাজ জীবনের কার্যকরী ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপনে বাংলা সাহিত্যে দীনতা এখন স্পষ্ট।

বাংলাদেশে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) চর্চার বহুমুখী ধারাসমূহের অন্যতম প্রবন্ধ সাহিত্য বর্তমানে ব্যাপকতা লাভ করেছে। সঙ্গত কারণে এ ধারাটি বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার দাবী রাখে। এখানকার জন-জীবনের সাথে সর্বোচ্চ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এ ধারার সার্বিকভাবে মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে পিএইচ ডি পর্যায়ে এ গবেষণাকর্মের অবতারণা।

এ গবেষণাকর্ম কার্যোপযোগী গবেষণা ধারার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে কার্যোপযোগী গবেষণার ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক ইত্যাদি ধাপসমূহ অনুসৃত হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রধানত ১৯৬৩ সাল থেকে সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষ্যে প্রতি বছর মাসিক পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা, দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র এবং স্মারক গ্রন্থসমূহে হযরত মুহাম্মদ (সা) বিষয়ক প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়ে আসছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-চরিত বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সাহিত্যের এ ধারায় মুহাম্মদ (সা)-কে আংশিকভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। রয়েছে ভাষাগতও নানা দুর্বলতা। কোন কোন বিষয়ে অধিক সংখ্যক প্রবন্ধ রচিত হচ্ছে। আবার কোন বিষয়ের প্রতি লেখকদের নজরই যেন যাচ্ছে না। বিশেষত বিগত ২০ বছরের প্রবন্ধ পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয়েছে, এ ধারায় সমকালীন সমস্যার আলোকে মুহাম্মদ (সা) চর্চা প্রাধান্য পাচ্ছে এবং তা যৌক্তিকও।

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণাকর্মে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-চরিতচর্চা যথোচিত করার লক্ষ্যে বিরাজিত যাবতীয় অসম্পূর্ণতা চিহ্নিত করে গবেষণার আলোকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-চরিতচর্চার মূল্যায়ন শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভ সমাপনে অভিসন্দর্ভকে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। শুরুতে ভূমিকায় অভিসন্দর্ভ রচনার উদ্দেশ্য, পরিধি ও বিষয়বস্তুর বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

অধ্যায় : এক-এর শিরোনাম *বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চা : সূচনা ও বিকাশ।*

এ অধ্যায়ে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সূচনা এবং সাহিত্যের এ শাখায় হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চার সূচনা ও বিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চায় বিভিন্ন মাসিক, স্মরণিকা, স্মারক গ্রন্থ এবং মাইলফলক পত্রিকাসমূহের অবদান উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় : দুই-এর শিরোনাম *হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চা বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধ : বিষয় বিন্যাস ও পর্যালোচনা।* এ অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) বিষয়ক ৬ শতাধিক বাংলা প্রবন্ধকে প্রবন্ধের শিরোনামের ভিত্তিতে ৪১টি বিষয়ে বিন্যাস করে পর্যালোচনা করা হয়েছে। শিরোনামসমূহ হচ্ছে, ১. কুর'আনের আলোকে, ২. আবির্ভাব ও 'আরব, ৩. নূরে মুহাম্মদী, ৪. নবুওয়াত, খতমে নবুওয়াত ও রিসালাত, ৫. রাহমাতুল্লিল আলামীন, ৬. ইসলাম প্রচার, ৭. ব্যক্তিগত, দৈনন্দিন ও পারিবরিক জীবন, ৮. ইবাদত, ৯. বিশিষ্টতা, ১০. মিরাজ, ১১. পোশাকনীতি, ১২. শ্রেষ্ঠত্ব, ১৩. আদর্শ, ১৪. মানবতা-উদারতা, ১৫. ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের সাথে সম্পর্ক, ১৬. নারী ও শিশু, ১৭. চিকিৎসা বিধান, ১৮. তাসাওউফ, ১৯. জিহাদ যুদ্ধবন্দী ও প্রতিরক্ষা, ২০. হিজরত ও মাদানী জীবন, ২১. সমাজব্যবস্থা, ২২. শিক্ষাব্যবস্থা, ২৩. অর্থব্যবস্থা, ২৪. রাষ্ট্র, প্রশাসন, পররাষ্ট্র ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা, ২৫. সংস্কারক, ২৬. উম্মাহ, ২৭. জীন, ২৮. ভাষণ, ২৯. স্বপ্ন, ৩০. ভবিষ্যত বাণী, ৩১. সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা, ৩২. পার্থিব শেষ দিনগুলো, ৩৩. হায়াতুন্নবী, ৩৪. শাফিউল মুযনিবীন, ৩৫. আখলাক, ৩৬. হুব্বে রাসূল (সা), ৩৭. সন্ত্রাস সংঘর্ষ ও শান্তি, ৩৮. মানবাধিকার, ৩৯. মু'জিযা, ৪০. মূল্যায়ন, এবং ৪১. সীরাত চর্চা। প্রতিটি বিষয়ে কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং কিছু প্রবন্ধের শিরোনাম উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতের আগ্রহী গবেষকগণ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের গভীরতা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারেন।

অধ্যায় : তিন-এর শিরোনাম *বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ চরিতচর্চা : মূল্যায়ন ও দিকনির্দেশনা।* এ অধ্যায়ে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চার সার্বিক মূল্যায়ন করে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কিত রচনায় লেখকদের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি ও এ সংশ্লিষ্ট দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ হচ্ছে, ***লেখার মান মূল্যায়ন প্রসঙ্গে*** ইসলাম পূর্ব যুগ; মানবীয়তা ও নবুওয়তী বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন প্রসঙ্গ; 'অনন্য ও অনুপম' শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গ; যুদ্ধ ও জিহাদ প্রসঙ্গ; 'আইন প্রণেতা' প্রসঙ্গে; বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনা; 'ধার্মিক

Dhaka University Institutional Repository

ও সাম্প্রদায়িক' প্রসঙ্গে; 'অসাধারণ' 'বিরল' শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে; রাসূলুল্লাহ (সা) চরিত উপস্থাপনায় যথার্থবোধ প্রসঙ্গে; ইসলামী জ্ঞান ও ভাষা প্রয়োগের ভারসাম্যতা প্রসঙ্গে। এ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিত গবেষক ও লেখকগণ একটি পথনির্দেশনা পাবেন।

সমস্যা ও দিকনির্দেশনা– ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যাচার ও অপবাদ; পাশ্চাত্যে বিকৃত সীরাতচর্চার প্রভাব; অপসংস্কৃতির প্রভাব; সামাজিক কুসংস্কার; গণসচেতনা সৃষ্টি; রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব; মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন; বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়ক ওয়েব সাইট; স্বতন্ত্র সীরাত লাইব্রেরী; সীরাত ইন্সটিটিউটের প্রয়োজনীয়তা। চিহ্নিত সমস্যাসমূহ এ ধারাটিকে আরো গতিশীল করতে ভূমিকা রাখবে।

অভিসন্দর্ভের শেষাংশে রয়েছে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি। উপসংহারে এ অভিসন্দর্ভের সারনির্যাস তুলে ধরা হয়েছে এবং গ্রন্থপঞ্জিতে অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যবহৃত গ্রন্থ ও সাময়িকী ও সংবাদপত্রসমূহের পূর্ণ বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : এক
বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চা
সূচনা ও বিকাশ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র জীবন ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অজস্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে বিশ্বসাহিত্য ভাণ্ডার। আমাদের এ জনপদে ইসলামের দাওয়াত আসার সাথে সাথেই বাংলা ভাষার কবিগণ তাদের রচনায় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চরিত্র মাধুরী তুলে ধরেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিগণ কবিতার মাধ্যমে তাঁদের নবী-প্রেমের আবেগ ও আর্তিকে তুলে ধরেছেন। আধুনিককালে এ ধারা আরো বেগবান হয়েছে। বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে। মুসলিম সাহিত্যিকগণ নানা কারণে গদ্য সাহিত্য রচনার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন অনেক পরে। তাঁদের প্রথমদিকের সীরাত বিষয়ক কাজগুলো অনুবাদের মাধ্যমে সাধিত হয়েছে। আঠারো শতকের শেষের দিকে সীরাত বিষয়ে দু' একটি মৌলিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেলেও এগুলো কালোত্তীর্ণ হয়নি। মূলতঃ উনিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশক থেকে গদ্যে নবীচরিত রচনার বিকাশ ঘটে। বাংলা গদ্য ধারার একটি সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ হচ্ছে প্রবন্ধ সাহিত্য। মূলত গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসের সাথে প্রবন্ধ সাহিত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন :

> প্রকৃতপক্ষে পর্তুগীজরাই পদ্য-পরিপ্লাবিত বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম গদ্যের ব্যবহার করেন। অবশ্য, খৃস্টধর্ম প্রচার করিতে গিয়াই তাঁহাদিগকে এই কার্যে হাত দিতে হইয়াছিল। ১৫৯৯ খৃস্টাব্দে ফাদার সোসা [Father Sosa] একটি খৃস্ট ধর্মীয় প্রচার-পুস্তিকা বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেন। এখন ইহার অস্তিত্ব লোপ পাইলেও দোম এন্তনিও দ্যা রোজারিও নামক এক বাঙ্গালি হিন্দুর [ধর্মত্যাগ-১৬৬৩] ব্রাহ্মণ–রোমান ক্যাথলিক সংবাদ এখনও বর্তমান আছে।[১]

উনবিংশ শতকের একেবারে শুরুতে ১৮০১ সালে কোম্পানী কর্মচারীদের বাংলাভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। বস্তুত এ কলেজ হতেই আধুনিক বাংলা ভাষা তথা বাংলা গদ্যের সূচনা হয়। উইলিয়াম কেরী এবং তার অধীনে ৮ জন হিন্দু পণ্ডিত বাংলা শিক্ষাদানে নিযুক্ত হন। মিশনারী সুলভ মনোভাব নিয়ে এ দেশের হিন্দু মুসলমানদের খ্রিষ্টান বানানোর তাগিদে তারা যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ধারার উন্মেষ পর্বে এক কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বস্তুতঃ উনিশ শতকের মিশনারীগণ কর্তৃক রচিত রাসূলুল্লাহ (সা) বিষয়ক

---

১. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *মনীষা মঞ্জুষা*, ৩য় খ, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাগুলো কুৎসাপূর্ণ ও বিষোদগারমূলক রচনা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলা গদ্যে সীরাতগ্রন্থ রচনায় এগিয়ে আসেন মুসলিম লেখকগণ, এমনকি এ কাজে কয়েকজন হিন্দু লেখকও এগিয়ে আসেন। মধ্যযুগে তিনটি ইউরোপীয় জাতি- পর্তুগীজ, স্প্যানিশ এবং ইংরেজ বাংলাদেশ অঞ্চলে আসে, এদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থ রোজগার করা এবং খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস প্রচার করা। ইংরেজরা এ দেশের শাসন ব্যবস্থা হাতে পাওয়ার পর পরই খ্রিষ্টান মিশনারিরা এদেশে অবাধে মিশনারি তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এরা বাংলাদেশ অঞ্চলে আসে এবং ইংরেজ সরকারের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের দোষ-ত্রুটি এবং খ্রিষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে মুসলিম তরুণদের বিপথগামী করার ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চেতনা, স্বকীয়তাবোধ ও আত্মমর্যাদা লোপ পেতে থাকে।[২]

পর্তুগীজরা দেশের নানাস্থানে তারা গীর্জা স্থাপন করে এবং বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রায় তিনশত বছর তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম তথা ধর্মান্তরকরণ চালিয়েছিল।[৩] ফরাসীরা চন্দননগরে কুঠি স্থাপনের (১৬৮৮) পর সেখানে অগাস্টিনিয়ান মিশনারিরা ক্যাথলিক গীর্জা প্রতিষ্ঠা করে এবং সমগ্র বাংলাদেশ অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল ধরে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করে।

উইলিয়ম কেরী ১৭৯৩ সালে বাংলাদেশ অঞ্চলে আসেন এবং হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠা (১৮০০ খ্রি) করেন। মিশনারীরা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের আহবান জানায়। কেরী, মাশম্যান, ডফ, ওয়ার্ড এসব পাদ্রির কার্যক্রম এবং তাঁদের প্রচার পুস্তিকা দেশবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। আর সি মজুমদারের ভাষায়, "খ্রীস্টান মিশনারীরা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেরা বাংলাভাষা শিক্ষা করে এবং বাঙালীদেরকে ইংরেজী শিখাবার জন্য সচেষ্ট হয়।"[৪]

খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে নেমে মিশনারিরা ইসলাম ও মহানবীর বিরুদ্ধে আরম্ভ করে সুপরিকল্পিত কুৎসা প্রচার। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন এবং কলকাতা ট্রাক্ট সোসাইটি রাসূলুল্লাহ (সা) বিরোধী বহু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। ১৮০২ থেকে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইসলাম বিরোধী বাংলা প্রচারপুস্তিকার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন, তবে তা'ছিল বিপুল সংখ্যক। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত 'মহম্মদের বয়ান' পুস্তকটির প্রচার সংখ্যা ছিল আট লক্ষাধিক কপি। জমির উদ্দীনের 'মাসুম মোস্তফা' গ্রন্থের নিবেদন অংশে পাদ্রীদের রচিত ১০টি বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলো হলো পাদ্রী ফান্ডারের 'মিজানুল হক', পাদ্রী জি. এইচ. বাউল-এর 'ঈসা বা 'মোহাম্মদ এবং ফোরকান' (২য় সং ১৮৮৪), পাদ্রী মনরো'র

---

২. আবূ জাফর, *মাওলানা আকরাম খাঁ*, ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৮৬, পৃ ৬৬।

৩. Dr. Abdur Rahim Khondoker, *The Portuguese Contribution to Bengali Prose, Grammar & Lexicography*, Dhaka, 1976, p 7.

৪. আর. সি. মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খ, কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স, তা বি, পৃ ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

'মৌলভীদিগের শিক্ষা', পাদ্রী ইমাম উদ্দীনের 'তাওয়ারীখে মোহাম্মদী', পাদ্রী সফদার আলীর 'নিয়াজনামা', গোলডস্যাক-এর 'ইসলামে মোহাম্মদ', পাদ্রী ঠাকুরদাসের 'সিরত মোহাম্মদ', পাদ্রী জ্যাকবকান্তি নাথের 'ইসলাম দর্শন' এবং পাদ্রী জ্যাকব বিশ্বাসের 'ইসলাম দর্শন'। এ ছাড়া পাদ্রীদের ইংরেজী ও উর্দুভাষায় রচিত প্রচার পুস্তিকাগুলো বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। ডক্টর শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে বিষয়টি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, ঐ কুৎসিত প্রচার পুস্তিকাগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য।[৫]

১৮০১ সালে মিশনারি ওয়ার্ড যিশু এবং মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বলেছিল 'খুনি' এবং 'ব্যভিচারী'- এতে ওয়ার্ড মুসলমানদের কোপে পড়েছিলেন। এরপর শ্রীরামপুর থেকে- 'An address to the Mussalmans with an appendix, containing some account of Mohmet.' শীর্ষক প্রচার পুস্তিকায় অনুরূপ কুৎসামূলক মন্তব্য করে মহানবীকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। এই জঘন্য প্রচারে মুসলমান সমাজ এতটা বিক্ষুব্ধ হয় যে কোম্পানির কর্মচারীরা ভীত হয়ে পড়েছিল এবং বিদ্রোহের আশংকা করেছিল। কোম্পানি কর্মচারীদের সাক্ষ্য থেকে লর্ড মিন্টো বুঝেছিলেন যে মিশনারিদের প্রচার ও প্রচারপুস্তিকার কারণে ইংরেজ বিরোধী উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে।[৬] তাই কেরী-কে প্রচারপুস্তিকা বিতরণ ও প্রচারকাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এবং ছাপাখানা শ্রীরামপুর থেকে কলকাতায় সরিয়ে নেয়ার আদেশ দেওয়া হয়।[৭]

মুসলমানদের এই অসহিষ্ণুতার কারণ-মিশনারিদের সামাজিক কল্যাণসমূহও উদ্দেশ্যহীন ছিল না। এর পশ্চাতে খ্রিষ্টানকরণের বাসনা ছিল প্রবল। এজন্যই মিশনারিরা বহুদিন বাংলাদেশ অঞ্চলে অবস্থান করে, বহু সামাজিক কল্যাণকর্মে অংশগ্রহণ করেও সাধারণ মানুষের মন জয় করতে পারেনি।[৮]

এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয় দশক এবং বিশ শতকের শুরুতে খ্রিষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা চরমে পৌঁছে। তারা ইসলামের অপব্যাখ্যা প্রচার শুরু করে। অনেক আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদেরকে বিপথগামী করে খ্রিষ্টান ধর্মের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। এ সময়ে মুনশী মেহেরুল্লাহ্ মুসলমানদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করেন।[৯] খ্রিষ্টান পাদ্রীদের এসব হিংসাত্মক আচরণ সহ্য করতে না পেরে মুনশী

---

৫. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ৩য় সং, ১৯৬০, পৃ ৩৭৬-৩৭৭।

৬. Dr. Mohar Ali, *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities 1833-57*, Chittagong, 1965, p 4,55.

৭. ibid.

৮. সবিতা চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক*, কলকাতা, ১ম সং ১৯৭২, পৃ ১১; S.K. De, *Bengali Literature in the 19th Century*, Second ed. 1962, p 50.

৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

মেহেরুল্লাহ 'খ্রিষ্টান ধর্মের অসারতা' নামে একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেন।[১০] ঊনিশ শতকের ধারায় ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খ্রিষ্টান মিশনারিদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে আরও কলম ধরেছিলেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)। তিনি বাইবেলের শান্তিবাণী প্রচারের নামে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের দোসর বিদেশী মিশনারিদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জাতিকে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে গেছেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক যুক্তিপূর্ণ নিবন্ধও রচনা করেছেন। মিশনারীদের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর লেখা প্রবন্ধ "মূল বাইবেল কোথায়?" এবং 'যীশু কি নিষ্পাপ?' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১১] বলা যেতে পারে, এভাবেই বাংলা সাহিত্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনচরিত চর্চা ব্যাপক হতে শুরু করে।

বাংলাদেশে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন ও আদর্শের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় পত্র-পত্রিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মনীষীগণ এবং তাদের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, তাঁরা লেখনীর মাধ্যমে দেশ ও জাতির শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশে নিরন্তর প্রচেষ্টার পাশাপাশি ব্যাপকভাবে সীরাত চর্চায়ও অবদান রেখেছেন।

মওলানা আকরম খাঁ অর্ধ ডজন সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক ও দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। দৈনিক আজাদ এবং মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন।[১২] 'আহলে হাদীস' ও 'মুহাম্মদী আখবার' নামক দু'টি পত্রিকায় ছাত্রাবস্থায় তিনি ব্যাপক লেখালেখি করেন। আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাংলার মুখপত্র হিসেবে 'আল-এখলাস' পত্রিকাও তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এ সকল পত্রিকায় ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, ড. কাজী মোতাহের হোসেন, কাজী এমদাদুল হক, আবুল মনসুর আহমদ ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন। ১৯২২-১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে 'দৈনিক সেবক' ও 'দৈনিক মোহাম্মদী' প্রকাশিত হয়। এসকল পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে মওলানা আকরম খাঁ সহ সমসাময়িককালের মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ ইসলামী ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনার প্রচার ও প্রসার এবং মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চায় অবদান রাখেন।[১৩]

মওলানা আকরম খাঁর সম্পাদনায় 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি অল্পদিনের মাঝেই পূর্ববাংলার মুসলমানদের মুখপত্র হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি

---

১০. ড. ওয়াকিল আহমদ, 'মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র সাহিত্য ও মন : সমীক্ষা', *সাহিত্যিকী*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, বসন্ত সংখ্যা ১৩৮৪।

১১. আবূ জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৫।

১২. ড. আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংগালী মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা আকরাম খাঁর অবদান*, অপ্রকাশিত পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ, ঢা বি, ১৯৮৭ খ্রি, পৃ ৪৪২-৪৪৫।

১৩. ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : ই ফা বা, ২০০৫, পৃ ৩৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করে। এ পত্রিকাটিতে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সীরাত বিষয়ক প্রচুর প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলাদেশে 'নবনূর', 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'হানাফী', 'মোসলেম', সুলতান', 'মোসলেম হিতৈষী', 'ধূমকেতু', 'নবযুগ', 'খাদেম', 'সওগাত'সহ আরো কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ সময় 'আমীর ও তাকবীর' দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। এসব পত্র-পত্রিকায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে দেশের সেরা শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, সীরাতকারদের লেখা প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক 'আল এসলাম' নামক একটি পত্রিকা মওলানা আকরম খাঁর সম্পাদনায় বের হয়। পত্রিকাটি তৎকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শের প্রচারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করে সময়োপযোগী ভূমিকা পালন করে।[১৪]

সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী এবং মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় ১৮৯৯-১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম প্রচারক পত্রিকা নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় মোছলমান সাহিত্য পত্রিকা এ সময় প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭ সালে বাংলা একাডেমী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে ড. আশরাফ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা নামে একটি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে নজরুল একাডেমী পত্রিকা ও নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি নামে একটি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এসব পত্রিকায় সীরাত বিষয়ক গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।[১৫]

পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশনার জগতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শের প্রচার-প্রসারের ধারাবাহিকতা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগুতে থাকে। ১৯৭১ তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সীরাত চর্চা ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছে। আশির দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর সংখ্যা ছিল, দৈনিক পত্রিকা-৪২টি, সাপ্তাহিক-১১৩, অর্ধ-সাপ্তাহিক-২, পাক্ষিক-৩৫, মাসিক-২২০, দ্বিমাসিক-১২, ত্রৈমাসিক-৫৫, ষান্মাসিক-১১, বার্ষিকী-৪, অন্যান্য-৩৮। এসব পত্র-পত্রিকার মধ্যে ১১টি পত্রিকা ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শের চেতনার আলোকে প্রকাশিত হয়েছে।[১৬] সর্বশেষ ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রতিটি জেলায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও সাময়িক পত্রের প্রকাশনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকাসহ সব জেলার পুরোপুরি হিসাব না পাওয়া গেলেও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রায় ২০০০ পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছে।

---

১৪. ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৮।

১৫. ড. মুহাম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, *বাংলাদেশের গবেষণা পত্রিকা*, ঢাকা : বা এ, ১৯৯২, পৃ ১৩-১৬।

১৬. শামসুল হক, *বাংলা সাময়িক পত্র (১৯৭২-১৯৮১)*, ঢাকা : বা এ, ১৯৮৪, ভূমিকা, পৃ ৩-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ সাহিত্যে সীরাত চর্চা ব্যাপকতর হচ্ছে পত্রিকা ও সাময়িকীর সীরাত স্মারক ও সংখ্যার মাধ্যমে। প্রতিবছর সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে এসব স্মারক প্রকাশিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে এর প্রচলন শুরু হয় সাপ্তাহিক মদীনার সীরাত সংখ্যা প্রকাশের ধারাবাহিকতায়। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে এ পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। প্রথম সংখ্যাটিই সীরাত সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়। সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে এর প্রকাশনা ধারাবাহিক হওয়ায় ধীরে ধীরে এটা জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং অন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকেও নতুন নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হতে থাকে। এ জাতীয় উল্লেখযোগ্য ক'টি প্রকাশনা হচ্ছে, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সীরাত স্মরণিকা, বাংলাদেশ সীরাত মিশনের সীরাত মুবারক, তরজুমান, সিরাজাম মুনীরা, মহানবী স্মরণিকা, তাহজীব, সপ্তডিঙ্গা, অগ্রপথিক, সবুজপাতা, মাসিক আল-উসওয়া, ইরান কালচারাল সেন্টারের নিউজ লেটার এবং কিশোর নিউজ লেটার, মাসিক পরওয়ানা, আলোর ফুল, আল-ইসলাহ, মাসিক দীনে হানিফ, মাসিক দ্বীন-দুনিয়া ইত্যাদি। এছাড়াও দৈনিক পত্রিকাগুলো ১২ রবি'উল আউয়াল সংখ্যায় সীরাত বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করে সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা হিসেবে। এসব স্মারক সংখ্যার বৈচিত্র্যময় প্রবন্ধাবলীতে সমকালীন সমস্যাসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করে রাসূলুল্লাহ (সা) চর্চার নবতর অধ্যায়ের সূচনা করে।

অবিভক্ত ভারতে বাংলা প্রদেশে, খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে, প্রথম শিশু পত্রিকা 'দিগদর্শন' জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন থেকে ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়।[১৭] ভারতীয় মুসলমানের প্রথম শিশুপাঠ্য পত্রিকা 'বালক' শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সম্পাদনায় ১৯০৩ সালে বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয়। মুসলমান লেখকদের শিশুপাঠ্য রচনায় উৎসাহিত করার জন্য পণ্ডিত গবেষক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদনায় ১৯২০ সালে শিশু পত্রিকা 'আঙুর' প্রকাশিত হয়। এরপর মুসলমানদের শিশুসাহিত্য রচনার পথে পরিক্রমণ শুরু হয়।[১৮] প্রকাশিত হয় শাখাওয়াৎ হোসেন সম্পাদিত মাসিক 'মকতব' (১৯২৭), আফজাল-উল-হক সম্পাদিত মাসিক 'শিশুমহল' (১৯২৭), শেখ ফজলুল করীম সম্পাদিত মাসিক 'জমজম' (১৯৩০), মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন সম্পাদিত মাসিক 'শিশু সওগাত' (১৯২২), আবদুল ওহাব সিদ্দিকী সম্পাদিত মাসিক 'গুল বাগিচা' (১৯৩৭), মুহম্মদ শফীউল্লাহ সম্পাদিত মাসিক 'ফুলঝুরি' (১৯৩৮), মওলবী রাজীউর রহমান সম্পাদিত মাসিক 'প্রভাতী' (১৯৪২), এমাদউদ্দীন আহমদ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজ পতাকা' (১৯৪২) প্রভৃতি শিশুপাঠ্য পত্রিকা। বৃটিশযুগে মুসলিম শিশুসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ পর্বে এই পত্রিকাগুলো মুসলমান লেখকদের শিশুসাহিত্য সাধনার সুযোগ ও সমৃদ্ধি অর্জনে প্রভূত সহায়তা করেছে। মুসলিম সাহিত্যসেবিরা এসব

---

১৭. হরিহর শেঠ, *পুরাতনী*, ১ম খ, চন্দন নগর, ১৩৩৫ ব, অংশে দ্র. পৃ ৫৪।

১৮. আতোয়ার রহমান, *শিশু সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, বা এ, ১৯৯৪, পৃ ৯০-৯১।

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন ও আদর্শ নিয়ে শিশু-কিশোরদের জন্য রচনা করেছেন বিপুল পরিমাণ শিশুভোগ্য রচনা।[১৯]

বংগীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার (১৯১৮) শিশু-কিশোর পৃষ্ঠার নাম 'কোরক', দৈনিক আজাদের 'মুকুলের মাহফিল', দৈনিক ইত্তেহাদের 'মিতালী মজলিশ', সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর 'ছোটদের আসর', দৈনিক নবযুগের 'আগুনের ফুলকি' প্রভৃতিতে মুসলিম সাহিত্যিকগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহান জীবনের বিভিন্ন দিক শিশু-কিশোরদের সামনে তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলো হলো : পাক্ষিক মুকুল (১৯৪৮) (পরে মাসিক, ১৯৬৫), মাসিক ঝংকার (১৯৪৮), মাসিক মিনার (১৯৪৮), মাসিক আজান (১৯৪৮), পাক্ষিক নতুন বাংলা (১৯৪৮), মাসিক দ্যুতি (১৯৪৯), মাসিক হুল্লোড় (১৯৫৪), মাসিক সবুজ নিশান (১৯৫১), মাসিক প্রতিভা (১৯৫৩), মাসিক বিদ্যুৎ (১৯৫৩), মাসিক খেলাঘর (১৯৫৪), মাসিক আলাপনী (১৯৫৪), পাক্ষিক শাহীন (১৯৫৫), পাক্ষিক সেতারা (১৯৫৫), মাসিক সবুজপাতা (১৯৬২), মাসিক পরে পাক্ষিক পাপড়ী (১৯৬২), মাসিক বর্নালী (১৯৫৬), মাসিক কিশোর সাহিত্য (১৯৫৬), মাসিক সবুজসেনা (১৯৫৭), পাক্ষিক কিশলয় (১৯৫৯), মাসিক রংধনু (১৯৬০), মাসিক মধুমেলা (১৯৬০), মাসিক সোনার কাঠি (১৯৬৩), ষান্মাসিক ফুলকি (১৯৬৪), মাসিক নবারুণ (১৯৬৪), মাসিক সৃষ্টিসুখের উল্লাসে (১৯৬৪), দ্বিমাসিক পূরবী (১৯৬৫), মাসিক কচি ও কাঁচা (১৯৬৫), মাসিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা (১৯৬৫), মসিক টাপুর-টুপুর (১৯৬৬), ত্রৈমাসিক জ্ঞান-বিজ্ঞান (১৯৬৭), মাসিক কিচির-মিচির (১৯৭০), মাসিক কলকণ্ঠ (১৯৭০), মাসিক সাম্পান (১৯৭০) প্রভৃতি। এছাড়া কয়েকটিতে শিশুসাহিত্যের সংকলন প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম হলো : কাব্য মুকুল (১৯৫১), খেলাঘর (১৯৫৫), ডালি (১৯৫৬), পাপড়ী (১৯৫৭), নবারুণ (১৯৫৮), স্বাপ্নিক (১৯৫৮), কোরক (১৯৬০), হরেক রকম (১৯৬১), ময়ূরপঙ্খী (১৯৬১), সপ্তডিঙ্গা (১৯৬২), মধুমালতী (১৯৬৪), কলিকা (১৯৬৪), পুবালী ফসল (১৯৬৪), টাপুরটুপুর (১৯৬৬), এলেরপাত বেলেরপাত (১৯৬৬), ছড়ায় ছড়ায় ছন্দ (১৯৬৬), সূর্যমূখী (১৯৬৭), মেঘমল্লার (১৯৬৭), ঝিকিমিকি (১৯৬৮) ইত্যাদি। এসব পত্রিকা ও সংকলনে যেসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ছিল শিশুতোষ নবীচরিত সম্পর্কিত।[২০]

বর্তমানে সীরাত স্মরণিকা, দৈনিক পত্রিকার শিশুপাতা, শিশু পত্রিকাগুলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন ও আদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে শিশুকিশোর উপযোগী প্রবন্ধ-নিবন্ধ, প্রকাশ করে বাংলা শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছে। এখানে এ ধরনের কতিপয় পত্রিকা, সাময়িকী ও স্মারকের বিবরণ উপস্থাপন করা হলো। যাতে এসব প্রতিষ্ঠানের অবদান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

---

১৯. ড. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র*, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ ১০।

২০. মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, *শিশু সাহিত্যে সর্বশেষ রাসূল*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

মাসিক মদীনা

মাসিক মদীনা[২১] বাংলাদেশের একটি বহুল পঠিত মাসিক পত্রিকা। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে মাসিক মদীনা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। বহুল পঠিত এ পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের নানাদিক তুলে ধরে প্রবন্ধ লিখেন মাওলানা আমিনুল হক মাহমুদ, সৈয়দ আবদুস সুলতান, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক গোলাম আযম, ইজাব উদ্দীন আহমদ, দেওয়ান আবদুল হামিদ, অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ প্রমুখ।[২২] এরপর প্রতিটি সংখ্যাতে রাসূল (সা)-এর ওপর প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি ছাপা হতে থাকে। নিয়মিত সংখ্যা ছাড়াও ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮৭ সালে মাসিক মদীনা সীরাতুন্নবী সংখ্যা প্রকাশ করে। সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, আগস্ট ১৯৯৪, জুলাই ১৯৯৬, জুলাই ১৯৯৭, জুলাই ১৯৯৮, জুন ২০০০, জুন ২০০১ জুন ২০০২, এপ্রিল ২০০৫, এপ্রিল ২০০৬, মার্চ ২০০৭, মার্চ ২০০৮, মার্চ ২০০৯, ফেব্রুয়ারী ২০১০, ফেব্রুয়ারী ২০১১ ও ফেব্রুয়ারী ২০১২ সংখ্যাগুলো অত্যন্ত সমৃদ্ধ।[২৩] মাসিক মদীনার বিশেষ সীরাত সংখ্যার প্রতিটি সংখ্যাই নবীন প্রবীণ লেখকদের প্রবন্ধ নিবন্ধে সমৃদ্ধ ও মূল্যবান।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা প্রথমে ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা নামে ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা হিসেবে ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল-জুন এর প্রথম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়। বার বছর এ নামেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা নামে এপ্রিল-জুন সংখ্যায় এর প্রকাশনা শুরু হয়। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে পত্রিকাটি তার গৌরবের ৫০ বছর অতিক্রম করেছে। বর্ষ অনুযায়ী ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা নামে বার বছরে ৪০টি সংখ্যা এরপর ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা নামে ১২৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৬৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এসব সংখ্যায় প্রায় ১২০০ প্রবন্ধ/নিবন্ধ/রচনা প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় ৬০টি। এটি সংখ্যায় কম মনে হলেও গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা বিচারে অনেক।

---

২১. এ পত্রিকাটি বিগত ৪৭ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ইসলামী পত্র-পত্রিকাসমূহের মধ্যে 'মাসিক মদীনা' মানোত্তীর্ণ একটি পত্রিকা। দেশের প্রথিতযশা লেখক কলামিষ্টগণের অনেকেই এ পত্রিকায় লিখেন। বিদেশী বহু লেখকের লেখার অনুবাদ এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটির বিপুল পাঠক চাহিদা রয়েছে। ইসলামী শিক্ষা, ইতিহাস ঐতিহ্য, মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ এবং সীরাতচর্চায় মাসিক মদীনা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করছে। [মাসিক মদীনা সম্পাদকের সাক্ষাৎকার অনুযায়ী]।

২২. মুহিউদ্দীন খান, সম্পা., *মাসিক মদীনা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ঢাকা, মার্চ ১৯৬১।

২৩. মুহিউদ্দীন খান, সম্পা., *মাসিক মদীনা*, সীরাতুননবী (সাঃ) সংখ্যা, ২৯ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩; ৩০ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯৪; ৩১ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯৫; ৩২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৬; ৩৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৭, ৩৪ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৮; ৩৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জুন ২০০০; ৩৭ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জুন ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

এতে মৌলিক প্রবন্ধ সংখ্যা ৭৪৯টি। বাকী ৩৩টি বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক রচনা। ৪৬৫ জন লেখকের লেখা এ সময়ে পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এর মধ্যে মৌলিক প্রাবন্ধিক ২৭৮ জন, অনুবাদক ৬৬ জন। ৯৬ জন দেশী-বিদেশী লেখকের লেখা অনূদিত হয়। ২৫ জন লেখকের মৌলিক প্রবন্ধের পাশাপাশি অন্য ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ ছাপা হয়েছে।

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অন্যান্য প্রকাশনার মধ্যে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা প্রকাশ একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে ১৪০০ হিজরী থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। ইতোমধ্যে এই অনুপম সংকলনগুলো সুধী পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এই সংকলনের সমস্ত লেখাই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নিয়ে লেখা এবং তাঁকে নিবেদিত। বিশেষত প্রবন্ধসমূহের লেখার মান খুবই উন্নত। সাধারণত বিশিষ্ট আলিম ও বিদগ্ধ গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লেখায় এই জাতীয় স্মারক গ্রন্থটি সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। ১৪০৪ হিজরী সনে প্রকাশিত সীরাত স্মরণিকার সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক আবদুল গফুর এবং সহসম্পাদক ছিলেন আবদুল মুকীত চৌধুরী। এটিতে বেশকিছু দুর্লভ চিত্র স্থান পেয়েছে। এতে স্থান পেয়েছে সৈয়দ হামযা, হায়াত মামুদ, মুনশী আবদুর রহীম, মুহম্মদ খান, আলাওল, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, মুহিউদ্দীন খান, অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, ফরীদ উদ্দীন মাসউদ প্রমুখের লেখা। মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা এর মনোরম প্রচ্ছদ অংকন করেছেন।[২৪]

১৪০৫ হিজরীতে প্রকাশিত সীরাত স্মরণিকাটি ছিল বেশ কিছু ভালো লেখায় উজ্জ্বল। এটি সম্পাদনা করেছেন জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ, সহ-সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম। স্মরণিকা পরিষদের সদস্য ছিলেন আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, হাসান আবদুল কাইয়ূম, মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম ও আবদুল মুকীত চৌধুরী। এটিতে কা'বা শরীফ, মসজিদুল আকসা, মসজিদে নববী, মহানবীর রওযা মুবারক ও জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের চিত্র পরিচিতি দেওয়া হয়েছে।[২৫]

১৪০৬ হিজরী সনে প্রকাশিত সীরাত স্মরণিকার লেখা শুরু হয়েছে মহানবী (সা)-কে নিবেদিত কবিতা দিয়ে। অবশ্য বরাবরের মতো মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী সবাগ্রে পত্রস্থ ছিল। এ সংখ্যাটিতে কোন সূচী সন্নিবেশিত করা হয়নি। এই সংখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শের উপর কয়েকটি সারগর্ভ প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

---

২৪. আবদুল গফুর সম্পা., *সীরাত স্মরণিকা ১৪০৪ হি*।

২৫. শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পা., *সীরাত স্মরণিকা ১৪০৫ হি*।

Dhaka University Institutional Repository

১৪০৭ হিজরী সনে প্রকাশিত স্মরণিকার আয়োজন ছিল ব্যাপক। অনেকগুলো লেখা এতে স্থান পায়। এটি সম্পাদনায় ছিলেন শেখ ফজলুর রহমান। সহকারী সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম ও আবদুল মুকীত চৌধুরী।[২৬]

সীরাত স্মরণিকা ১৪১৪ হিজরীর সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, সহকারী সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ শামসুল হুদা ও মসউদ-উশ-শহীদ। এ সংখ্যাটিতে বদর প্রান্তর, হেরা পর্বত, মসজিদে কুবা ও কা'বা শরীফের ফটোগ্রাফ ছাপা হয়েছে।[২৭]

১৪১৫ হিজরী সনে প্রকাশিত সীরাত স্মরণিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মহাপরিচালক দাউদ-উজ্-জামান চৌধুরী, সম্পাদক আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী এবং নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন আবদুল মুকীত চৌধুরী। এ সংখ্যাটিতেও রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব, রেডিও বাংলাদেশের মহাপরিচালক ও ফাউণ্ডেশনের মহাপরিচালকের বাণীসহ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সংকলনটির প্রথমেই রয়েছে খালিদা খানম অনূদিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহান বাণী এবং কাজী নজরুল ইসলাম রচিত হামদ-না'ত। সমৃদ্ধ এ সংখ্যার প্রচ্ছদপট এঁকেছিলেন শেখ তোফাজ্জল হোসেন ও কাজী শামসুল আহসান।

এ গবেষণাকর্মে ১৪০৭ হি, ১৪১৪ হি, ১৪১৫ হি, ১৪১৬ হি, ১৪১৭ হি, ১৪১৮ হি, ১৪১৯ হি, ১৪২০ হি, ১৪২১ হি, ১৪২২ হি, ১৪২৪ হি, ১৪২৮ হি, ১৪২৯ হি, ১৪৩১ হি, ১৪৩২ হি এবং ১৪৩৩ হিজরী সংখ্যাগুলোর প্রবন্ধ নিবন্ধের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

তরজুমান

তরজুমান চট্টগ্রামের আনজুমানে রহমানিয়া প্রকাশিত আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের মুখপত্র। এটি বেশ ক'বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এটি সম্পাদনা করেন অধ্যক্ষ আলহাজ মওলানা মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন।

তামাদ্দুন মজলিসের ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রদর্শিত আদর্শের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে ১৯৪৭ সালে তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০/১৯৫১ সাল থেকে সংগঠনটি নবী দিবস পালন শুরু করে। এটি আশির দশক থেকে 'ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা' প্রকাশ শুরু করে। বেশীর ভাগ সংখ্যাই অধ্যাপক আবদুল গফুর সম্পাদিত। ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত সংখ্যাটিতে লেখক ছিলেন– আলীয়া আলী ইজেত বেগোভিচ,

---

২৬. শেখ ফজলুর রহমান সম্পা., *সীরাত স্মরণিকা ১৪০৭ হি*।

২৭. হাসান আবদুল কাইয়ূম সম্পা., *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৪ হি*

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, শাহেদ আলী, ড. এম শমসের আলী, মুহিউদ্দীন খান, এ জেড এম শামসুল আলম, জুবাইদা গুলশান আরা, ড. আনিসুজ্জামান, ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ।[২৮]

মহানবী স্মরণিকা

ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় *বাংলাদেশ ইসলাম প্রচার সমিতি*[২৯] থেকে বের হয়েছিল। মহানবী স্মরণিকার আলোচ্য সংখ্যাটি ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত। সম্পাদক আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী। এই সংখ্যাটিতে সাবেক উপরাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার, মুজিবুর রহমান খাঁ ও সাবেক মন্ত্রী আবদুর রহমানের বাণী ছাপা হয়েছে। হযরত রসূলে কারীম (সা)-কে নিয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ইব্ন সাঈদ, মওলানা জয়নুল আবেদীন, গোলাম মোস্তফা, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল, আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী, মওলানা আবুল কালাম আযাদ, সুফী জুলফিকার হায়দার, শেখ নূরুল ইসলাম, মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, সুফী গোলাম মহিউদ্দীন, হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী, মওলানা সালাহ উদ্দীন, মওলানা আজিজুল হক, ডা. আবদুল মালিক, শামসুল আলম, আল্লামা যাফ, আহমদ 'উসমানী (রহ), সৈয়দ নযর মোহাম্মদ সালামী, আবদুল খালেক, হাফেজ ফয়জুর রহমান, আলহাজ্জ খোন্দকার তফাজ্জল হোসেন, মওলানা নূরুদ্দীন আহমেদ, নাসরীন জাহান, বেগম উম্মে হানী, মওলানা আবদুল হান্নান, ইব্ন সাঈদ ও শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন প্রমুখ বিদগ্ধ মনীষী ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের লেখা স্থান পেয়েছে।[৩০] ১৯৮২ সালের মহানবী স্মরণিকায় হযরত 'আয়িশা সিদ্দিকা (রা), গাজ্জালী (রহ), আলফে সানী (রহ), মওলানা আবুল কালাম আজাদ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সূফী জুলফিকার হায়দর, মুহম্মদ নূরুল হক ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর রচনা সংকলিত হয়েছে।

সিরাজাম মুনীরা

হাইকোর্ট মাযার প্রশাসন কমিটি[৩১] ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উপলক্ষ্যে সিরাজাম মুনীরা নামক পত্রিকা প্রকাশ করে আসছে। ১৯৯১ সাল থেকে প্রতি বছর 'সিরাজাম মুনীরা' ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) সংখ্যা

---

২৮. অধ্যাপক আবদুল গফুর সম্পাদিত, *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা*, ঢাকা : তমদ্দুন মজলিস, ১৯৯৯।

২৯. ইসলাম প্রচার সমিতি প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি ইসলাম প্রচার ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সীরাতচর্চায় ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। ডাকযোগে ইসলাম প্রচার, সীরাত স্মরণিকা প্রকাশ, নবী দিবস পালন এবং ইসলাম ও মহানবীর (সা) সীরাতের উপর গ্রন্থাবলী প্রকাশসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮১ সালে আবুল হোসেন ভট্টাচার্যের লেখা 'নবী দিবস' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে।

৩০. আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী সম্পা., *মহানবী স্মরণিকা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলাম প্রচার সমিতি, ১৯৭৮।

৩১. ১৯৮০ সাল থেকে কমিটি কাজ শুরু করে। মাননীয় বিচারপতি মুহাম্মদ আব্দুর রউফকে সভাপতি করে ১২ সদস্যের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে সভাপতি ছাড়াও দু'জন সম্মানিত বিচারপতি

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করে আসছে। ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৯১ ও ১৯৯৩ সালের সীরাত সংখ্যাগুলো ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও মূল্যবান লেখায় ভরপুর। তবে ১৯৯৯ সালের প্রথম থেকে পত্রিকাটির আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন হাফেয মঈনুল ইসলাম।

তাহজীব

তাহজীবের ১৩৮৪ বঙ্গাব্দের সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে সংখ্যাটিতে লিখেছেন মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান নদভী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, মুনসুর আহমেদ, তওফীকুল হাকীম, এম. এ. সোবহান, তাহমিনা কাশেম, অধ্যাপক মুজীবর রহমান। এটি সম্পাদনা করেছেন মুহিউদ্দীন শামী।[৩২]

সপ্তডিঙ্গা

ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ঢাকা বিভাগ ছাড়া চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা থেকে শিশু-কিশোরদের জন্য তিনটি মাসিক পত্রিকা বের হতো। সপ্তডিঙ্গা ছিল খুলনা অঞ্চলের শিশু-কিশোর মাসিক। প্রাপ্ত সংখ্যাটি ৮২ সালে পবিত্র মীলাদুন্নবী উপলক্ষে প্রকাশিত। সম্পাদক মাসুদ আলী, প্রচ্ছদ মেহেদী হাসান। এটিতে লিখেছেন মুহম্মদ আবূ তালিব, হাসান আবদুল কাইয়ূম, নাসিরুদ্দীন আহমদ, আশরাফুন নেছা, মুহম্মদ জাকারিয়া, ফারুক নওয়াজ, আমিনা বেগম, দেলোয়ার হোসেন, শামসুল আলম, মাওরানা মুহম্মদ ছিফাতুল্লাহ, আলী হোসেন মানিক, বেদুঈন সামাদ, খান মুহম্মদ শফী, নজরুল ইসলাম টুকু, এস. এম. মহিউদ্দীন, সেলিনা পারভিন, মফিজুর রহমান মানিক, জলি হামিদ, এস. এ. শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।[৩৩]

রয়েছেন। মূল কমিটির সদস্য বিচারপতি আব্দুল ওয়াদূদ চৌধুরীকে উপদেষ্টা করে 'সিরাজাম মুনীরা' পত্রিকা প্রকাশের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে আরও একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৯১ সাল থেকেই 'সিরাজাম মুনীরা' ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

হাইকোর্ট মাযার প্রশাসন কমিটি ১৯৮১ সাল থেকে সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে ওয়াজ-মাহফিলসহ রচনা, কির'আত ও না'ত প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। এ ছাড়া যে সব কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা হল, কুর'আন শিক্ষা কোর্স, নিয়মিত তাফসীর মাহফিল, দরসে হাদীস মাহফিল, কুর'আন শরীফ বিতরণ, ইসলামী বই ও সাময়িকী বিতরণ, মাদ্‌রাসা উন্নয়ন, গরীব ও মেধাবী ছাত্রদেরকে বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি। [দ্র. নাসির হেলাল, 'সীরাত চর্চায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশনা মাধ্যম' সাহিত্য সংস্কৃতি, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ঢাকা ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতিক কেন্দ্র, ২০০০, পৃ ১৪৫।]

৩২. মুহিউদ্দীন শামী সম্পা., *মাসিক তাহজীব*, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ১৩৮৪ হি।

৩৩. মাসুদ আলী সম্পা., *মাসিক সপ্তডিঙ্গা*, খুলনা : ই ফা বা, ১৯৮২।

Dhaka University Institutional Repository

মাসিক অগ্রপথিক

অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাসিক প্রকাশনা। ইসলাম, ইসলামী উম্মাহ তথা দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের জগতে চিন্তার নতুন দিগন্ত উন্মোচনে অগ্রপথিক বিশেষ অবদান রেখেছে।[৩৪] ১৯৮৬-তে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তখন এর প্রকাশনা ছিলো সাপ্তাহিক। সে সময় অগ্রপথিকের সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক আবদুল গফুর। ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে পত্রিকাটির প্রকাশনা মাসিক হয়ে যায়।

প্রকাশনার প্রথম থেকেই প্রতি বছর সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে অগ্রপথিক বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের নবীন প্রবীণ লেখকরাই অগ্রপথিক-এর লেখক। ১৪১৬ হি, ১৪১৭ হি, ১৪১৮, ১৪১৯ হি, ১৪২০ হি, ১৪২১ হি ও ১৪২২ হিজরীতেও প্রকাশিত ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) সংখ্যাগুলো অগ্রপথিকের সমৃদ্ধ সংখ্যা।

মাসিক সবুজ পাতা

১৯৬২ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে শিশু-কিশোর সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সবুজ পাতা অসামান্য ভূমিকা পালন করছে। ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের কথা এই পত্রিকাটির বিভিন্ন লেখায় উল্লেখ থাকলেও সৃজন শক্তির চর্চায় সবুজ পাতা ছোটদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত।[৩৫]

ইতোপূর্বে সবুজ পাতায় প্রকাশিত বিভিন্ন লেখা নিয়ে লুবনা জাহানের সম্পাদনায় সবুজ পাতার তিনটি সংকলন বের হয়েছিলো এবং তা সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছে। সংকলনে গ্রন্থিত বেশ কিছু প্রবন্ধ মানবশ্রেষ্ঠ হযরত মুহম্মদ (সা)-এর সীরাত বিষয়ক।

সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষ্যে প্রতি বছরই মাসিক সবুজপাতা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। প্রতিটি লেখায় থাকে রাসূল (সা)-এর আদর্শ, শিক্ষা ও জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ওপর আলোকপাত।

সীরাত স্মরণিকা (ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, খুলনা)

১৯৮৩ সালে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র খুলনা ও খুলনা পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে সীরাত স্মরণিকা ১৪০৪ প্রকাশিত হয়। এটি সম্পাদনা করেন এস. এম. জব্বার। এটিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী সংকলতি হয় এবং দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, ড. আইউব আলী, আজিজুল হক ভূইয়া ও মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের লেখা প্রকাশিত হয়েছে।[৩৬]

---

৩৪. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি*, ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৯৯, পৃ ৪।

৩৫. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি*, প্রাগুক্ত।

৩৬. এস. এম. জব্বার সম্পা., *সীরাত স্মরণিকা ১৪০৪ হি*, খুলনা : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

মাসিক আল উসওয়া

মাসিক আল-উসওয়া একটি সাংস্কৃতিক ও গবেষণামূলক পত্রিকা। তৃতীয় বর্ষের দশম সংখ্যাটি সীরাত সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এটি সম্পাদনা করেন মোহাম্মদ নূর হোসাইন, সহকারী সম্পাদিকা মাহমুদা হোসাইন। মাওলানা আবূ নাঈম, হামিদ আলী মুনশী, আ. ত. ম. মুসলেহ উদ্দীন, সানাউল্লাহ নূরী, আবদুস সাত্তার, আ. জ. ম. শামসুল আলম, মোহাম্মদ নূর হোসাইন, মোঃ আবূ বাইয়াত, অধ্যাপক আখতার ফারুক, মোঃ বদরুল ইসলাম, শামসুল হুদা ও আবদুল মুকীত চৌধুরীর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

মাসিক পরওয়ানা

পরওয়ানা একটি মাসিক পত্রিকা। ১৯৯২ সালে সীরাত চর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে পত্রিকাটির যাত্রা শুরু হয়। এটির সম্পাদক মুহাম্মদ কমরুদ্দীন চৌধুরী। নির্বাহী সম্পাদক মুহাম্মদ মজিবুর রহমান। দ্বিতীয় বর্ষের পঞ্চম সংখ্যাটি ছিল সীরাত সংখ্যা। এটিতে বেশ ক'টি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে, আর এতে মহানবী (সা)-এর সীরাত আলোচনা করা হয়েছে। এ সংখ্যায় লিখেছেন মরহুম ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ, মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, আবু সালেক মওলানা মুহাম্মদ ফরিদুদ্দীন আত্তার, আবু সালিম মুহাম্মদ আবদুল হাই, মওলানা আনছার উদ্দীন, ফররুখ আহমদ ও মুহাম্মদ রূহুল আমিন খান। প্রচ্ছদ এঁকেছেন কৌশিক।[৩৭] জুন ২০০০ সংখ্যাটিকে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। এ সংখ্যাটি দেশী-বিদেশী লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ।[৩৮] ২০০৭ সালের এপ্রিল সংখ্যাটিতে মিলাদুন্নবী (সা) সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানা মুহাম্মদ আজিজুল হক মুরাদের 'ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (সা.) সুন্নাত না বিদআত', মোঃ আবদুল আহাদের 'নবী করীম (সা.)-এর আবির্ভাবের দিন কি ঈদের দিন?' মাওলানা আবদুল হান্নানের 'আল কুরআনের আলোকে 'পবিত্র ঈদ-ই-মীলাদুন্নবী (সা)'- এ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য রচনা। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ এবং নবী করীম (সা)-এর লিখিত রাষ্ট্রীয় পত্রাবলী প্রবন্ধগুলো লিখেছেন যথাক্রমে পরওয়ানা ভেস্ক এবং সাইয়্যিদ হাবিবুর রহমান আল হাসানী।[৩৯]

কেন্দ্রীয় কিশোর কাফেলা

কেন্দ্রীয় কিশোর কাফেলা ১৪০২ হিজরী সনে সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে একটি সংকলন প্রকাশ করে। এটি সম্পাদনা করেন সাইয়েদ আতেক-নকীব। এতে যে সব লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তাঁরা

---

৩৭. মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী সম্পা., *মাসিক পরওয়ানা*, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৩।

৩৮. মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী সম্পা., *মাসিক পরওয়ানা*, ৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ঢাকা, জুন ২০০০।

৩৯. মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী সম্পা., *মাসিক পরওয়ানা*, ১৫তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছেন কাজী নজরুল ইসলাম, শামসুল আলম, অধ্যাপক আবদুল গফুর, জোবেদা খানম, ব্রিগেডিয়ার (অব.) মোঃ ইউনুস দেওয়ান, হোসেন মীর মোশাররফ, লুৎফুল হক, গোলাম মোস্তফা, আজিজুর রহমান, বেনজীর আহমদ, মুফাখখারুল ইসলাম, সুফী জুলফিকার হায়দার, সিরাজুল ইসলাম, আবুল হোসেন মিয়া, শেখ ফজলুর রহমান, আবদুল মুকীত চৌধুরী, সৈয়দা শামসুন্নাহার, মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন ও সাইয়েদ আতেক।[৪০]

মাসিক আল ইসলাহ্

ইসলামী পত্র-পত্রিকার জগতে আল-ইসলাহ একটি সুপরিচিত নাম। অর্ধশত বছরের অধিককাল ধরে এই পত্রিকাটি সিলেট শহর থেকে প্রকাশিত হয়। সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদের পরিচালনায় এই পত্রিকাটি মুসলিম-অমুসলিম পাঠক সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কাজী নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের তরুণ লেখকই আল ইসলাহ্-এ লিখছেন। আল ইসলাহ্ সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। সাধারণ সংখ্যায়ও সীরাতের ওপর প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এটি সম্পাদনা করতেন জনাব মুহম্মদ নূরুল হক।

মাসিক দীনে হানিফ

১৯৯১ সালে প্রকাশনা শুরু হওয়ার পর থেকে মাসিক দীনে হানিফ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এটি সম্পাদনা করেন মওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী। ৫ম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এ সংখ্যায় লিখেছেন আবদুল মতীন জালালাবাদী, আবু তুরাব শাহাদতুল্লাহ্, মুশাহেদ আলী, আবু তামান্না, মওলানা গোলাম রাসুল মিয়া, আবদুর রহমান কাযী, আবদুল্লাহ্ শিহাব, ইমাম ইব্ন কাইয়িম ও মুফতী মুহম্মদ শফী। এটি আনজুমানে দ্বীনে হানিফ বাংলাদেশ-এর মুখপত্র।[৪১]

সীরাত মুবারক

১৯৮১ সালে 'সীরাত মুবারক' নামে বাংলাদেশ সীরাত মিশন[৪২] থেকে একটি উন্নতমানের সংকলন প্রকাশিত হয়। এতে দেশের স্বনামধন্য লেখকদের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও কবিদের কবিতা মুদ্রিত

---

৪০. সাইয়েদ আতেক নকীব, *কেন্দ্রীয় কিশোর কাফেলা*, সীরাতুন্নবী (সা) সংকলন, ঢাকা, ১৪০২ হি।

৪১. আবদুল মতিন জালালাবাদী সম্পা., *মাসিক দ্বীনে হানিফ*, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৯৫।

৪২. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শের চর্চা, প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই প্রতিষ্ঠানটি সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে ব্যাপক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে আসছে। ১৯৮০ সালে তৎকালীন 'দৈনিক বাংলা'র দক্ষিণ পাশের ময়দানে প্রথম সীরাত সম্মেলন আয়োজন করা হয়। ১৯৮২ সালে ওয়াপদা মিলনায়তনে এবং ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে সীরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮২ সালের সীরাত সম্মেলনেই তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ ইসলামকে

Dhaka University Institutional Repository

হয়। ১৯৮২ সালে সীরাত মুবারকের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংখ্য সীরাত মুবারক প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে। সীরাত মুবারকের প্রতিটি সংখ্যায়ই অনুপম সংকলন হয়, যা সুধীজনের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়। ১৯৮২ সালে কার্যক্রম তুলে ধরে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে সীরাত মিশন। উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ সালের সীরাত সম্মেলনেই তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার কথা প্রথম ঘোষণা করেন। এছাড়া সীরাত মিশন বিনামূল্যে বিতরণের জন্য 'বিশ্ব নবীর হজ্ব ও ইস্তিকাল', 'বিশ্বনবীর শ্রেষ্ঠ হাদীস' এবং 'হামদ না'ত ও পেয়ারে গযল' নামে তিনটি গ্রন্থও প্রকাশ করে। ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে সীরাত মিশন না'তে রাসূল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

বিপরীত উচ্চারণ

১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল আদর্শবাদী মেধাবী ছাত্রের প্রচেষ্টায় 'বিপরীত উচ্চারণ সাহিত্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী' নামক প্রতিষ্ঠানটি জন্ম লাভ করে। জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত যেসব কাজ করে যাচ্ছে তা হল–নিয়মিত সাহিত্য সভা। প্রথমে সাপ্তাহিক সাহিত্য সভা শুরু করলেও এক পর্যায়ে এসে তা পাক্ষিক হয়ে যায়। তবে ৩০০তম সাহিত্য সভার পর থেকে আবার তারা সাপ্তাহিক সাহিত্য সভা শুরু করেছে। সংগঠনটি 'বিপরীত উচ্চারণ' নামে একটি অনিয়মিত সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করছে। প্রায় প্রতি বছরই দুটো সংখ্যা প্রকাশিত হয়, একটি 'ভাষা দিবস' সংখ্যা ও অন্যটি সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা। ১৯৯১ এবং ১৯৯৩ সালের সীরাত সংখ্যাগুলো খুবই সমৃদ্ধ এবং মূল্যবান।[৪৩] এছাড়া বিপরীত উচ্চারণ প্রায় প্রতিবছরই সীরাতুন্নবী (সা) উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠের আসরেরও আয়োজন করে থাকে।

উম্মাহ ডাইজেস্ট

ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ 'আল ইত্তেহাদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতো। পরে পত্রিকাটি 'উম্মাহ ডাইজেস্ট' নামে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬ সালে সীরাতুন্নবী উপলক্ষে কবি মোশাররফ হোসেন খানের সম্পাদনায় 'উম্মাহ ডাইজেস্ট'-এর একটি সংখ্যা সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়। ১৬০ পৃষ্ঠার এ সীরাত সংখ্যাটি ছিল মনোমুগ্ধকর ও সমৃদ্ধ।[৪৪] এ ছাড়া ইত্তেহাদুল উম্মার

রাষ্ট্রধর্ম করার কথা প্রথম ঘোষণা করেন। [দ্র. নাসির হেলাল, 'সীরাত চর্চায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশনা মাধ্যম', *সাহিত্য সংস্কৃতি*, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ঢাকা : ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০০, পৃ ১৩৯।

৪৩. শাহিদ মুবীন সম্পা., *বিপরীত উচ্চারণ*, সীরাতুন্নবী (সা.) সংকলন ১৯৯১, ঢাকা : বিপরীত উচ্চারণ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯১; নূরুর রহমান বাচ্চু সম্পা., *বিপরীত উচ্চারণ*, সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা ১৯৯৩, ঢাকা : বিপরীত উচ্চারণ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ, অক্টোবর ১৯৯৩।

৪৪. মোশাররফ হোসেন খান, উম্মাহ ডাইজেস্ট, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সম্পৃক্ত 'উলামাগণ সারা বছরব্যাপী দেশজুড়ে বিশাল বিশাল সীরাত মাহফিলে ওয়ায করার মধ্য দিয়ে মানুষের মনে রাসূল (সা)-এর প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

স্বদেশ সুসমাজ সমিতি

হিজরী ১৪০০ সন উদযাপন উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটি একটি সমৃদ্ধ সীরাত স্মরণিকা প্রকাশ করে। সৈয়দ ইমদাদুল হক সম্পাদিত এ স্মরণিকাটি কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, সুফী জুলফিকার হায়দার, সানাউল্লাহ নূরী, শেখ ফজলুর রহমান, আবদুল মুকীত চৌধুরীসহ অনেকের লেখায় সমৃদ্ধ ছিল।[৪৫]

মাসিক দ্বীন-দুনিয়া

১৯৮০ সাল থেকে চট্টগ্রামের বায়তুশ শরফ থেকে মাসিক 'দ্বীন-দুনিয়া' নামে একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। এই পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মরহুম পীর সাহেব মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার। পত্রিকাটি প্রতি বছর সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে বিশেষ সীরাত সংখ্যা প্রকাশ করে আসছে।

মাসিক আল ইহসান

বায়তুশ শরফ ঢাকা থেকে সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে ১৯৯৯ সাল থেকে 'আল ইহসান' নামে একটি গবেষণাধর্মী বিশেষ সংকলন প্রকাশ করে যাচ্ছে। সীরাতুন্নবী (সা) ২০০০ উপলক্ষে 'আল ইহসান' এর সংকলনটি আগেরটির তুলনায় আরো বেশী সমৃদ্ধ।[৪৬] আল ইহসান-এর তৃতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যা ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উপলক্ষে অত্যন্ত সমৃদ্ধ সীরাত সংখ্যা। ২০০ পৃষ্ঠার এই সমৃদ্ধ সংখ্যাটিতে নবী জীবনের নানা দিক নিয়ে বরেণ্য মনীষী, গবেষকগণ এবং কবি-সাহিত্যিকগণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং রাসূলের শানে কবিতা লিখেছেন।

আল ইহসান এর দুটি সংখ্যারই সম্পাদকীয় লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠতম কবি আল মাহমুদ। সংকলন দুটিকে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) সাহিত্য সংকলন নামে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। 'সাহিত্য বিচারে মহানবী (সা)-এর প্রখর দূরদর্শিতা', ও 'ভাষা চর্চায়

---

৪৫. সৈয়দ ইমদাদুল হক সম্পা., *সীরাত স্মরণিকা*, ঢাকা : স্বদেশ সুসমাজ সমিতি, ১৪০০ হি।

৪৬. অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল আলীম, *আল ইহসান*, ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) সাহিত্য সংকলন, ঢাকা : আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ১৪২০ হি।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সা)-এর আদর্শ', সীরাতে রসূল (সঃ) অনুধাবনের পদ্ধতি, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ ও আমাদের সমাজ, বিজ্ঞানের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শিক্ষা প্রভৃতি তথ্যসমৃদ্ধ লেখা।[৪৭]

মাসিক নিজউ লেটার ও কিশোর নিউজ লেটার

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের পর থেকে ইরানী দূতাবাস 'নিউজ লেটার' ও 'কিশোর নিউজ লেটার' নামে দু'টি বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে। সাময়িকী দু'টি বহুল পঠিত ও অত্যন্ত জনপ্রিয়। এর মধ্যে ১৯৯৫ সালে সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে নিউজ লেটার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর প্রচ্ছদের এ সংখ্যাটিতে লিখেছেন ইব্রাহিম মদিববো উমার, মুহাম্মদ 'আলী রেয়ায়ী, ড. 'আলী লারিজানী, শেখ মুহাম্মদ আবু যাহরাহ, হেদায়াতুল্লাহ হুপুবেসফের প্রমুখ।[৪৮] অন্যদিকে তৃতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা কিশোর নিউজ লেটারটি সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এটিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নিয়ে লিখেছেন জহীরউদ্দীন মাহমুদ, এ কে এম মাহবুবুর রহমান, আবদুল মুকীত চৌধুরী, কাজী বেলায়েত প্রমুখ।

আল বাছায়ের

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন[৪৯] ১৯৯৮ সাল থেকে অনিয়মিতভাবে 'আল বাছায়ের' নামে একটি গবেষণা সাময়িকী প্রকাশ করে আসছে। এর মধ্যে জুলাই ১৯৯৮, জুন ১৯৯৯ এবং জুলাই ২০০০ সংখ্যা ৩টি সীরাতুন্নবী সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ সম্পাদিত সীরাতুন্নবী সংখ্যা '৯৮ সংখ্যাটিতে আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, নঈম সিদ্দিকী, সাইয়েদ আসেম মাহমুদ, মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ, কারী আহমদ পানিপথী, তাওফীকুল হাকীম মিশরী, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, মাওলানা

---

৪৭. অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল আলীম, আল ইহসান, *ঈদে মিলাদুন্নবী সা. সাহিত্য সংকলন-২০০১*, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বায়তুশ শরফ আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ঢাকা শাখা, ১২ রবিউল আউয়াল, ১৪২২ হি।

৪৮. নিউজ লেটার, ঢাকা : ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, আগস্ট ১৯৯৫।

৪৯. লন্ডন ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন'। কুর'আনের উপর বর্তমান বিশ্বের চাহিদার আলোকে বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনার মহান ব্রত নিয়ে ১৯৯২ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি 'কোরআনের অভিধান', সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ রচিত বিশ্বখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' প্রকাশ করে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়া 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন' ১৯৯৭ সালে খাদিজা আখতার রেজায়ীর 'আর রাহীকুল মাখতুম' এবং ২০০০ সালে খাদিজা আখতার রেজায়ী সম্পাদিত 'তিনি চাঁদের চেয়ে সুন্দর' নামে সীরাত গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন ভিত্তিক প্রামাণ্য ছবি 'দি ম্যাসেজ'-এর বাংলায় রূপান্তর করেও প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক প্রশংসা লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

আশরাফ আলী থানভী (র) ও খাদিজা আখতার রেজায়ীর লেখা ছাড়াও 'কোরআনের ভাষায় কথা বলা' শিরোনামে মোহাদ্দেস আব্দুল্লাহ বিন মোবারক (র)-এর একটি চমৎকার লেখা প্রকাশিত হয়েছে।[৫০]

মুহাম্মদ (সা) স্মারক

ঢাকা ট্রাস্ট একটি মুসলিম সেবা সংস্থা। ইসলামী মূল্যবোধের জাগরণ, সুন্দর সাবলীল ইসলামী ভাবধারায় নাগরিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলাই ট্রাস্টের লক্ষ্য। প্রতিষ্ঠানটি '২০০০ সাল হোক রাসূলে পাকের (সা) সীরাত বাস্তবায়নের সাল' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে দেশী-বিদেশী বিশিষ্ট লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ 'মুহাম্মদ (সা) স্মারক' নামে একটি মূল্যবান সংকলন প্রকাশ করেছে। এতে মুফতী উবায়দুল্লাহ, মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী (র), সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, আল্লামা মুহম্মদ মনযুর নূ'মানী (র), আবদুর রহমান আযযাম, মুহাম্মদ আল গাযালী মিশরী, অধ্যাপক কে এস রামকৃষ্ণ রাও, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ, মাওলানা উবায়দুল হক, মাওলানা মুহীউদ্দিন খান, আবু জাফর প্রমুখ লেখকদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালেও প্রতিষ্ঠানটি সীরাতের ওপর স্মারক প্রকাশ করেছে।[৫১]

মিলাদুন্নবী (সা)

'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্মকর্তা কল্যাণ সংস্থা' ১৯৯৯ সালের জুন মাসে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উপলক্ষে 'মিলাদুন্নবী (সা)' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করে। সংকলনটিতে যারা প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন তারা হলেন : আবদুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ শামসুল হুদা, অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম, ডা. শাহাদাত হোসেন, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবদুর রব, মুহাম্মদ সিরাজুল হক, মুস্তাফা মাসুদ, মসউদ-উশ-শহীদ, শেখ তোফাজ্জল হোসেন, আবদুল বারিক ভূঁইয়া, নূরুল ইসলাম মানিক, নাসির হেলাল প্রমুখ।[৫২] এর পরের বছরও একই নামে মিলাদুন্নবী (সা) ২০০০ স্মরণিকা প্রকাশ করেছে। এই সংখ্যাটিও অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

মাসিক আল হক

জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম-এর মুখপত্র ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণা বিষয়ক পত্রিকা 'মাসিক আল হক' পত্রিকাটি ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ১০ বছর ধরে নিয়মিত

---

৫০. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ সম্পা., *আল বাছায়ের*, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ঢাকা : আল কোরআন একাডেমী লন্ডনের বাংলাদেশ কার্যালয়, ১৯৯৮।

৫১. ঢাকা ট্রাস্ট প্রকাশিত, *মুহাম্মদ (সা) স্মারক*, ঢাকা : ঢাকা ট্রাস্ট, ২০০০।

৫২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্মকর্তা কল্যাণ সংখ্যা প্রকাশিত, *মিলাদুন্নবী (সা)*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্মকর্তা কল্যাণ সংস্থা, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয়ে আসছে। সাথে সাথে প্রতি বছরের রবিউল আউয়াল সংখ্যাটিকে সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করে থাকে। সে অনুযায়ী জুন ২০০০ সংখ্যাটিও যথারীতি সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাটিতে লিখেছেন : আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওফ নদভী, রিজওয়ান জমীরাবাদী, অধ্যক্ষ আবদুল করীম, আবদুর রহমান চৌধুরী, মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসানাবাদী, কাজী আবুল কালাম বিন সিদ্দীক, মুফতী রহীমুল্লাহ, মু. আবদুল গণি খান সাহিত্য বিশারদ, মুহাম্মদ মুজিবুল হক, ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী, মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), মুহাম্মদ নোমান হাসনা আমীরাবাদী, মাহফুজুর রহমান প্রমুখ।[৫৩] দর্শম বর্ষের ১০৩ নম্বর সংখ্যাটিও সীরাত সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত মুহাম্মদ সা.-এর আবির্ভাব : এক নতুন পৃথিবী, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনের রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে মদীনার সমাজ সংস্কৃতি, অধ্যক্ষ ডা. মোহাম্মদ আইয়ুব-এর সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধে মহানবী সা.-এর আদর্শ, এডভোকেট জিয়া আহসানের বিশ্ব মানবাধিকারের সফল প্রবক্তা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সা., মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদীর বিশ্বনবীর সার্বজনীনতা, মুফতী আবদুল হকের প্রিয়তম রাসূলের সা. মহব্বত : আমাদের জীবনে এর প্রতিফলন প্রভৃতি লেখাগুলো অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী।[৫৪]

মাসিক আর রশীদ

১৯৯১ সাল থেকে আঞ্জুমানে ছোলতানিয়া বাংলাদেশ ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনিক মাসিক হিসেবে 'মাসিক আর রশীদ' প্রকাশ করে আসছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রতিবছর সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে নিয়মিত এ মাসিক পত্রিকাটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে আসছে। দশম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি সীরাতুন্নবী (সা) ২০০০ উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এ সংখ্যার লেখকক্রমে আছেন মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), হাফেজ মাওলানা আহমদ গণী, মাওলানা মুহাম্মদ জমির উদ্দীন, আশরাফ আলী থানভী (র), রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, ডা. আবদুল হাই (র), মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মতিন, মাওলানা মহিউদ্দীন খান প্রমুখ।[৫৫]

মাসিক আত-তাওহীদ

জানুয়ারী ১৯৭১ সাল থেকে আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া, পটিয়া থেকে নিয়মিত 'মাসিক আত-তাওহীদ' প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রায় প্রতি সংখ্যায় সীরাতের উপর কোন না কোন লেখা থাকলেও সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে রবিউল আউয়ালের সংখ্যাটিকে তারা বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করে।

---

৫৩. সম্পাদনা পরিষদ সম্পা., *মাসিক আল হক*, সীরাত সংখ্যা, চট্টগ্রাম : দারুল মা'আরিফ, ২০০০।

৫৪. সম্পাদনা পরিষদ সম্পা., *মাসিক আল হক*, সীরাত সংখ্যা, চট্টগ্রাম : দারুল মা'আরিফ, মার্চ ২০০৭।

৫৫. আঞ্জুমানে ছোলতানিয়া বাংলাদেশ প্রকাশিত, *মাসিক আর রশীদ*, সীরাত সংখ্যা, চট্টগ্রাম : আঞ্জুমানে ছোলতানিয়া বাংলাদেশ, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

সে অনুযায়ী আত-তাওহীদ-এর জুন ২০০০ সংখ্যাটিকে সীরাত সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। এ সংখ্যায় লিখেছেন, মাওলানা মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী, মোহাম্মদ জাকারিয়া হাসানাবাদী, কাজী তাজুল ইসলাম গৌহরী, মোঃ যফীরুদ্দীন মিফতাহী, আবদুল গনি খান সাহিত্য বিশারদ, কবি আবদুল আলীম খাঁ প্রমুখ।[৫৬]

আবে হায়াত

ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতির উজ্জীবন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সীরাতচর্চার উদ্দেশ্যে আবদুল কাদির আল-হাসান-এর সম্পাদনায় 'আবে হায়াত' চমৎকার প্রচ্ছদের সীরাত সংকলন ২০০০ প্রকাশিত হয়েছে। আবে হায়াতের লেখক : এম মাওলানা আতাউর রহমান খান, উবায়দুর রহমান খান নদভী, ডা. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ প্রমুখ।[৫৭]

আলোর ফুল

১৯৮৬ সালে সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে দোলাইরপাড় মসজিদ পাঠাগারের উদ্যোগে তারেক মুহাম্মদ তওফীকুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'আলোর ফুল' নামে একটি সীরাত স্মরণিকা। এতে লেখক ছিলেন : কবি ফররুখ আহমদ, অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম, আবদুল মুকীত চৌধুরী, মাওলানা আবদুল মতিন, অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের, এডভোকেট আবুল কালাম বদরুদ্দোজা, লুৎফর রহমান রনি, মুকুল চৌধুরী ও নূরুল ইসলাম মানিক।[৫৮]

প্রত্যয়

১৯৭৮ সাল থেকে ব্যাংকার্স কল্যাণ পরিষদ 'প্রত্যয়' নামে একটি অনিয়মিত সংকলনের ৬/৭টি সংখ্যা এ পর্যন্ত প্রকাশ করেছে। এরপর ১৯৮৮ সাল থেকে সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক 'প্রত্যয়' সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে।

---

৫৬. আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া থেকে প্রকাশিত, *মাসিক আত-তাওহীদ*, সীরাত সংখ্যা, চট্টগ্রাম : আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া, ২০০০।

৫৭. আবদুল কাদির আল-হাসান সম্পা., *আবে হায়াত* (সীরাত সংকলন), কিশোরগঞ্জ : আবাবীল সাহিত্য সংসদ, ২০০০।

৫৮. তারেক মুহাম্মদ তওফীকুর রহমান সম্পা., *আলোর ফুল (সীরাত সংকলন)*, ঢাকা : দোলাইরপাড় মসজিদ পাঠাগার, ১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

চেতনা

১৯৯০ সালে সম্পাদনা পরিষদের সম্পাদনায় 'চেতনা' নামে সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক প্রথম প্রকাশিত হয় ইসলামী ব্যাংক অফিসার কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে। এরপর ১৯৯২ সালে আরও একটি সীরাত সংখ্যা ঐ 'চেতনা' নামেই প্রকাশিত হয়।[৫৯]

মাসিক ছাত্র সংবাদ ও কিশোর কণ্ঠ

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের[৬০] নিয়মিত প্রকাশনা 'ছাত্র সংবাদ' ও 'কিশোর কণ্ঠ'। ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি বছর সংগঠনটি সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে আকর্ষণীয় সীরাত সংখ্যা প্রকাশ করে থাকে।

সাপ্তাহিক সোনার বাংলা

সাপ্তাহিক সোনার বাংলা সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে সব সময়ই ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে থাকে। তবে মাঝে বিশেষ সংখ্যা হিসেবে ম্যাগাজিন সাইজের আকর্ষণীয় কয়েকটা সীরাতুন্নবী (সা) প্রকাশ করেছে। যেমন ১৪১১ হিজরী মোতাবেক ১৯৯০ সালে যে সংখ্যাটি প্রকাশ করে তাতে লেখা ও লেখক ছিলেন : নবুয়ত কি– সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা–সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি–অধ্যাপক গোলাম আযম, মানবীয় মমতাবোধ ও বিশ্বপ্রেম–দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য : সময়ের দাবী–আবুল আসাদ, রক্ত স্মৃতি তায়েফ–আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, ইসলামী আন্দোলনের প্রতিবন্ধকতা ও আমাদের করণীয়–মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, রসূলুল্লাহর (সা.) সমাজ চেতনা–আবদুল মান্নান তালিব, মহানবীর একটি অলৌকিক ঘটনা–জুলফিকার আহমদ কিসমতী, মদীনা সনদ ও তার কতিপয় ধারা–মুহাম্মদ নুরুযযামান, বিশ্বনবীর সামাজিক আদর্শ ও উহার অনুশীলন-মীম ফজলুর রহমান, বিশ্বনবীর তিরোধান, সীরাতে ইব্‌ন হিশাম থেকে মহানবীর (সা) অনন্য দশটি বৈশিষ্ট্য–আ ন ম আবদুশ শাকুর, বাংলা ভাষায় মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী–মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।

---

৫৯. সম্পাদনা পরিষদ সম্পা., *চেতনা*, সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক অফিসার কল্যাণ পরিষদ, ১৯৯০।

৬০. দেশের ছাত্র সমাজের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী ইসলামী ছাত্র শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ইসলামী ছাত্র শিবির সর্ববৃহৎ সংগঠন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি ইসলামের প্রচার ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সীরাতচর্চায় অপরিসীম অবদান রেখেছে। বাংলাদেশে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শ বাস্তবায়নে সংগঠনটি নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। শিবির সীরাতকে কেন্দ্র করে রং-বেরঙের স্টিকার প্রকাশ করে থাকে। গাড়ীর সামনে এবং ঘরের দরজায় কালিমা তায়্যিবা খচিত স্টিকার লাগিয়ে দেয়। এ ছাড়া সংগঠনটির মুখপত্র ছাত্র সংবাদ ও কিশোর কণ্ঠ নিয়মিত প্রকাশনা সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে আকর্ষণীয় সীরাত সংখ্যা প্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

মাসিক পৃথিবী

ইসলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক গবেষণার মাধ্যমে জাতির সামনে তুলে ধরার মানসে ১৯৮১ সালে পত্রিকাটি প্রকাশনা শুরু করে। নিয়মিত প্রকাশিত ইসলামী গবেষণা পত্রিকা 'মাসিক পৃথিবী'। পৃথিবী বিশেষ সংখ্যা হিসেবে সীরাত সংখ্যা প্রকাশ না করলেও প্রায় প্রতিটি সংখ্যাতেই থাকে সীরাতের ওপর কোন না কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

মাসিক কলম

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে 'মাসিক কলম' নামে আবদুল মান্নান তালিবের সম্পাদনায় একটি ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে মোশাররফ হোসেন খান-এর সম্পাদনায় পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। ইসলামী সাহিত্য ও সাহিত্যিক সৃষ্টিতে এর ভূমিকা অনন্য। রাসূলের জীবন ও আদর্শের আলোকে সাহিত্যের পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য পত্রিকাটি নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে মহানবীর সাহিত্য প্রীতি, সাহাবীদের সাহিত্য চর্চা এসব বিষয়ে গবেষণামূলক লেখা প্রকাশ করে ইসলামী সাহিত্য চর্চা ও এর পৃষ্ঠপোষকতা করা যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত –এ বিষয়টি তারা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে।[৬১]

মাসিক কাবার পথে

সাইফউদ্দীন ইয়াহইয়া সম্পাদিত মাসিক 'কাবার পথে' ১৯৯৩ সালে প্রকাশনার পর থেকে গত ১৪ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। এবার সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে প্রতি বছর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে থাকে। জুন ২০০০ সংখ্যাটি সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।[৬২]

মাসিক তাহজীব

মুহিউদ্দীন শামী সম্পাদিত 'তাহজীব' ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়। 'তাহজীব'-এর এ সংখ্যাটির লেখক ছিলেন : মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান নদভী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, এম এ সোবহান, মনসুর আহমেদ, তওফীকুল হাকীম প্রমুখ।

মাসিক আদর্শ নারী

১৯৯৪ সালে জবিনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে প্রকাশনা শুরু করে মাসিক আদর্শ নারী। ১৫টি সীরাত বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে মাসিক আদর্শ নারীর জুন

---

৬১. আবদুল মান্নান তালিব সম্পা., *মাসিক কলম*, বর্ষ ১৩ সংখ্যা ৬, জুন ১৯৯২; বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১১, নভেম্বর ১৯৯২; বর্ষ ৯ সংখ্যা ১১, নভেম্বর ১৯৮৮; বর্ষ ১৫ সংখ্যা ১০, অক্টোবর ১৯৯৪ দ্র.।

৬২. সাইফউদ্দিন ইয়াহইয়া সম্পা., *মাসিক কাবার পথে*, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ঢাকা, জুন ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

২০০০ সংখ্যাটি 'সীরাতুন্নবী (সা) বিশেষ সংখ্যা' হিসেবে। মুফতী আবুল হাসান সম্পাদিত এ পত্রিকাটি ১৯৯৪ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। মার্চ ২০০৭ সংখ্যাটি সীরাতুন্নবী (সা) -এর মহান জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সীরাত প্রবন্ধসমূহ স্থান পেয়েছে।[৬৩]

সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান

মুস্তফা মঈন উদ্দীন খানের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান' প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯১ সাল থেকেই বর্ধিত কলেবরে সীরাতুন্নবী (সা) বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে আসছে। ২৩-২৯ জুন ১৯৯৯ সীরাতুন্নবী সংখ্যা ও সীরাতুন্নবী (সা) ২০০৭ সংখ্যাটি সমৃদ্ধ কলেবরে প্রকাশিত হয়েছে।

মাসিক রহমানী পয়গাম

শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক মাসিক রাহমানী পয়গাম পত্রিকাটি ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। মুফতী মাওলানা মনসুরুল হক সম্পাদিত রাহমানী পয়গাম ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যাটি সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন : কবি আল্লামা ইকবাল, সাইয়েদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, মাওলানা আজিজুল হক, মুফতী মাওলানা মনসুরুল হক খান, বিচারপতি মাওলানা তকী 'উসমানী প্রমুখ। পত্রিকাটি প্রতি বছর সীরাতুন্নবী (সা) বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে আসছে।[৬৪] মার্চ ২০০৭ সংখ্যাটিতে বেশ কয়েকটি মূল্যবান সীরাত প্রবন্ধ রয়েছে।[৬৫]

মাসিক আল কালাম

আবু তাহের মেছবাহ সম্পাদিত 'মাসিক আল কালাম' পত্রিকাটি রবিউল আউয়াল ১৪২১ হিজরী সংখ্যা প্রকাশ করেছে। আসলে আল-কালাম এর এ সংখ্যাটি 'পুষ্প' নামে ছোটদের উপযোগী লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। উদ্যোগটি মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য।[৬৬]

মাসিক দারুস সালাম

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। রবিউল আউয়াল সংখ্যাটিকে সীরাত সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর প্রায় প্রতি সংখ্যায়ই লেখা প্রকাশিত হয়।

---

৬৩. মুফতী আবুল হাসান শামসাবাদী সম্পা., *মাসিক আদর্শ নারী*, সীরাতুন্নবী (সঃ) বিশেষ সংখ্যা, ১৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, মার্চ ২০০৭।

৬৪. মাওলানা মামুনুল হক সম্পা., *মাসিক রহমানী পয়গাম*, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ঢাকা, জুন ১৯৯৯।

৬৫. মাওলানা মামুনুল হক সম্পা., *মাসিক রহমানী পয়গাম*, ১৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, সফর-রবিউল আউয়াল ১৪২৮ হি।

৬৬. আবু তাহের মেজবাহ সম্পা., *মাসিক আল কালাম*, পবিত্র রবিউল আউয়াল হিজরী সংখ্যা, ঢাকা, ১৪২১ হি।

Dhaka University Institutional Repository

মাসিক দারুস সালাম শুধু একটি পত্রিকাই নয়, এই পত্রিকাকেন্দ্রিক দারুস সালাম পাবলিকেশন্স নামে একটি প্রকাশনাও আছে। এই প্রকাশনা থেকে সীরাতের উপর কিছু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। মুহাম্মদ আহমদ বসুমাইল রচিত এবং ড. মুজিবুর রহমান অনূদিত 'মহান বদরের যুদ্ধ', মাওলানা হাফিজ শাইদা আইনুল বারী রচিত 'আইনে তুহফা সালাতে মুস্তফা ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

ত্রৈমাসিক প্রেক্ষণ

খন্দকার আব্দুল মোমেনের সম্পাদনায় ১৯৯৪ সাল থেকে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'প্রেক্ষণ' প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রেক্ষণের প্রতিটি সংখ্যাই পাঠক ও কবি-সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। পত্রিকাটি মহানবী সংখ্যা হিসেবে পঞ্চম বর্ষ, ২য় সংখ্যা প্রকাশ করেছে। ২২৪ পৃষ্ঠার মনোরম প্রচ্ছদের এ সংখ্যাটিতে প্রকাশিত হয়েছে, আল মি'রাজ, শাসনতন্ত্র, সাহিত্য সংস্কৃতি, শিক্ষা, অর্থনীতি, আইন ও বিচার, যুদ্ধ ও শান্তি, মহাজাগতিক, হাস্যকৌতুক ইত্যাদি বিষয়ে ২৮টি প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

মাসিক অঙ্গীকার ডাইজেস্ট

১৯৯০ সাল থেকে আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহর সম্পাদনায় মাসিক অঙ্গীকার ডাইজেস্ট প্রকাশিত হয়ে আসছে। এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প এবং তাঁকে নিবেদিত কবিতা প্রকাশিত হয়ে এ দেশে সীরাত চর্চায় অবদান রাখছে।[৬৭]

মাসিক মুসলিম ডাইজেস্ট

মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের সম্পাদনায় ১৯৯৯ সালে 'মুসলিম ডাইজেস্ট প্রকাশনা শুরু করে। পত্রিকাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শের নানা দিক নিয়ে গত ৮ বছর অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। পত্রিকাটির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইসলামের বিভিন্ন দিক জনগণের সামনে তুলে ধরা। জানুয়ারী ২০০৭ সংখ্যাটিতে এ ধারার প্রয়াস লক্ষ করা যায়।[৬৮]

মাসিক আল ফুরকান

মাসিক আল ফুরকান একটি মননশীল পত্রিকা। হিজবুল কুররার মুখপত্র হিসেবে গত ২৩ বছর যাবত পত্রিকাটি ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ এবং সীরাত চর্চায় অনন্য অবদান রেখে আসছে। পত্রিকাটির রবিউল আউয়াল মাসের সংখ্যা সীরাত সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়। এসব সংখ্যায় দেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সীরাতকারগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে

---

৬৭. আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ সম্পা., *মাসিক অঙ্গীকার ডাইজেস্ট*, ৪র্থ বর্ষ ৮ম, ৯ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৫।

৬৮. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *মাসিক মুসলিম ডাইজেস্ট*, ঈদ সংখ্যা, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

যুগোপযোগী প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে থাকেন। এপ্রিল ২০০৭ সালের সংখ্যাটিও সীরাত সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় সালেহ মতীন, অধ্যক্ষ ডাঃ মাওঃ মোহাম্মদ আইয়ুব, মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, নূরুল ইসলাম মানিক, মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী প্রমুখ সীরাত বিষয়ক সারগর্ভ ও তথ্য-সমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখেছেন।[৬৯]

মাসিক রহমত

সীরাতুন্নবীর আলোকে আলোকিত সমাজ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৯২ সালে মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা করেন। নিয়মিত সীরাত বিষয়ক নানাবিধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করে পত্রিকাটি সীরাতচর্চায় ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে। পত্রিকাটির সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যাগুলো তথ্যসমৃদ্ধ এবং মূল্যবান। ১৫ বর্ষ ১ম সংখ্যাতেও সীরাত বিষয়ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।[৭০]

মাসিক হুদা

কুমিল্লা সোনাকান্দা দারুল হুদা দরবার শরীফের পীর আবু বকর মুহাম্মদ সামছুল হুদা মাসিক হুদা পত্রিকাটি ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শের আলোকে যুগ সমস্যার সমাধানে নানাবিধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করে ইতোমধ্যে সুধী সমাজে ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। প্রতিটি সংখ্যায় তাফসীরুল কুর'আন, দরসে হাদীস, ফতোয়ায়ে দারুল হুদা : পাঠকের জিজ্ঞাসার পাশাপাশি ইসলামী সমাজ-সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, আইন আদালত ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। ২য় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা সীরাত বিষয়ক তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ-নিবন্ধে ভরপুর।[৭১]

মাসিক চিন্তা ভাবনা

২০০৩ সালে ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন-এর সম্পাদনা ও ড. আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর-এর নির্বাহী সম্পাদনায় চিন্তাশীল পাঠকের মননশীল মাসিক হিসেবে প্রকাশনা শুরু করে। পত্রিকাটি প্রতি বছর সীরাত সংখ্যা প্রকাশ করে থাকে। এতে মননশীল লেখকদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১ম বর্ষের ৭ম সংখ্যা সীরাত সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়।

---

৬৯. এম আতিকুল হক সম্পা., *মাসিক আল ফুরকান*, সীরাতুন্নবী (সা) ও বাংলা নববর্ষ সংখ্যা, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৭।

৭০. মনযূর আহমাদ, *মাসিক রহমত*, ১৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৭।

৭১. আবু বকর মুহাম্মদ সামছুল হুদা সম্পা., *মাসিক হুদা*, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, কুমিল্লা : দারুল হুদা দরবার শরীফ, ডিসেম্বর-জানুয়ারী ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া থেকে প্রকাশিত এ. এস. এম. অল্লিউল্লাহ নোমান ও সিদ্দিকুর রহমান সম্পাদিত 'সুবহে সাদিক', মুহম্মদীয়া জামেয়া শরীফের মুখপাত্র মুহাম্মদ মাহবুব আলম সম্পাদিত 'আল বাইয়্যিনাত', বাংলাদেশ আনজুমানে আশেকানে মোস্তফা (সা) থেকে প্রকাশিত ও অধ্যাপক আলহাজ মোঃ আবদুল হাই সম্পাদিত 'সোনার মদিনা', ঢাকার মোহাম্মদপুরের কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক হাফেজ মোহাম্মদ আবদুল জলীল সম্পাদিত 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' সংকলনগুলো নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মহান আদর্শ ও জীবন তুলে ধরে সীরাত চর্চা করে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকেও এ উপলক্ষ্যে বার্ষিকী বা স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিটি স্মরণিকায় হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিত বিষয়ে সমৃদ্ধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়ে আসছে।

সারা বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে অসংখ্য দৈনিক পত্রিকা। উল্লেখ্য যে, প্রায় সব পত্রিকায় প্রতি বছর ১২ রবিউল আউয়াল উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে থাকে। এমনকি ঐ দিন সরকারী ছুটি থাকে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের এ ধারাটি বাংলা গদ্য সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখায় পরিণত হয়েছে। প্রতি বছর বাংলাদেশে হযরত মুহাম্মদ (সা) বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এ আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, এটা অগণিত ও খুবই বেগবান। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মানে এটি চলতেই থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : দুই

হযরত মুহাম্মদ (সা)-চরিতচর্চা বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধ

বিষয় বিন্যাস ও পর্যালোচনা

আল্লাহ তা'আলা কুর'আন মজীদে শেষ ও শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে মানব জাতির সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি রহমতের বার্তা নিয়ে এ পৃথিবীতে আগমন করেন। তাঁর পবিত্র জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা যত বেশী হবে ততই মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত পরিবেশ তৈরি হবে।

বিভিন্ন ভাষায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র জীবন কথা ও আদর্শ সম্পর্কে প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে। সমকালে ও আগামীতে এ আলোচনা-পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ-মূল্যায়নের ধারা অব্যাহত থাকবে এবং ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির সর্বোচ্চ ও একক নির্দেশনা দান করে যাবে। বিশ্ব ভাষাসমূহের এ কল্যাণ প্রচেষ্টার পরিসরে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ সাহিত্যে নবী-জীবন চর্চা-গবেষণার ধারাটি বিশেষ উজ্জ্বল ভূমিকা রেখে আসছে।

বাংলা সাহিত্যের গদ্য শাখাটি সুপ্রাচীন নয়। বৃটিশ শাসনকালে (১৭৫৭-১৯৪৭) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনের সহায়তায় বিশেষ করে ড. উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) ও তার সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ সূচিত হয়। এ সময় খ্রিষ্টান পাদরিরা ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে গিয়ে অনেক পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮০২ সালে *মুহম্মদের বিবরণ* শিরোনামে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে অজ্ঞাত লেখক রাসূল (সা)-এর প্রথম গদ্য জীবনী লেখেন-যা ছিল কুৎসাপূর্ণ রচনা। শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩৩) বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সীরাতকার। মোহনী মোহন মজুমদার কলকাতা থেকে ১৮৮৭ সালে তাঁর গ্রন্থ *হযরত মুহাম্মদের (দ) জীবন চরিত ও ধর্মনীতি* প্রকাশ করেন। এরপর থেকে এ ধারা অত্যন্ত গতিশীলতার সাথে অব্যাহত আছে।

বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ সাহিত্যে সীরাত চর্চা ব্যাপকতর হচ্ছে পত্রিকা ও সাময়িকীর সীরাত স্মারক ও সংখ্যার মাধ্যমে। প্রতিবছর সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে এসব স্মারক প্রকাশিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে এর প্রচলন শুরু হয় সাপ্তাহিক মদীনার সীরাত সংখ্যা প্রকাশের ধারাবাহিকতায়। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে এ প্রত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। প্রথম সংখ্যাটিই সীরাত সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়। সীরাতুন্নবী উপলক্ষে এর প্রকাশনা ধারাবাহিক হওয়ায় ধীরে ধীরে এটা

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং অন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকেও নতুন নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হতে থাকে। এ জাতীয় উল্লেখযোগ্য ক'টি প্রকশনা হচ্ছে, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা*, বাংলাদেশ সীরাত মিশনের *সীরাত মুবারক*, *মাসিক তরজুমান*, *সিরাজাম মুনীরা*, *মহানবী স্মরণিকা*, *তাহজীব*, *সপ্তডিঙ্গা*, *অগ্রপথিক*, *সবুজপাতা*, *মাসিক আল-উসওয়া*, *ইরান কালচারাল সেন্টারের নিউজ লেটার* এবং *কিশোর নিউজ লেটার*, *মাসিক পরওয়ানা*, *আলোর ফুল*, *আল-ইসলাহ*, *মাসিক দীনে হানিফ*, *মাসিক দ্বীন-দুনিয়া* ইত্যাদি। এছাড়াও দৈনিক পত্রিকাগুলো ১২ রবি'উল আউয়াল সংখ্যায় মুহাম্মদ (সা) চরিত বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করে।

বর্তমানে প্রবন্ধ সাহিত্যে সীরাতের প্রসার সত্যিই বড় ধরনের ব্যাপকতা লাভ করেছে। বাংলাদেশের প্রায় সবক'টি দৈনিক ক্রোড়পত্র না হলেও অন্তত একটি সময়োপযোগী প্রবন্ধ ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) দিবসে প্রকাশ করে। কমপক্ষে ২০/২৫টি মাসিক পত্রিকা *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা)* সংখ্যা প্রকাশ করে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকে শুরু করে বেসরকারি উদ্যোগে পাড়া মহল্লা, মাদরাসা-স্কুলে ঈদে মিলাদুন্নবী স্মরণিকা প্রকাশিত হয় গ্রাম-শহর তথা বাংলাদেশের সব জেলায়। প্রতি বছর কেবল রবিউল আউয়াল মাসে কত সংখ্যক প্রবন্ধ সারা বাংলাদেশে প্রকাশিত হয় তার সঠিক পরিসংখ্যান বের করা সত্যিই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডারের মূল্যায়নও তাই অনেকটা অসম্ভব কাজ।

এই গবেষণায় তাই বাংলাদেশের সেরা প্রবন্ধ সংকলনসমূহের পর্যালোচনাকে পরিধি হিসেবে স্থির করে কাজ করা হয়েছে। এই বিবেচনায় প্রধানত ১৯৯০ থেকে গত ২০/২১ বছরের *মাসিক মদীনা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাসিক প্রকাশনা *অগ্রপথিক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা* এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা ত্রৈমাসিক *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায়* প্রকাশিত মুহাম্মদ (সা) বিষয়ক প্রবন্ধকে পর্যালোচনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক এই সময়ের প্রবন্ধ পর্যালোচনা করে গবেষক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সংখ্যার বিচারে প্রবন্ধ সাহিত্যের উৎকর্ষ ঘটলেও লেখা, লেখার মান, শিরোনামের আধুনিকায়ন ও সর্বোপরি সম্পাদনার মান প্রশ্নাতীত নয়। এ ছাড়া বৈশিষ্ট্যগত কারণে কোন একক স্মারক গ্রন্থ বা স্মরণিকায় পূর্ণাঙ্গভাবে মুহাম্মদ (সা) জীবনচরিত উপস্থাপনও সম্ভব নয়। তবে আশার কথা হচ্ছে মৌলিক সীরাত চর্চার পাশাপাশি যুগ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চার ক্রমবর্ধমান দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চা বিষয়ক প্রবন্ধসমূহকে বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করা ধৃষ্টতা তূল্য কাজ। কারণ বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনের বিস্তৃতি এতটা ব্যাপক যে, প্রাবন্ধিকগণ প্রায় সব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এই বিস্তৃত জীবনালেখ্যের চর্চিত কাজসমূহকে বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস– তা এক ধরনের রাসূলুল্লাহ (সা) জীবনের বিন্যাসের শামিল বৈকি! এ বিবেচনায় এটি ধৃষ্টতাই বটে। কিন্তু কার্যত

Dhaka University Institutional Repository

এটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের নানা অধ্যায়ের বিন্যাস নয়; এটি কেবলই বিগত ২০ বছরে রচিত বাংলা প্রবন্ধসমূহের বিন্যাস।

এ অভিসন্দর্ভের প্রায় ৬ শতাধিক হাজার নির্বাচিত প্রবন্ধ পর্যালোচনা করে বিবেচ্য প্রবন্ধাবলীকে নিম্নোক্ত বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করা হয়েছে। এতে ধারাবাহিকভাবে এসেছে : ১. কুর'আনের আলোকে, ২. আবির্ভাব ও 'আরব, ৩. নূরে মুহাম্মদী, ৪. নবুওয়াত, খতমে নবুওয়াত ও রিসালাত, ৫. রাহমাতুল্লিল আলামীন, ৬. ইসলাম প্রচার, ৭. ব্যক্তিগত, দৈনন্দিন ও পারিবরিক জীবন, ৮. ইবাদত, ৯. বিশিষ্টতা, ১০. মিরাজ, ১১. পোশাকনীতি, ১২. শ্রেষ্ঠত্ব, ১৩. আদর্শ, ১৪. মানবতা-উদারতা, ১৫. ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের সাথে সম্পর্ক, ১৬. নারী ও শিশু, ১৭. চিকিৎসা বিধান, ১৮. তাসাওউফ, ১৯. জিহাদ যুদ্ধবন্দী ও প্রতিরক্ষা, ২০. হিজরত ও মাদানী জীবন, ২১. সমাজব্যবস্থা, ২২. শিক্ষাব্যবস্থা, ২৩. অর্থব্যবস্থা, ২৪. রাষ্ট্র, প্রশাসন, পররাষ্ট্র ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা, ২৫. সংস্কারক, ২৬. উম্মাহ, ২৭. জীন, ২৮. ভাষণ, ২৯. স্বপ্ন, ৩০. ভবিষ্যত বাণী, ৩১. সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা, ৩২. পার্থিব শেষ দিনগুলো, ৩৩. হায়াতুন্নবী, ৩৪. শাফিউল মুযনিবীন, ৩৫. আখলাক, ৩৬. হুব্বে রাসূল (সা), ৩৭. সন্ত্রাস সংঘর্ষ ও শান্তি, ৩৮. মানবাধিকার, ৩৯. মু'জিযা, ৪০. মূল্যায়ন, এবং ৪১. সীরাত চর্চা।

বিন্যস্ত এ বিষয়সমূহের প্রতিটি বিষয়ে কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া এসব বিষয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের শিরোনাম উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিন্যস্ত এসব বিষয়ের গভীরতা সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা তৈরি হয় এবং ভবিষ্যত গবেষক এ থেকে পথনির্দেশ পেতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

কুর'আনের আলোকে

কুর'আন মজীদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তাই কুর'আনের আলোকে সীরাতে রাসূল আলোচনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক। উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) কে মহানবী (সা)-এর আখলাক বা জীবনাচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি অতি সংক্ষেপে উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন : 'তোমরা কি কুর'আন পড় নি? কুর'আনুল কারীমই তো তাঁর চরিত্র।'[১] হযরত 'আয়িশা (রা)-এর এ মন্তব্য কুর'আনের আলোকে মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চা অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত ভূমিকা রাখে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই শেষনবী - নবুওয়ত ও রিসালাতের যাবতীয় গুণাবলী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। তাই তাঁর যমানা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই একমাত্র আদর্শ; আর এই আদর্শের বিস্তারিত বিবরণই রয়েছে পবিত্র কুর'আনে। পবিত্র কুর'আনের মূল অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে পাঠ করতে হয় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিত বা আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে পাঠ করতে হয় পবিত্র কুর'আন। মূলত একটিকে বাদ দিলে আর একটি বোঝা যায় না।

আল্লাহ তাআলার কালামে প্রিয়নবী (সা) প্রবন্ধে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বিষয়টিকে কতগুলো উপশিরোনামে উপস্থাপন করেছেন। যেমন– জীবন সাধনার সাফল্যের একমাত্র পথ প্রিয়নবী (সা)-এর অনুসরণ; রহমাতুললি আলামীন; খাতেমুন নাবিয়্যীন; প্রিয়নবী (সা)-এর প্রতি আদব; মাকামে মাহমুদ যাঁর জন্য নির্দিষ্ট; প্রিয়নবী (সা)-এর কাজকে আল্লাহ পাকের কাজ বলে ঘোষণা করা; আল্লাহপাকের কালামে প্রিয়নবী (সা)-এর প্রতি তাজীমের শিক্ষা; কুরআনে পাকে হযরত রাসুলুল্লাহ (সা) এর অঙ্গ মুবারকের উল্লেখ ইত্যাদি।[২]

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানের আল কুরআনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এ ধারার আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ। আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য ২৩ বছর ধরে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কুর'আন নাযিল করেন। এতে ১১৪টি সূরা, ৫৫৪টি রুকু' এবং ৬২৩৬টি আয়াত রয়েছে। এর রচনারীতি, বিষয় বিন্যাস, অভিব্যক্তি, ব্যঞ্জনা, আবেদন মানুষের রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই এর মূখ্য চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ (সা.) হলেও কোথাও তাঁর আলোচনা বিশেষভাবে করা হয়নি; বরং বক্তব্য ব্যাপদেশে প্রয়োজনানুযায়ী নানা স্থানে বিভিন্নভাবে তাঁর প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। কখনো

---

১. আবূ 'আব্দির রহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্‌নাসায়ী, *নাসাঈ শরীফ*, ৩য় খ, (কিতাবু কিয়ামিল লাইল), মিসর, মাকতাবাতু হালাবী, ১৩৮৩ হি, পৃ ১৬২।

২. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *আল্লাহ তা'আলার কালামে প্রিয়নবী (সা)*, সীরাতুন্নবী (সঃ) স্মরণিকা/১৪০৭, পৃ ১-৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ নামে, কখনো আহমদ নামে, কখনো পরিচয় জ্ঞাপণ গুণবাচক পদবাচ্যে, কখনো ইংগিতে-ইশারায়, কখনো ঘটনা-পরম্পরায় তাঁর কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে এ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।[৩]

আল কুর'আন ও রাসূল-জীবন প্রবন্ধে বলা হয়েছে : কুরআন মজীদে সেসব করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, জীবনে রয়েছে তার অনুসরণ, অনুকরণ এবং করণ-বর্জনের প্রতিফলন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বনবী (সা)-এর জীবন ও আদর্শকে মানবজাতি এমনকি জিন সম্প্রদায়ের জন্যও আদর্শ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর জীবনাচরণকে করেছেন সবার জন্য অনুকরণীয়।[৪]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ *কুরআন-উল-করীমের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনদর্শন* শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন : আল্লাহর রসূল (সা)-এর প্রতিটি কাজকর্ম হচ্ছে কুর'আনের আইনের অনুসরণ। তিনি তাঁর জীবনে আল কুর'আনের প্রতিটি বাণী এমন কি অক্ষরগুলোকেও রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এজন্য তাঁকে বলা যায় আল কুর'আনের জীবন্ত রূপ।

আল-কুরআনে ও হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে : লাওলাকা লামা খালাকতুল-আখলাক অর্থাৎ আল্লাহর রসূল (সা)-কে উদ্দেশ্য করে স্বয়ং আল্লাহ বলছেন, তোমাকে সৃষ্টি না করলে আমি নভোমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না। এতে স্পষ্টই বুঝা যায়, এ মাটির পৃথিবী এবং নভোমণ্ডলের সব কিছুই আল্লাহ তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাতে আল্লাহর এমন কিছু উদ্দেশ্য ছিল যে এ বিরাট পৃথিবী এবং চন্দ্র-সূর্য, তারকামণ্ডলী পরিবৃত নভোমণ্ডল সৃষ্টি কেবলমাত্র হযরত রসূল-ই-আকরম (সা)-এর জন্যই সৃষ্টি করেছেন।[৫]

কুরআনের আলোকধারায় রচিত এ প্রবন্ধগুলো হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শকে কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপনের প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। এ ধারার আরও কয়েকটি প্রবন্ধের শিরোনাম হলো : মহানবী (সা)-এর উপর নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনের ভূমিকা এবং আমাদের জীবন[৬], আল কুরআনের বাস্তবরূপ :

---

৩. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *আল-কুরআনে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা), সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ১৩৫-১৪২।

৪. মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, *আল কুরআন ও রাসূল-জীবন*, অগ্রপথিক সীরাতুন্নবী (সা.) ১৪১৬ হিজরী।

৫. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *'কুরআন-উল-করীমের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন দর্শন'*, *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হিজরী সংখ্যা, ই ফা বা, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ ১৯-২২।

৬. ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক, 'মহানবী (সা)-এর উপর নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনের ভূমিকা এবং আমাদের জীবন', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল ২০০৭, পৃ ৬৩-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলে করীম (সা)[৭], কুরআনুল করীমে হযরত মুহাম্মদ (সা)[৮], আল-কুরআনের ভাষ্যে মহানবী (সা)[৯] এবং আল- কুরআন ও রাসূল-জীবন[১০], পবিত্র কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সা)[১১], আল-কুরআনে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.), আল কোরআনে হযরত মুহাম্মদ (সা.)[১২], আল কুরআন ও রসূল-জীবন[১৩], কুরআন-উল-করীমের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনদর্শন[১৪], আল্লাহ তা'আলার কালামে প্রিয় নবী (স)[১৫], আল-কুরআনে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)[১৬], কুরআনুল করীমে হযরত মুহাম্মদ (সা)[১৭] ।

---

৭. এস এম সালাহউদ্দীন, 'আল কুরআনের বাস্তবরূপ : রাসূলে করীম (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২২ হি*, জুন ২০০১, পৃ ১৪১-১৪৪ ।

৮. মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, 'কুরআনুল করীমে হযরত মুহাম্মদ (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা* ১৪২০ হি, ই ফা বা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ ৬১-৬৭ ।

৯. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্ওয়ারী, 'আল-কুরআনের ভাষ্যে মহানবী (সা)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, ই ফা বা, ১৯৯৬, পৃ ১১২-১১৪ ।

১০. মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, 'আল কুরআন ও রাসূল-জীবন', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হিজরী সংখ্যা, ই ফা বা, ১৯৯৫, পৃ ৯৩-১০৫ ।

১১. অধ্যাপক মো. ছফিউল্লাহ মাহমুদী, 'পবিত্র কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সা)', *মাসিক মদীনা*, ৪১ বর্ষ ১ম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৫, পৃ ২০-২৪ ।

১২. ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, 'আল কোরআনে হযরত মুহাম্মদ (সা)', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২০ হি/১৯৯৯, পৃ ৩০০-৩০৩ ।

১৩. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, 'আল কুরআন ও রসূল-জীবন', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ৯৩-১০৫ ।

১৪. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, 'কুরআন-উল-করীমের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনদর্শন', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ১৯-২২ ।

১৫. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'আল্লাহ তা'আলার কালামে প্রিয় নবী (স)', *সীরাতুন্নবী স. স্মরণিকা ১৪০৭ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, ১৪ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ ১-৯ ।

১৬. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, 'আল-কুরআনে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ ২৪-৩১ ।

১৭. মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, 'কুরআনুল করীমে হযরত মুহাম্মদ (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) স্মরণিকা ১৪২০ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ১৯৯৯, পৃ ৬১-৬৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

আবির্ভাব ও আরব

পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমন অতীব তাৎপর্যবহ। হযরত 'ঈসা (আ)-এর আবির্ভাবের পর প্রায় ৫৭০ বছর পৃথিবীতে কোন নবী-রাসূল আগমন করেন নি। মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। এ অবস্থা পর্যালোচনা করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাব এবং পৃথিবীর শুষ্ক অঞ্চলের মধ্যভাগ 'আরব হওয়ায় আরব ভূখণ্ডে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্ম বিষয়টি প্রাবন্ধিকদের লেখার বিষয়ের উপজীব্য হয়ে ওঠে। এখানে এ ধারার কয়েকটি প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা হলো।

বিশ্বনবী (সা)-এর আবির্ভাব ও এর গুরুত্ব প্রবন্ধে বিশ্বনবীর (সা) আবির্ভাবকালে পৃথিবীর মানুষের অবস্থা বিশেষত 'আরবের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ইত্যাদি আলোচনা করে বিশ্বনবী (সা)-এর আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রবন্ধকার বিশ্বনবী (সা)-এর পয়গাম লাভ, দাওয়াত, কিতাব ও হিকমতের শিক্ষাদান, মানুষের চরিত্র সংশোধন, বিশ্বনবী (সা)-এর শুভাগমন বিশ্বমানবতার সর্ববৃহৎ অনুগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধকার বলেন :

> হযরত ঈসা (আ)-র আবির্ভাবের পর প্রায় ৫৭০ বছর কাল দুনিয়াতে কোন নবী-রসূল আগমন করেন নি। ফলে গোটা বিশ্ব-শয়তানের আওতায় পরিণত হয়েছিল। আল্লাহকে ভুলে মানুষ কুফর ও শিরকে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্ব বরণ করে নিয়েছিল। অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমগ্র দুনিয়া ঢেকে গিয়েছিল। লক্ষ্যহীন পথভ্রষ্ট মানুষ পশুবৃত্তি চরিতার্থ করছিল। আল্লাহর প্রতি মানুষের কোন কর্তব্য আছে, এ ধারণাও তারা করতে পারতো না। এ ছাড়া বিভিন্ন জাতি ও গোত্র আল্লাহ সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্ত ও হাস্যাস্পদ ধারণা পোষণ করতো।
>
> গোটা বিশ্বের পার্থিব ও নৈতিক অবস্থা এতই অবনত ও শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে, খোদায়ী হস্তক্ষেপ ছাড়া এর প্রতিকারের কোনই উপায় ছিল না। দুনিয়ার ইতিহাসে নবী-রসূল আবির্ভাবের এত বেশি প্রয়োজন এবং এমন উপযুক্ত সময় আর কখনো অনুভূত হয়নি।
>
> এমতাবস্থায় সমগ্র বিশ্ব বিশেষভাবে আরবদেশ যখন অরাজকতায় ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ, পাপ ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত এবং বিশ্বমানবতা অত্যাচার-অবিচারের যন্ত্রণায় গুমরিয়ে মরছিল, এমনি সময়ে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর, নিখিল বিশ্বের অশেষ কল্যাণ ও মূর্ত আশীর্বাদ, মানব-জাতির চরম ও পরম আদর্শ, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরব ভূমিতে আগমন করেন।[১৮]

শেষ নবীর আবির্ভাব আরবে কেন? শীর্ষক প্রবন্ধে ভৌগোলিকভাবে আরবের অবস্থান এবং আরব জাতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (সা) কে আরবে প্রেরণের অপরিহার্যতা তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য :

---

১৮. আবদুল খালেক, 'বিশ্বনবী (সা)-র আবির্ভাব ও এর গুরুত্ব', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৮ হি*, ই ফা বা, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ ২০-৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, ভৌগোলিক দিক থেকে আরব দেশ বিশেষত মক্কা নগরী ভূমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। স্থলপথে ইরাক হয়ে ইরান, তুর্কিস্তান, খোরাসান, কাবুল, ভারতবর্ষে আসা যায়। অপরদিকে সিরিয়া হয়ে মিসর, তিউনিসিয়া, মরক্কো ও স্পেন পর্যন্ত যাতায়াত করা যায়। আবার জলপথে আফ্রিকা ও ইউরোপের নানা শহরে যাওয়া যায়। অপরদিকে ভারতবর্ষ, জাভা, সুমাত্রা এবং চীন পর্যন্ত সুগম পথ বিদ্যমান।

...আরবেও কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের ইয়ত্তা ছিল না সত্য; কিন্তু মানব-রচিত কোন অলীক ধর্মপদ্ধতির অনুসরণ করার দরুন তাদের মধ্যে এসব কুসংস্কার প্রবেশ করেনি; বরং সমস্ত ধর্ম বর্জন করে তারা প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত পালিত হয়ে তার বৈচিত্রগুলিকে বিস্মিত নয়নে অবলোকন করে নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে যে সব তত্ত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হত, তাতেই তারা বিশ্বাস স্থাপন করত। সুতরাং মূর্খ ও নিরক্ষর থেকে স্বাধীন চিন্তা করার পূর্ণ অধিকার প্রাপ্তিই ছিল কুসংস্কার উৎপত্তির একমাত্র কারণ। তাদের দেশ, দেহ, মন এবং চিন্তা সবকিছুই ছিল স্বাধীন। এজন্যই সত্য ধর্ম পবিত্র ইসলামের ডাকে সাড়া দিতে তারা বিলম্ব করেনি।

যে দেশ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, যে দেশের লোকেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেদের স্বাধীন চিন্তা দ্বারা পবিত্র ধর্মের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে, তাঁর সহচর (সাহাবী) ও সহায়ক (আনসারী) হয়ে অপ্রতিহত বীরত্ববলে আল্লাহর শত্রুদেরকে পরাভূত করতে সমর্থ হবে, তাঁর বর্তমানে ও অবর্তমানে নিজেদের বংশ মর্যাদা বলে পৃথিবীর সমস্ত জাতির উপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করতে এবং নির্ভীক চিত্তে মহাপরাক্রমশালী ব্যক্তির সম্মুখে বজ্রকণ্ঠে সত্য প্রচার করতে সক্ষম হবে, এই মহান ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের সুসংবাদ শুনে দেশ-দেশান্তর হতে পঙ্গপালের ন্যায় আগত নিঃসহায়, নিঃসম্বল দীন-দুখীদেরকে নিজেদের বদান্যতাবলে আশ্রয় দিয়ে এবং তাঁদেরকে মেহমানদারী করে বিনা দ্বিধায় ধন-সম্পদ সর্বস্ব লুটিয়ে দিতে পারবে এবং নিজেদের আল্লাহ্ প্রদত্ত স্মরণশক্তি বলে আল্লাহ্র পবিত্র কালাম এবং রাসূলের অমূল্য উপদেশ কণ্ঠস্থ করে পৃথিবীর দূর-দূরান্তে প্রত্যেক নর-নারীর কর্ণকুহরে পৌঁছে দিতে পারবে। আরব ব্যতীত আর কোন দেশ বা জাতি এমন গুণসম্পন্ন ছিল না। অন্য সকল দেশে তখন পরাধীনতার ভীষণ চাপে, বহিঃশত্রুর অমানুষিক বল-বীর্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এজন্যই সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রিয় হাবীব, সমগ্রী বিশ্বের ত্রাণকর্তা শেষ নবীকে প্রেরণ করলেন চিরমুক্ত চিরস্বাধীন বীরের দেশ আরবের মক্কা নগরীতে।[১৯]

'রাসূলুল্লাহর (সা.) আরবে আগমনের কারণ' প্রবন্ধে গবেষণার আলোকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আরবে আগমণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রবন্ধকার বলেন :

---

১৯. ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন, 'শেষ নবীর আবির্ভাব আরবে কেন?', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, ই ফা বা, ১৯৯৮, পৃ ৩৫-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

আরবের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেও মহানবীর (সা.) আগমন এখানে যুক্তিসঙ্গত ছিল। জাযীরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান যা একে দাওয়াতের কেন্দ্র হিসেবে সর্বাধিক উপযোগী রূপদান করেছে। এখান থেকে দীনের দাওয়াত ও পয়গাম সমগ্রবিশ্বে পৌঁছে দেয়া যায় এবং পৃথিবীর তাবৎ জাতিগোষ্ঠীকে সম্বোধন করা যায়। একদিকে এটি এশিয়া মহাদেশের একটি অংশ, অপরদিকে তা আফ্রিকা মহাদেশ' এরপর ইউরোপেরও কাছাকাছি এবং এসব সেই এলাকা যা সভ্যতা ও কৃষ্টি, জ্ঞান ও শিল্পকলা, ধর্ম ও দর্শনের সর্বদাই কেন্দ্র থেকেছে এবং যেখানে বিরাট বিস্তৃত ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য কায়েম হয়েছে। অতঃপর এই এলাকা একটি বাণিজ্যিক কাফেলার অতিক্রমস্থলও ছিল যার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের লোক একে অপরের সঙ্গে মিলিত হত। এটি ছিল কয়েকটি মহাদেশের সঙ্গমস্থল এবং এক জায়গার নির্দিষ্ট বস্তু সামগ্রী ও উৎপাদিত দ্রব্য, যেখানে এর প্রয়োজন পড়ত সেখানে স্থানান্তরিত করত।

আধুনিক একজন গবেষকও প্রমাণ করেছেন যে, মক্কা পৃথিবীর মাঝখানে অবস্থিত। ড. হুসায়ন কামালুদ্দীন নামের এই গবেষক রিয়াদ ভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার সভাপতি। তিনি এক সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি এক নতুন ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণে উপনীত হয়েছেন যে, যদ্বারা প্রমাণিত হয় মক্কা মুকাররামা পৃথিবীর শুষ্ক অংশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।[২০]

মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা) আরব উপদ্বীপে আবির্ভূত হলেন কেন? প্রবন্ধটিতে বিজ্ঞ প্রবন্ধকার আরবদের দৃঢ় মানসিকতার বিষয়টি উপস্থাপন করে বলেছেন :

আল্লাহ্ তা'আলা এই দাওয়াতের জন্য আরবদেরকে নির্বাচিত করেন এবং তাদেরকে সমগ্র বিশ্বের তাবলীগ তথা প্রচার-প্রসারের যিম্মাদার বানান এ জন্য যে, তাদের হৃদয়পট ছিল একেবারেই স্বচ্ছ ও নির্মল। পূর্ব থেকে কোন অঙ্কিত ছবি কিংবা চিত্র এতে ছিল না যা মোছা কঠিন হত। এর বিপরীতে রোমক, পারসিক অথবা ভারতীয়দের, যাদের নিজেদের উন্নতি-অগ্রগতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা এবং নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ও দর্শনের ব্যাপারে বিরাট গর্ব ছিল, আর এর দরুন তাদের ভেতর এমন কিছু মানসিক গ্রন্থি ও চিন্তাগত জটিলতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যা দূর হওয়া সহজ ছিল না।

...এই আরবরা তাদের আপন প্রকৃতিতে ছিল সমুজ্জ্বল। মজবুত ও লৌহসম সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিল তারা। যদি হক কথা তাদের উপলব্ধির ধরা না দিত তাহলে তারা এর বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে তুলে নিতে এতটুকু ইতস্তত করত না। আর যদি সত্য স্বচ্ছ-সুন্দর দর্পণের ন্যায় তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ত তাহলে তা তারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করত, প্রাণের

---

২০. খোন্দকার আবদুর রশীদ, রাসূলুল্লাহর (সা.) আরবে আগমনের কারণ, মদীনা, এপ্রিল ২০০৫, পৃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

> অধিক ভালবাসত, তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরত এবং এর জন্য প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দিতেও এতটুকু দ্বিধা করত না।[২১]

সঠিকভাবে বলা যায়, এসব প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাব ও তা আরব ভূখণ্ডে হবার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রবন্ধ সাহিত্যে একটি উপশাখা তৈরি হয়েছে। প্রতি বছর নতুন করে এ বিষয়ের যৌক্তিকতা বিশ্লেষিত হতে দেখা যায়। এ প্রাসঙ্গিক আরো উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ হচ্ছে : মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আরব উপদ্বীপে আবির্ভূত হলেন কেন?[২২] বিশ্বনবীর আবির্ভাবকালে বাংলাদেশের পরিস্থিতি[২৩], রাসূলুল্লাহর (সা) আরবে আগমনের কারণ[২৪], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আর্বিভাবের তাৎপর্য ও প্রেক্ষাপট[২৫], যাঁর আগমনে পুরা মানবতার জন্ম[২৬]।

---

২১. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরব উপদ্বীপে আবির্ভূত হলেন কেন?, *মদীনা*, জুন, ১৯৯৯, পৃ ২০-২২।

২২. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আরব উপদ্বীপে আবির্ভূত হলেন কেন?', *মাসিক মদীনা*, ৩৫ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, জুন ১৯৯৯, পৃ ১৭-২১।

২৩. বদরুজ্জামান, 'বিশ্বনবীর আবির্ভাবকালে বাংলাদেশের পরিস্থিতি', *মাসিক মদীনা*, ৩৭ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, জুন ২০০১, পৃ ৯১-৯২।

২৪. খোন্দকার আবদুর রশীদ, 'রাসূলুল্লাহর (সা) আরবে আগমনের কারণ', *মাসিক মদীনা*, ৪১ বর্ষ ১ম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৫, পৃ ১১১-১১৪ ।

২৫. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আর্বিভাবের তাৎপর্য ও প্রেক্ষাপট', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) ১৪২২, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ১৪-২৩।

২৬. সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, ইসহাক ওবায়দী অনূদিত, 'যাঁর আগমনে পুরা মানবতার জন্ম', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃ ৮৭-৯০।

Dhaka University Institutional Repository

নূরে মুহাম্মদী

আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ছিলেন গুপ্তধন। তিনি আপন মহিমা ও গরিমায় মহিমান্বিত অবস্থায় বর্তমান ছিলেন। তিনি আপন কুদরতের মহিমা বিকশিত করার লক্ষ্যে তাঁর খালিক সিফাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। এ লক্ষ্যে তিনি এক স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল নূরের উন্মেষ ঘটালেন। এই নূর অস্তিত্ব প্রাপ্ত হবার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি জগতের সূচনা হলো। সেই নূর থেকে সৃষ্টি হলো পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি জগতের নতুন নতুন মখলুক। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু আপন নূরের ফয়েযের কুদরতি তাজাল্লী হতে যে নূরের উন্মেষ ঘটালেন সেই নূরকেই বলা হয় নূরে মুহাম্মদী।

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম তার *নূরে মুহাম্মদী প্রসঙ্গ* প্রবন্ধে এ প্রাসঙ্গিক হাদীস উদ্ধৃত করে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ আমার নূরকে প্রথম সৃষ্টি করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হযরত আদম (আ)-এর পয়দা হবার চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আমি আমার রব্-এর সান্নিধ্যে নূর ছিলাম।

হযরত জাবির ইব্নে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি একদিন আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোন। আমাকে এই তথ্যটি জানিয়ে দিন যে, আল্লাহ তা'আলা কোন্ জিনিসটি প্রথম সৃষ্টি করেন? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তু সৃষ্টির পূর্বে তাঁর নূর থেকে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেন। অতঃপর সেই নূর আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী তাঁর কুদরতে সজোরে ঘূর্ণায়মান ছিলো। সেই সময়টাতে লওহ ছিলো না, কলম ছিলো না, জান্নাত ছিলো না, দোযখ ছিলো না, ফিরিশতা ছিলো না, আসমান ছিলো না, যমীন ছিলো না, সূর্য ছিলো না, চন্দ্র ছিলো না, জিন ছিলো না, মানুষ ছিলো না- কিছুই ছিলো না। অতঃপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করবার ইরাদা করলেন। সেই নূরকে চার ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রথম ভাগ থেকে সৃষ্টি করলেন কলম, দ্বিতীয় ভাগ থেকে সৃষ্টি করলেন লওহ, তৃতীয় ভাগ থেকে সৃষ্টি করলেন 'আরশ্'।.....

প্রবন্ধে আরো একটি হাদীস উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, 'হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত একখানি হাদীস থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়েকিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি কোন্ সময় নবুওয়ত প্রাপ্ত হন? তিনি বললেন, যখন আদম (আ) রূহ্ ও দেহের মধ্যখানে। এর দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, হযরত আদম (আ) - এর পয়দা হবার বহুপূর্বেই প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নবুওয়ত প্রাপ্ত হন (দ্র. ঐ পৃষ্ঠা ২)। এ ছাড়াও বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, হযরত আদম (আ) -এর কপালে এই নূর মুবারক দীপ্যমান হয়। তাঁর থেকে হযরত আদম (আ)-এর তৃতীয় সন্তান হযরত শীস (আ)-এর কপালে এই নূর স্থিত হয়। এমনিভাবে পরম্পরার ধারাবাহিকতায় পুরুষাণুক্রমে এই নূর মুবারক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু

Dhaka University Institutional Repository

আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর আব্বা আবদুল্লাহ্ হয়ে তাঁর আম্মাজান আমিনার মধ্যে স্থিত হয়। আর এমনিভাবে ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল সুবহে সাদিকের এক মুবারক মুহূর্তে সেই নূর মুবারক মানবরূপে পার্থিব জগতে আবির্ভূত হন।' (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর ইবন খতীব কাস্তালানী, মওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, প্রফেসর মওলানা আবদুল খালেক, সাইয়েদুল মুরসালীন প্রভৃতি)। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে : 'আল্লাহ্র নিকট হতে এক নূর এবং স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে।' (সূরা মায়িদা : আয়াত ১৫)

এই আয়াতে কারীমায় যে নূরের উল্লেখ রয়েছে, এই নূরের পরিচয় তুলে ধরে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে ভাষ্য উপস্থাপিত হয়েছে। ইমাম কাতাদা রহমাতুল্লাহি আলায়হির মতে, এই নূর হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নূর মুবারক অর্থাৎ নূরে মুহাম্মদী। এছাড়া *নূরে মুজাসসাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)* প্রবন্ধে বলা হয়েছে :

> সমগ্র সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সা) মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁকে দিয়েই সৃষ্টির সূচনা ঘটালেন। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ্ বলেন : 'আমি একট গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম। অতঃপর আমি যখন আত্মপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলাম তখন আমি আমার নূর হতে কিছু নূর নিয়ে তাঁকে বললাম, তুমি মুহাম্মদ হয়ে যাও। অতঃপর সে নূর স্তম্ভের আকারে উপরের দিকে উঠতে লাগলো, এক পর্যায়ে সিজদায় অবনত হলো এবং সিজদায় গিয়ে বললো, 'আলহামদুলিল্লাহ।' অতঃপর আমি বললাম, এ জন্যই আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমার নাম রাখলাম মুহাম্মদ। তোমাকে দিয়েই সৃষ্টির সূচনা করছি এবং তোমাকে দিয়েই রাসূলগণের পরিসমাপ্তি ঘটাবো।' এভাবেই মহান আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির সূচনা করলেন এবং সূচনাতেই বললেন, 'আমি আমার নূর হতে কিছু নূর দিয়েই মুহাম্মদকে সৃষ্টি করেছি।'[২৭]

সুতরাং রাসূলের সৃষ্টি রহস্যের ইতিহাস হলো তিনি নূরের তৈরী। এ প্রসঙ্গে আরো ক'টি প্রবন্ধ হচ্ছে : সিরাজাম মুনীরার তাৎপর্য[২৮], সিরাজাম মুনীরা হযরত মুহাম্মদ (সা)[২৯]। প্রবন্ধসমূহে 'নূরে মোহাম্মদী, বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সারগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।[৩০]

---

২৭. অধ্যক্ষ কাজী আনোয়ারুল ইসলাম খান, 'নূরে মুজাসসাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১১১-১১৩।

২৮. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'সিরাজাম মুনীরার তাৎপর্য', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ৯-১৮।

২৯. এ. জেড. এম শামসুল আলম, 'সিরাজাম মুনীরা হযরত মুহাম্মদ (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৪৩-৪৭।

৩০. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, 'নূরে মুহাম্মদী প্রসংগ', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৮ হি*, ই ফা বা, ১৯৯৭, পৃ ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

নবুওয়াত, খতমে নবুওয়াত ও রিসালাত

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মানব এবং নবী হযরত আদম (আ)-এর মধ্য দিয়ে নবীদের আগমনের সূচনা হয়েছিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটেছে। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আগমন করবেন না। খতমে নবুওয়াত প্রবন্ধে বলা হয়েছে :

> আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেমনিভাবে 'ঈমান ও 'আকীদার মৌলিক বিষয় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সর্বশেষ নবী বলে বিশ্বাস করাও তেমনিভাবে 'ঈমান ও 'আকীদার মৌলিক বিষয়, কিন্তু ইসলাম বিরোধী শক্তি মুসলমানদের এ বিশ্বাসের মূলে আঘাত হানার জন্য দীর্ঘদিন ধরে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।[৩১]

বিরুদ্ধবাদীদের এ অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে কুর'আন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস এবং যুক্তির মাধ্যমে খতমে নবুওয়াত বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা এ ধারার প্রাবন্ধিকের লেখায় লক্ষ্যণীয়।

সর্বশক্তিমান এক, অদ্বিতীয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামী আকীদার মূলভিত্তি। কিন্তু মুসলমান হিসেবে পরিচিত হয়েও কিছু মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নবী হিসেবে মেনে নিলেও শেষ নবী বলে মানে না। ইসমাঈলী সম্প্রদায়, কাদিয়ানী, বাহায়ী প্রভৃতি দল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে শেষ নবী বলে মানতে অস্বীকার করে। তাদের মতে মানুষ পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে না; তাই সব যুগেই তাদের জন্য পথপ্রদর্শক আবশ্যক। তাদের যুক্তি: প্রত্যেক যুগেই একজন নবী বা তার প্রতিনিধি আগমন না করলে মানবজাতি সঠিক পথে চলতে সক্ষম হয় না। যেমন আহলে কিতাব, বাহায়ী, শিখ, ব্রাহ্মসহ অনেক অমুসলিম সম্প্রদায়ও মুহাম্মদ (সা)-কে নবী বলে স্বীকার করে, কিন্তু শেষনবী স্বীকৃতি দেয় না। অথচ মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক প্রচারিত এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত ইসলাম আল্লাহ মনোনীত এমন এক পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যা মহাপ্রলয়দিবস পর্যন্ত বহাল থাকবে। আর কোন নবী বা বিধিবিধান অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ইসলামী বিশ্বাস মতে অযৌক্তিক ও অসম্ভব। মুহাম্মদ (সা)-এর পর কেন আর নবী আসবেন না বা মহানবী (সা)-এর আগমনের মধ্য দিয়ে কিভাবে নবুওয়ত পূর্ণতা লাভ করেছে সে বক্তব্যই উপস্থাপিত হয়েছে 'হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে নবুওয়াতের পূর্ণতা' প্রবন্ধে।[৩২]

---

৩১. মুহম্মদ সিরাজুল হক, 'খতমে নবুওয়াত', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪০৭*, ই ফা বা, ১৯৮৬, পৃ ২১।

৩২. ড. তাসনীম আলম, 'হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে নবুওয়াতের পূর্ণতা', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৫৬-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব *খতমে নবুওয়ত এবং কাদিয়ানী সম্প্রদায়* প্রবন্ধে কাদিয়ানীদের বিষয়ে কয়েকটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের অবস্থান তুলে ধরে বলেছেন :

> হযরত মুহাম্মদ (সা) নবী ও রসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ নবী, তাঁরপর আর কোন নতুন নবীর আবির্ভাব হবে না। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সকল দল ও মতের ওলামায়ে কেরাম এবং সর্বশ্রেণির মুসলমান এক ও অভিন্ন মত পোষণ করে আসছেন। ১৯৫৭ সালে সিরিয়া সরকার কাদিয়ানীদেরকে সরকারীভাবে অমুসলিম ও সংখ্যালঘু ঘোষণা করেন এবং কাদিয়ানীদের সংগঠনকে অবৈধ ও বেআইনী সংগঠন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ১৯৫৮ সালে মিসর সরকার কাদিয়ানীদেরকে সরকারীভাবে কাফের, মুরতাদ এবং তাদের সংগঠনকে বেআইনী সংগঠন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ১৯৭৪ ইংরেজী মোতাবেক ১৩৯৪ হিজরী ১৪ই রবিউল আউয়াল হতে ১৮ রবিউল আউয়াল পর্যন্ত পাঁচ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ১০৪টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদেন। রাবেতা আলমে ইসলামী-এর অধিবেশনে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, এ দল কাফের-ইসলাম বহির্ভূত। তাদেরকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক তথা সর্বক্ষেত্রে বয়কট করা হোক। তাদের সংগে বিবাহ-শাদী হারাম এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাদের দাফন করাও হারাম। এছাড়া মোতামার আলমে ইসলামী এবং ওআইসি ও তাদের কাফের ঘোষণা করেছে। ২৮ এপ্রিল ১৯৭৩ ইং আজাদ কাশ্মীরের এসেম্বলী কাদিয়ানীদের কাফের হওয়ার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ ইং পাকিস্তানের পার্লামেন্টে কাদিয়ানীদের অমুসলিম এবং সংখ্যালঘু ঘোষণা দিয়েছে। ৬ নভেম্বর ১৯২৩ ইং ভারতের দিল্লীতে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের অধিবেশনে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, কাদিয়ানী সম্প্রদায়, লাহোরী আহমদী জামাত উভয়ের আকীদা ইসলামবহির্ভূত এবং উভয় জামাত কাফের।[৩৩]

সহীহ্ হাদীসে এসেছে, এক ইহুদি আলেম হযরত ওমর (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, হে আমিরুল মুমিনীন আপনারা কুরআনে এমন একটি আয়াত তেলাওয়াত করেন। সেটা যদি আমাদের ইহুদিদের ওপর নাযিল হতো তাহলে আমরা সে দিনকে আমাদের ঈদ ও আনন্দের দিন বানাতাম। ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কোন আয়াত? উত্তরে ইহুদি বলল, 'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নে'মাতি'। অর্থ : আজ আমি তোমাদের শরীয়তের পূর্ণতা দান করলাম ও আমার নেয়ামতকে তোমাদের ওপর পরিপূর্ণ করলাম। এ কথা শুনে ওমর (রা.) বললেন, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয় সে দিন ও সে মুহূর্ত আমার খুব ভালোভাবেই স্মরণ আছে। সেদিনটি ছিল শুক্রবার। আর সময় ছিল আরাফার দিবসের সন্ধ্যা।

মাওলানা আবুল হাসান তাঁর প্রবন্ধে এই রেওয়ায়েতে ঐ নেয়ামতের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা করে বলেন :

---

৩৩. মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব, 'খতমে নবুওয়ত ও কাদিয়ানী সম্প্রদায়, *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ২৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

> যার ব্যাপারে স্বয়ং ইহুদি পণ্ডিতরাও ঈর্ষাকাতর ছিল এবং মুসলমানদেরকে হিংসুকের দৃষ্টিতে দেখতো। সাথে সাথে এ বিষয়টিও স্পষ্ট যে, পূর্ববর্তী ধর্মসমূহ আল্লাহ্ তাআলার এই পূর্ণতার ঘোষণা থেকে শূন্য এবং ভরসা ও নির্ভরতার ঐ সম্মান তারা অর্জন করতে পারেনি। আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মাহকে যে মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে এবং এই মর্যাদা প্রাপ্ত না হওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয় কেননা তখন শরীয়ত সবেমাত্র তার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করেছিল এবং তার সাথে সাথে মানব সম্প্রদায়ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে আসছিল এবং সর্বশেষ রেসালতের অপূর্ব নিপূণ সৃষ্টি (যা কোনো মহান ব্যক্তির জন্য অতি সতর্কতার সাথে মেপে নির্ধারণ করা হয়েছিল) তখনও পৃথিবীতে প্রকাশ পায়নি। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা এই চরম মর্যাদায় ভূষিত করলেন রাসূল (সা.) কে এবং তাঁর মাধ্যমে এই উম্মতকে সম্মান দিলেন, যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত।[৩৪]

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠতম নবী এবং রাসূল। তাঁর পর কোন নবী-রাসূল আসবেন না; আসার প্রয়োজন নেই- এ বিশ্বাসকেই বলা হয় খতমে নবুয়্যাত। এ বিষয়ে সর্বকাল, যুগ ও স্থানের সকল মুসলিম বিনা বাক্যব্যয়ে একমত এবং এটাই চূড়ান্ত। ইমামকুল শিরোমনি হযরত আবু হানিফা রহ. এর মতে- খতমে নবুয়্যাতে অবিশ্বাস এবং ভণ্ড নবীর কাছে প্রমাণ চাওয়াও কুফরী।

খতম অর্থ শেষ, সমাপ্তি, যবনিকাপাত, নিঃশেষ এবং নবুয়্যাত অর্থ নবুয়্যাত রিসালাতের ক্রমধারা। সুতরাং খতমে নবুয়্যাত অর্থ নবুয়্যাতের পরিসমাপ্তি বা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ নবী রাসূল হিসেবে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। আর এর তাৎপর্য বা ব্যবহারিক প্রতিফলন হলো- ১. পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের সমষ্টির প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস। ২. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠতম একমাত্র রাসূল হিসেবে বিশ্বাস, ৩. জীবনের সর্বস্তরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ ও আদর্শ একান্ত মনে অনুসরণ করা।

খোদ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় পাপিষ্ট মুসাইলামা নবুয়্যাতের দাবী করে ধৃষ্টতার পরিচয় দেয়। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিস্ময়কর ও অপ্রতিহত উত্থান তার কাছে লাভজনক বাণিজ্য মনে হয়েছিল। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাজ্জাব অর্থাৎ চূড়ান্ত রকমের মিথ্যুক হিসেবে ঘোষণা করেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর নব-প্রতিষ্ঠিত সুবিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খল-বিভক্তি সৃষ্টি করে মিথ্যাবাদী ভণ্ড নবীদের কালো অধ্যায়। মুসলমানদের সংখ্যাগত আধিপত্য

---

৩৪. মাওলানা আবুল হাসান আলী নদ্‌ভী, মাওলানা হেদায়াতুল আলম মুসা অনূদিত, 'খত্‌মে নবুওয়াত', *মাসিক মদীনা*, ৪২ বর্ষ ১ম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৬, পৃ ৫১-৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

আর সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের কাছে পরাজিত পরাভূত অপশক্তি, নব্য ধর্মান্তরিত ইহুদি খ্রিষ্টান সূচতুর ক্ষমতালিপ্সু চক্র মিথ্যা নবী সৃষ্টির যান্ত্রিক হাতিয়ারে পরিণত হয়। একে একে মহিলাসহ বেশ কয়েক জন উত্তরাধিকারের আইন কর্তৃত্বের মতই নানান শিথিল ব্যবস্থাপনা আর বেপরোয়া সুবিধাভোগী সৃষ্টির বিপুল শক্তি ও সমর্থন নিয়ে প্রিয়নবী সা. এর নবুয়্যাতকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি খতমে নবুয়্যাতের চিরন্তন ঘোষণাকে অস্বীকার করে কিয়ামত পর্যন্ত নবী আগমনের প্রতিশ্রুত কাল্পনিক কথকতায় মেতে ওঠে। এহেন পরিস্থিতিতে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এ ভণ্ড মিথ্যুক নবীদের আদ্যোপান্ত জারিজুরি ধ্বংস করার কঠিন ও কঠোর কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সফল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে এ প্রবন্ধে স্বল্প পরিসরে আলোকপাত করেছেন।[৩৫]

বর্তমান বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে, এর মধ্যে নবুওয়াতের দাবী অত্যন্ত মারাত্মক, যা মুসলিম মিল্লাতের আকীদা ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ নবুওয়্যাতের দাবী সৃষ্টি করে চলছে মুসলিম জাতির মধ্যে বিরাট গুমরাহী। সাধারণত দীন সম্পর্কে মুসলমানদের বিমুখতা, অজ্ঞতা এবং নিত্য-নতুন সৃষ্ট ভুল ধারণা অনেক সত্য ও বাস্তব বিষয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এর ফলেই খতমে নবুওয়্যাতের মত একটি সুস্পষ্ট ও সর্বজন স্বীকৃত বিষয় নিয়ে ফিতনার উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হয়েছে। সুতরাং নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদারদের স্বরূপ উদঘাটন করার জন্য কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে এর সুষ্ঠু ও সার্বিক আলোচনা করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে প্রাবন্ধিক মুহাম্মদ সিরাজুল হক তাঁর আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। একটি হাদীস উদ্ধৃত করে তিনি বলেন :

> হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, হুযুর (সা) বলেছেন, সমস্ত নবীদের উপর আমাকে ছয়টি বিষয়ে অধিক সম্মান প্রদান করা হয়েছে। প্রথমত, আমাকে অল্প শব্দে বিপুল তাৎপর্য বুঝাবার যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয়, শত্রুপক্ষের মনে ভীতির সৃষ্টি করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। তৃতীয়ত, আমার জন্য গনীমতের মাল-দৌলত হালাল করা হয়েছে। চতুর্থত, আমার জন্য সমস্ত ভূখণ্ড মসজিদ ও পবিত্র স্থান অন্য কথায় সালাত আদায়ের স্থান করা হয়েছে এবং ভূখণ্ডের মাটি আমার জন্য পবিত্রকারী হিসেবে তৈরী করা হয়েছে। পঞ্চমত, সমগ্র সৃষ্টির প্রতি আমাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। ষষ্ঠত, আমার দ্বারা নবুওয়তের সমাপ্তি করা হয়েছে।

এই হাদীসের দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হযরত (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির জন্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর দ্বারা নবুওয়তের ক্রমধারা সমাপ্ত করেছেন। সুতরাং আঁ হযরত (সা) এর পর শরীয়তপ্রাপ্ত বা শরীয়তবিহীন অবয়বরূপ বা অবয়ববিহীন কোন প্রকার নবী আগমন করার প্রয়োজন নেই। যদি কেউ এরপর নবী দাবী করে তা হলে সে হবে মিথ্যাবাদী ও

---

৩৫. অধ্যাপক মো. আলী এরশাদ হোসেন আজাদ, 'খতমে নবুওয়্যাত', *মাসিক মদীনা*, ৪৪ বর্ষ ১২তম সংখ্যা, সীরাতুন নবী (সা) সংখ্যা, মার্চ ২০০৯, পৃ ৩৩-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

দাজ্জাল। এমনিভাবে আরও বহু সহীহ হাদীসের দ্বারা খতমে নবুওয়তের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে এবং এর উপর উম্মতের ইজমা ও একাত্মতা রয়েছে।[৩৬]

মুহাম্মদ সিরাজুল হক *খতমে নবুওয়াত* বিষয়ক আরো একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এতে তিনি কাদিয়ানীদের ব্যাপারে বাংলাদেশের করণীয় সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। তিনি বলেন :

> ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে রাবেতা আলমে ইসলামীর উদ্যোগে বিশ্বের ১৪৪টি ইসলামী সংগঠনের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, ফকীহ্ ও ওলামা সমন্বয়ে মক্কা মুকাররমায় এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সর্বসম্মতভাবে কাদিয়ানী তথা আহ্মদী জামাতকে অমুসলিম সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করা হয়। অতঃপর সৌদী আরব, জর্দান, সংযুক্ত আরব আমীরাত, সিরিয়া, তুরস্ক, মিসর, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের ১৭টি দেশ ইতিমধ্যেই কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম বলে ঘোষণা দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কিরামসহ মুসলিম জনতা কাদিয়ানীদের অপতৎপরতা রোধের ব্যাপারে যে দাবী জানিয়ে আসছে সে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে একটি আশু সমাধান প্রয়োজন বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।[৩৭]

এ প্রাসঙ্গিক আরো কটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হচ্ছে : খাতামুন্নাবিয়ীন হযরত মুহাম্মদ (সা)[৩৮], খত্মে নবুওয়াত[৩৯], নবুওয়ত এবং শেষনবী সা.[৪০], হযরত মুহাম্মদ (সা.) আখেরী নবী[৪১], নবুওয়াত কেন খতম হল[৪২], নবূওয়াত ও মু'জিযা[৪৩], নবুওয়ত আমাদের কী

---

৩৬. মোহাম্মদ সিরাজুল হক, 'খতমে নবুওয়ত', *সীরাতুন্নবী স. স্মরণিকা ১৪০৭ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, ১৪ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ ২১-২৬।

৩৭. মুহাম্মদ সিরাজুল হক, 'খতমে নবূওয়াত', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ ৬৪-৭১।

৩৮. রফিকুল ইসলাম আজাদ, 'খাতামুন্নাবিয়ীন হযরত মুহাম্মদ (সা)', *মাসিক মুসলিম জাহান*, বর্ষ ৯ সংখ্যা ১২, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ১৪২০ হিজরী/২৩-২৯ জুন ১৯৯৯, পৃ ৭৬।

৩৯. মাওলানা আবুল হাসান আলী নদ্‌ভী, মাওলানা হেদায়াতুল আলম মুসা অনূদিত, 'খত্মে নবুওয়াত', *মাসিক মদীনা*, ৪২ বর্ষ ১ম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৬, পৃ ৫১-৫৬।

৪০. ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক, 'নবুওয়ত এবং শেষনবী সা.', *মাসিক মদীনা*, ৪৪ বর্ষ ১২তম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, মার্চ ২০০৯, পৃ ৫৪-৫৫।

৪১. এস. এম. মাহবুবুর রহমান, 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) আখেরী নবী', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২০ হি/১৯৯৯, পৃ ৮২-৮৭।

৪২. নজরুল ইসলাম ফারুকী, 'নবুওয়াত কেন খতম হল', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ২৪২-২৪৪।

৪৩. মাওলানা ইমদাদুল হক, 'নবূওয়াত ও মু'জিযা', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ ৩২-৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছে[৪৪], আন-নবীউল খাতিম[৪৫], নবুওয়ত ও রিসালত[৪৬], বিশ্বনবী (সা)-এর নবুওয়াতের অনন্য বৈশিষ্ট্য[৪৭], নবী, নবুয়ত ও মহানবী (সা)[৪৮], বিশ্বনবী (সা)-এর নবুয়তের বৈশিষ্ট্য[৪৯], ইসলামের পরিপূর্ণতা ও হযরত মুহাম্মদ (সা)[৫০], শানে রিসালত : প্রসঙ্গ কথা[৫১] ও রিসালতের আকীদা প্রসঙ্গে[৫২] রিসালাতের প্রতি ঈমান[৫৩], নবী সা.-এর নবুওয়তী জীবন[৫৪], শানে রিসালাত (সা.)[৫৫], আদর্শ জীবন গঠনে মৌলিক বিশ্বাসের ভূমিকা: রিসালাত[৫৬], নবূয়তে মুহাম্মদীর

---

৪৪. সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, 'নবুওয়ত আমাদের কী দিয়েছে', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ২৫-৩৪ ।

৪৫. আল্লামা মানাযির আহসান গিলানী, আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী অনূদিত, 'আন-নবীউল খাতিম', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ৪০-৫১ ।

৪৬. মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন, 'নবুওয়ত ও রিসালত', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ১২৬-১২৯ ।

৪৭. মাওলানা জাকির হুসাইন, 'বিশ্বনবী (সা)-এর নবুওয়াতের অনন্য বৈশিষ্ট্য', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) স্মরণিকা ১৪২২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ৪০-৪৬ ।

৪৮. আবু জাফর, 'নবী, নবুয়ত ও মহানবী (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৭৭-৮৫ ।

৪৯. ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, 'বিশ্বনবী (সা)-এর নবুয়তের বৈশিষ্ট্য', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃ ২১-৩৩ ।

৫০. আবু তাহের মুহাম্মদ মান্‌জুর, 'ইসলামের পরিপূর্ণতা ও হযরত মুহাম্মদ (সা)', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃ ৯৫-১০০ ।

৫১. অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, 'শানে রিসালত : প্রসংগ কথা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮ সংখ্যা, ই ফা বা জুলাই ১৯৯৭, পৃ ১৮৭-১৯২ ।

৫২. দাউদ-উজ্-জামান চৌধুরী, 'রিসালতের আকীদা প্রসংগে', অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী (সা) হিজরী সংখ্যা, ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ৫৯-৬২ ।

৫৩. প্রফেসর মুহাম্মদ কুতুব, গোলাম সোবহান সিদ্দিকী অনূদিত, 'রিসলাতের প্রতি ঈমান', *মাসিক মদীনা*, ৩৭ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, জুন ২০০১, পৃ ২৩-৪৩ ।

৫৪. অধ্যাপক দেওয়ান নূরুল হক, 'নবী সা.-এর নবুওয়তী জীবন', *মাসিক মদীনা*, ৪৪ বর্ষ ১২তম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, মার্চ ২০০৯, পৃ ৫৬-৫৯ ।

৫৫ . মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার, শানে রিসালাত (সা.), *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ৮৩-৮৬ ।

৫৬. মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান, 'আদর্শ জীবন গঠনে মৌলিক বিশ্বাসের ভূমিকা: রিসালাত', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) ১৪২২, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ৩০-৩৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বজনীনতা[৫৭], নবুওয়াত ও রিসালতের মর্মকথা[৫৮], সাইয়্যেদুল মুরসালীন : বৈশিষ্ট্য[৫৯], রিসালতের তাৎপর্য[৬০], বিশ্বনবী (সা)-এর রিসালতী আদর্শ[৬১], মহানবী (সা.) আল্লাহ পাকের শেষ রাসূল[৬২], নবী, নবুয়ত ও মহানবী (সা)[৬৩], সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)[৬৪], নবুওয়াত কেন খতম হল[৬৫], হযরত মুহাম্মদ (সা) আখেরী নবী।[৬৬] প্রবন্ধসমূহে নবুওয়াত, খতমে নবুওয়াত ও রিসালত সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

---

৫৭. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, 'নবূয়তে মুহাম্মদীর সার্বজনীনতা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) ১৪২২, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ৪৭-৫৪।

৫৮. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, 'নবুওয়াত ও রিসালতের মর্মকথা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) ১৪২২, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ৫৫-৬১।

৫৯. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, 'সাইয়্যেদুল মুরসালীন : বৈশিষ্ট্য', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ ২১-২৩।

৬০. মওলানা ইমদাদুল হক, 'রিসালতের তাৎপর্য', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ৪৯-৫৬।

৬১. মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক, 'বিশ্বনবী (সা)-এর রিসালতী আদর্শ', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ৫৫-৫৮।

৬২. ড. মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ, 'মহানবী (সা.) আল্লাহ পাকের শেষ রাসূল', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২৬ হি*, পৃ ৯-২৪।

৬৩. আবু জাফর, 'নবী, নবুয়ত ও মহানবী (সা)', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল ২০০৭, পৃ ৭৭-৮৫।

৬৪. মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক, 'সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)', ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৩ হি, ঢাকা : ই ফা বা, মে ২০০২, পৃ ৮৩।

৬৫. নজরুল ইসলাম ফারুকী, 'নবুওয়াত কেন খতম হল', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, ই ফা বা ১৯৯৮, পৃ ২৪২-২৪৪।

৬৬. এস. এম. মাহবুবুর রহমান, 'হযরত মুহাম্মদ (সা) আখেরী নবী', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২০ হি*, জা সী ক বা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ ৮২-৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাহমাতুল্লিল 'আলামীন

রাসূল (সা) সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে : 'আমি আপনাকে বিশ্ব জগতের প্রতি রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।'[৬৭] তিনি বিশ্ববাসীর জন্য শ্রেষ্ঠতম আদর্শেরও নিদর্শন। অনাগতকাল ধরে তাঁর আদর্শের ছায়াতলে পরম শান্তি ও নিরাপদ আশ্রয় পাবে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। ড. কাজী দীন মুহম্মদ তাঁর *মহানবী (সা) : সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমতস্বরূপ* প্রবন্ধে রাসূল (সা) যে শুধু মানুষ নয় সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ তা খুবই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন :

> আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার থেকে দু'হাজার বছর পিছনে তাকালে কী দেখতে পাই? ঈসা (আ)-এর পর ছ'সাতশ বছরের মধ্যে বিশ্বের সাংস্কৃতিক অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তার একটা জরীপ নিলে তখনকার মানব-সভ্যতার চিত্রটি পরিষ্কার ভেসে উঠে।
>
> ফিরিশতা, জিন, ইনসান, পশুপাখি, কীট-পতঙ্গ, জড়-অজড় জগতের জন্য তিনি রহমত, কল্যাণ, মঙ্গল। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের পূর্বে পাপের কারণে এ দুনিয়াতে আযাবে ইলাহি বা আল্লাহ্‌র গযব নাযিল হতো। 'আদ, ছামুদ, তুব্বা, বনী ইসরাঈল, কওমে লুত প্রভৃতি বহু জাতি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার গযবে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ্‌র ক্রোধে কত জাতির, কত মানুষের চেহারা বিকৃত হয়ে শূকর, বানর ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কল্যাণে আল্লাহ বিরোধী কর্মের জন্য এ ধরনের তাৎক্ষণিক শাস্তি মওকুফ করা হয়েছে। কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত দুনিয়ায় এ শাস্তি আসবে না। কেননা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ বলে তাকে ওয়াদা করে সম্মানিত করেছেন ঃ ওয়ামা কানাল্লাহু লি ইউআযযিবাহুম ওয়া আনতা ফীহিম - আপনি তাদের মধ্যে আছেন, এ কারণে আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেন না। অধিকন্তু অপরাধী বান্দার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তওবার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। আবার তাঁরই কল্যাণে হাশরের কঠিন বিচারের দিনে নাজাত পাওয়ার আশা করা যায়।
>
> মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবহমান বিশ্বের রহমত। 'আলামে আমরে' (রূহের জগতে) আল্লাহ তা'আলা যখন প্রশ্ন করেছিলেন 'আলাসতু বিরাব্বিকুম' -আমি কি তোমাদের 'রব' নই? তখন তিনিই সর্বপ্রথম 'বাংলা'-হ্যাঁ বলে জবাব দিয়েছিলেন। অর্থাৎ বিশ্বজগতের সকলের তরফ থেকে তিনিই আনুগত্যের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আর সেকারণেই তিনি বিশ্বরহমত।
>
> মহানবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর 'বিশ্বের জন্য রহমত' হওয়ায় অন্যতম প্রমাণ হল অন্যান্য নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন তাঁদের বিশেষ কওম বা বিশেষ জাতির জন্য, সমগ্র বিশ্বের জন্য নয়। তাঁদের পাঠান হয়েছে বিশেষ একটি পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ সময়ের জন্য, সকল কালের জন্য নয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিশেষ কওমের প্রতি বিশেষ

---

৬৭. আল কুর'আন, ২১ : ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

কালে প্রেরিত হলেও তার কর্ম ও বাণী তাঁর কওমের গণ্ডী ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে পরিব্যাপ্ত। আর তা কেবল তাঁর কালেই নয়, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও সকল কালেই তাঁর হিতৈষণা বিস্তৃত।

কেবল মানুষ নয়। পশুপাখি ও কীট-পতঙ্গের জন্যও তিনি ছিলেন রহমত স্বরূপ। তিনি বলেছেন ঃ যারা (জীবজন্তুর প্রতি) দয়ালু, আল্লাহ তাদের প্রতি সদয়। তিনি বলেছেন ঃ একটি স্ত্রীলোক একটি বিড়ালকে খাদ্য ও পানীয় না দিয়ে ঘরে আবদ্ধ করে রেখেছিল, যাতে সে হাটা চলা করে খেতে পারে তার জন্য তাকে ছেড়ে দেয়নি। এতে বিড়ালটির মৃত্যু হয়। এ কারণে স্ত্রীলোকটির শাস্তি হয়েছিল।

একবার হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বসে লোকদের দীন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তখন একটি বিড়াল তাঁর চাদরের এক কোণে ঘুমিয়ে পড়ে। তিনি উঠে চলে যাওয়ার সময় যাতে বিড়ালটির ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সেজন্য তিনি চাদরের আঁচল কেটে রেখে গেলেন, তবু বিড়ালটিকে জাগালেন না।

একবার এক ব্যক্তি একটি কবুতরের বাচ্চা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তার পিছনে পিছনে মা কবুতরটি কাতর হয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছিল। তা দেখে বিশ্ব রহমত রসূলুল্লাহ (স)-র প্রাণ কেঁদে ওঠে। তিনি বাচ্চাটিকে ছেড়ে দিতে বললেন। বাচ্চাটি তখন নিঃসঙ্কোচে মায়ের সঙ্গে ফিরে গেল। তিনি পিপড়া ও কীট-পতঙ্গাদি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে নিষেধ করেছেন। পশু জবেহ করার জন্য তিনি ধারাল ছুরি ব্যবহারের তাকিদ দিয়েছেন। ভোঁতা ছুরিতে পশুর কষ্ট হয় বিধায় তিনি এরূপ বলতেন। একদিন তিনি একটি ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন : এ সকল প্রাণী সম্বন্ধে তোমরা সতর্ক হও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তারা যখন সুস্থ থাকে তখন আরোহণ কর, আর তারা যখন পীড়িত থাকে তখন অবসর দাও।

এরূপ দেখা যায় যে, রাব্বুল আলামীনের বন্ধু হাবিবুল্লাহ ফিরিশতা, জিন, মানব, পশুপাখি, জড়-অজড় সকলের প্রতি রহমত স্বরূপ ছিলেন। বিশ্বের অন্য কোন নবীর সঙ্গে তার তুলনা হয় না।[৬৮]

এ ধারার সমৃদ্ধ ক'টি প্রবন্ধ হচ্ছে : রহমতের নবী : আদর্শের নবী[৬৯] এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন[৭০]। প্রবন্ধসমূহে রাসূল (সা) যে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত তা পরিস্ফুটিত হয়েছে।

---

৬৮. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, 'মহানবী (সা) : সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমতস্বরূপ', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হিজরী সংখ্যাপৃ ৪৭-৬৬।

৬৯. মোঃ মোরশেদ হোসেন, 'রহমতের নবী : আদর্শের নবী', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮ হি সংখ্যা, ১৯৯৭, পৃ ৩৫-৩৯।

৭০. হাফেজ মোহাম্মদ আবদুল করীম কাদেরী, 'রাহমাতুল্লিল আলামীন', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২১ হি*, জা সী ক বা, ঢাকা, ২০০০, পৃ ২৩৭-২৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম প্রচার

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের প্রতিটি দিকই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, বিস্ময়কর, অদ্বিতীয়। তাঁর দা'ওয়াহ নীতিও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। পূর্ববর্তী সকল নবী ছিলেন বিশেষ যুগের অথবা বিশেষ কোন এলাকার। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আহ্বান বিশ্বজনীন। তাঁর আগমন বিশ্বমানবের জন্য। তিনি সত্য ও ন্যায়ের যে দা'ওয়াত দিয়েছেন, তা বিশেষ কোন সময়ের জন্য নয়; বরং সর্বকালের মানুষের জন্য। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রাবন্ধিকগণ বিভিন্ন সময়ে রাসূল (সা)-এর ইসলাম প্রচার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। এখানে এ ধরনের কয়েকটি প্রবন্ধের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম তাঁর *ইসলাম প্রচার ও মহানবী (সা)* প্রবন্ধে লিখেছেন :

বর্তমান দুনিয়ার খৃষ্টানদের সংখ্যা মুসমিলদের দ্বিগুণের বেশি। খৃষ্টধর্মের তুলনায় ইসলাম ধর্ম প্রচারে অনগ্রসরতা, বিফলতা এবং ব্যর্থতার বড় কারণ হলো মুসলিমদের মধ্যে নবী-রাসূলগণের মূল কাজ ধর্মপ্রচারের প্রতি উপেক্ষা এবং তাদের মধ্যে তাবলীগী এবং দাওয়াতী চেতনাহ্রাস এমনকি বিলুপ্তি।

সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন এবং তাবে-তাবেঈনদের পর ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আউলিয়া কিরাম, সূফী-দরবেশগণ। সূফী-দরবেশগণ ধর্ম প্রচারের কাজ অত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন যে, তাঁরা চিরকালের জন্যে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে হিজরত করেছেন, রাসূল (সা)-এর বিবাহ সংক্রান্ত সুন্নাহ পালন তাঁরা করতে পারেন নি। বরং চিরকুমার বা মুজাররদ থেকেছেন এবং সংসার ত্যাগী সাধক হিসেবে দীন প্রচারের কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁরা তাবলীগ এবং দাওয়াহ সংক্রান্ত আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম তামিলের জন্যে রাসূল (সা)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ্ পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন। বিয়ে শাদী করে ঘরসংসার করা এবং খন্ডকালীন হিসেবে তাবলীগ এবং দাওয়াহর কাজ না করে সার্বক্ষণিকভাবে তাবলীগ এবং দাওয়াহর কাজে তাঁর আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের এই ত্যাগ এবং কুরবানীর ফলেই সারাবিশ্বে দীন আল ইসলামের নবীদের পেশা। নবুয়তের প্রথম তিন বছরে সংগোপনে ইসলাম প্রচারের সময় যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, মুসলিম সমাজে তাঁদের মর্যাদা অপরিসীম। দীন প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে কাউকে দীন সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝানো যেত না। সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে পর্যাপ্ত সময়ের দরকার। দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু সে পরিবেশ তখন ছিল না। নবুয়তের প্রথম তিন বছরে দীনের প্রচার ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কারো উপরে গোপনীয়তা সম্পর্কে পরিপূর্ণ আস্থা না থাকলে ইসলামের কথা বলা যেত না।

পারস্পরিক আস্থার প্রয়োজনীয়তা কত গভীর ছিল এ বিষয়টি পরিষ্কার হয় ছোট্ট একটি ঘটনা থেকে ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সা)-এর উপর পিতৃব্য আবূ তালিবের স্নেহ-ভালবাসা ছিল সকল সন্দেহের উর্ধ্বে। রাসূল (সা) এবং বিবি খাদিজা (রা)-র যৌথ সালাত (নামায) দেখে ১০ বছর বয়স্ক আলীর ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়। এটা কোন্ ধরনের ইবাদত তা তিনি জানতে চান। রাসূল (সা) তা ব্যাখ্যা করলেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকে দীনের দাওয়াত দিলেন। বালক আলী শুনে বললেন যে, এ বিষয়টি তিনি তাঁর পিতা আবূ তালিবকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূল (সা) হযরত আলীকে তা করতে নিষেধ করলেন। আবূ তালিবের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ইসলাম সম্পর্কে আবূ তালিবের সংগে আলোচনা করাও তৎকালীন প্রেক্ষাপটে রাসূল (সা) সুবিবেচনা প্রসূত মনে করেন নি। হযরত আলী (রা) অবশ্য পিতাকে এ বিসয়ে জিজ্ঞাসানা করে নিজেই চিন্তা করলেন এবং পরের দিনই তিনি ইসলাম কবূল করলেন।

মুফতী ওয়ালীয়ুর রহমান খান আযহারী *শি'য়াবে আবু তালিবও তায়েফের নির্যাতন : সত্যের পথে কঠিন পরীক্ষা* প্রবন্ধে লিখেছেন :

নবুওয়াতের সপ্তাম বছর কুরাইশদের সকল গোত্র ঐক্যমতের ভিত্তিতে মহানবী (সা.) ও বনী হাশিমের সকল লোকের সাথে ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে-শাদী, আদান-প্রদান ও দেখা-সাক্ষাৎসহ সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করার এক লিখিত চুক্তিপত্র সম্পাদন করে এবং বনী হাশিম ও বনি মুত্তালিবের সকলকে একঘরে ও অন্তরীণ করে ফেলে।

প্রিয় চাচা আবু তালিব কুরাইশদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ, শহর থেকে একটু দূরে অবস্থিত এবং বেশ সুরক্ষিত স্থান হিসেবে তাঁর অধিকারভূক্ত গিরি সংকটকে আপন গোত্রও সম্প্রদায়ের জন্য বেছে নিলেন। ঘর-বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু পিছনে ফেলে রেখে তারা এই সংকীর্ণ গিরি-দূর্গের মধ্যে প্রায় তিন বছরকাল দিনারুণ অনাহার-দুর্ভিক্ষ, দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবতের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করেন। এ সময় কুরাইশরা তাদের নিকট সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। মজুদকৃত খাদ্য-দ্রব্য নিঃশেষিত হওয়ার পর ক্ষুধার যন্ত্রণায় সকলকে অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। গাছের পাতা, কান্নায় আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে। কিন্তু কুরাইশদের পাষাণ হৃদয়ে সামান্য দয়ার উদ্রেক হয়নি।

কুরাইশদের মধ্যে অনেকেই মর্মে মর্মে অনুভব করলো যে, কিছু মানুষের প্রতি এতটা নির্মমতা কিছুতেই সমীচীন হচ্ছে না। ধর্ম ও আদর্শ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সকলেই তো মানুষ। ভিতরে ভিতরে দুয়েকজন হৃদয়বান ব্যক্তি ইতিপূর্বে এই নিস্ঠুর আচরণের বিপক্ষে মত পোষণ করছিল। এবার প্রকাশ্যভাবে তারা প্রতিবাদ শুরু করে দিলো।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি একবার আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার নিকট কি ওহুদ অপেক্ষা কঠিন কোন দিন অতিবাহিত হয়েছে? তিনি বলেছিলেন, সবচেয়ে কঠিন দিন ছিল যেদিন আমি

Dhaka University Institutional Repository

আবদ ইয়ালিলের ছেলেদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম। তারা আমার দাওয়াত গ্রহণ করেনি। আমি সেখান থেকে দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরছিলাম।[৭১]

আবু তাহের মুহাম্মদ মান্‌জুর তাঁর *বায়'আতে আকাবা ও মদীনায় ইসলাম প্রচার* প্রবন্ধে লিখেছেন :

রাসূল (সা)-এর নবুওয়তী জীবনের মক্কায় অবস্থানকালীন তেরো বছর এরকম সংকটে জর্জরিত। কুরাইশদের নিপীড়নে সাহাবীদের হাবশায় হিজরত করতে হয়েছে। মক্কায় ইসলামের আলো প্রদীপ্ত হচ্ছিলো মন্থর গতিতে। এরকম অবস্থায় নবুওয়তের এগারতম থেকে তেরতম বছরে মদীনার আউস ও খাজরাজদের সাথে আকবর রাসূল (সা)-এর সাক্ষাত হওয়া, তাদের ইসলাম গ্রহণ ও রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে নৈতিক নির্দেশাদি এবং এরপর মদীনার বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সমাজে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার শর্তসম্বলিত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ হিজরতের পটভূমি রচনায় ও ইসলামের প্রচার-প্রসারে যুগান্ত কারী পরিবর্তন এনে দেয়।

নবুওয়তের একাদশ বছরে ছয়জন খাযরাজীয়কে রাসূল (সা) ইসলামের আহবান জানালে য়্যাহূদীদের কাছে শোনা নবীর কথা তাঁদের স্মরণে আসে। তাই তাঁরা য়্যাহূদীদের আগেই ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশের সুযোগকে অতি আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে মুসলমান হন। এভাবেই মদীনায় ইসলামের বিজয় সূচিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বায়'আতে আকাবার উভয় পক্ষের কথাবার্তা, আলোচনা ও চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিশ্রুতি থেকে এটা স্বচ্ছ যে, সে মুহূর্তে রাসূল (সা) যথার্থ সামাজিক নিরাপত্তার একটি সুসংহত পরিবেশ সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক ছিলেন। নতুন বায়'আতপ্রাপ্ত মক্কার সম্মানিত সাহাবা ও মদীনার তাঁর সাহাবীগণ কোন আক্রমণের শিকার যাতে না হন বা আক্রান্ত হলে প্রতিরোধে তিন যেন যথাযথ বস্তুগত সহযোগিতা লাভ করেন, এ ধরনের ঈমানী আশ্বাস তাঁর প্রয়োজন ছিল এবং তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠতম চরিত্র মাহাত্ম্যে এবং সুন্দরতম আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা অর্জন করেন। অবশ্য কোন চুক্তি, ওয়াদা, অঙ্গীকার একতরফা কল্যাণ বিবেচনায় হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়। এজন্য আমরা দেখি, রাসূল (সা) শুধু অকুণ্ঠ আনুগত্য ও ওয়াদা নিচ্ছেন না, তাঁর পক্ষ থেকে অকুণ্ঠ প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন। এভাবে উভয় তরফের প্রতিশ্রুতি ও সংহতি ঘোষণার মাধ্যমে মদীনায় যে সুসংহত সমাজের সূচনা ঘটে, বায়'আতে আকাবার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে, কালে তাই মদীনায় ইসলামী সমাজ তথা বিশ্ব ইসলামী মানব সমাজের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং দিক-নির্দেশক আলোকস্তম্ভ রূপে কাল থেকে কালান্তরে মানব সংহতির চেতনার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে।[৭২]

---

৭১. মুফতী ওয়ালীয়ুর রহমান খান আযহারী *শি'য়াবে আবু তালিবও তায়েফের নির্যাতন : সত্যের পথে কঠিন পরীক্ষা*।

৭২. আবু তাহের মুহাম্মদ মান্‌জুর, 'বায়'আতে আকাবা ও মদীনায় ইসলাম প্রচার', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা* ১৪২১ হি, পৃ ১৩৫-১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী *রাসূলুল্লহ (সা)-এর পত্রাবলী : বিশ্বজনীন দাওয়াত* প্রবন্ধে বলেছেন :

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনে গোত্রীয় নবীর প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়ে যায়। আখেরী যামানায় গোটা বিশ্ব যখন একটি পরিবারে রূপ লাভ করেছে, তখন দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাসূল বা বার্তাবাহক প্রেরণের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে আসে। গোটা বিশ্বের জন্য এক ও অভিন্ন বার্তা নিয়ে একজন বিশ্বজনীন রাসূলের আবির্ভাব হবে এটাই যুগ ও কালের দাবি। *রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্রাবলী : বিশ্বজনীন দাওয়াত* প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাণীর বিশ্বজনীনতা ও পত্রাবলী রচনার প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করা হয়েছে। সপ্তম হিজরীর শুরুর দিকের এক সকালে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে গোটা মানবজাতির জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আমি গোটা বিশ্বের জন্য নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং আমি গোটা বিশ্বের রাজা বাদশাহদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিতে চাই। যাতে কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, আমি তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম; আর যাতে করে মানব জাতির কোন একটি বর্ণ বা গোত্রও তার স্রষ্টার পয়গাম থেকে বঞ্চিত না থাকে।' এটাই ছিল সমকালীন বাদশাহদের কাছে পত্র প্রেরণের মূল চেতনা। প্রবন্ধকার রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব রাজা বাদশাহদের কাছে কূটনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন দূত প্রেরণ করেছেন তাদের বিষয়ে উল্লেখ করে বলেছেন : '

রাসূলুল্লাহ এর পত্রাবলী, সন্ধিচুক্তি, ভূমির বরাদ্দপত্র প্রভৃতি দলীল দস্তাবেজ তাঁর পূত জীবনেরই অপরিহার্য অংশ। এগুলোর মাধ্যমেই তাঁর দাওয়াতের আন্তর্জাতিকতার উত্তরণ ঘটে। আমরা মুসলিম জাতি পরম সৌভাগ্যবান যে, আজদীর্ঘ ১৪ শ বছর পরও আমরা আমাদের প্রিয়নবীর সে সব দালীলিক পত্র হুবহু সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছি। অন্য কোন নবীর পত্রাবলী তো দূরের কথা, তাঁদের প্রচারিত বলে কথিত ধর্মগ্রন্থসমূহের বিকৃতি যুক্তির দাবী পর্যন্ত অচল। কারণ সেগুলোর রাবী পরম্পরা সংরক্ষিত নেই। এরূপ দাবীও তারা করেন না।

পত্রগুলোর বাহক বা দূত নির্বাচনেও প্রিয়নবী অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ পত্র হস্তান্তর কালে রাজদরবারে যথারীতি হিদায়াতপূর্ণ ভাষণও দিয়েছেন। যেমন রোমক সম্রাটের দরবারে হযরত দিহইয়া কালবী এবং মিশররাজের দরবারে হাতির ইব্ন আবী বালতা'আ স্মরণীয় ভাষণ দিয়েছিলেন। অনুরূপ আবিসিনিয়ার রাজদরবারে জা'ফর তাইয়ার (রা) যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তা ছিল একটি স্মরণীয় ঐতিহাসিক ভাষণ, নাজাশী এ ভাষণে অত্যন্ত অভিভূত হন এবং শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণও করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবীর পত্রাবলীর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ এভাবে এশিয়া, আফ্রিকা এমনকি ইউরোপ মহাদেশেও নবী করীম (সা)-এর বার্তা ছড়িয়ে পড়ে।[৭৩]

ড. এ. এইচ. এম. মূজতবা হোছাইন তাঁর *আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাসূল (সা)-এর ইসলাম প্রচার* প্রবন্ধে লিখেছেন :

রাসূল (সা) সারা বিশ্বের জন্য অনন্ত রহমতরূপে প্রেরিত হয়েছেন। তাই তাঁকে পৃথিবীর সর্বত্র সত্যের আহবান প্রচার করতে হয়েছে। প্রথম দিকে কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্র সমূহের তৎপরতা ও হীন ষড়যন্ত্রের কারণে বাইরের দিকে মনোনিবেশ করার সুযোগ তিনি পাননি। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বৈরী তৎপরতা কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। তা ছাড়া ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা এই সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় বলে ঘোষণা করায় নবী (সা)-এর দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রেরণা আরও সুগভীর হল। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁকে যে কাজের জন্য মনোনীত করে পাঠানো হয়েছে তা পুরোমাত্রায় সফল হতে চলেছে। এখন সময় এসেছে আরবের বাইরে প্রচার কাজ চালাবার।

হুদাবিয়া সন্ধির অব্যবহতি পরেই তিনি একদিন সাহাবীদেরকে সমবেত করে বললেন : 'আমি সময় জগতের জন্য রহমত ও রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। তোমরা হযরত 'ঈসা (আ)-এর সৈন্যদের ন্যায় মতভেদ কারো না। যাও, আমার তরফ হতে তোমরা সত্যের আহবান জানিয়ে দাও।' ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত, এ কথা তিনি নিঃসন্দেহরূপে জানতেন। তাই তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সত্যের আহবান প্রেরণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবং আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের নিকট সাদর আহবান লিপি প্রেরণের জন্য মনস্থির করলেন।

তৎকালে জগতের ইতিহাসে যে কয়টি রাজশক্তি বিদ্যমান চিল, তন্মধ্যে ইউরোপের রোম সাম্রাজ্য, এশিয়ার শারস্য সাম্রাজ্য এবং আফ্রিকার হাবশা সাম্রাজ্যই ছিল প্রধান। মিসরের 'আযীয মুকওকিস, ইয়ামামার সরদার এবং সিরিয়ার গাসসানী শাসনকর্তাও বেশ প্রতাপশালী ছিলেন। তাই রাসূল (সা) তাঁদের নিকট একদিনে একই সময়ে ইসলামের আহ্বান পত্রসহ ছয়জন দূত প্রেরণ করেন।[৭৪]

ইসলাম প্রচারে কতটুকু গোপনীয়তা প্রয়োজন ছিল তা এই ঘটনা থেকে কিছুটা অনুধাবন করা যায়। ইসলাম প্রচার ও নীতি বিষয়ক ক'টি প্রবন্ধ হল : তবলীগে দীনের ক্ষেত্রে প্রিয়নবী (সা)-এর নীতি[৭৫],

---

৭৩. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী, **রাসূলুল্লহ (সা)-এর পত্রাবলী ঃ বিশ্বজনীন দাওয়াত**, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা।

৭৪. ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, 'আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাসূল (সা)-এর ইসলাম প্রচার', *ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) স্মরণিকা ১৪২০ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ১৯৯৯, পৃ ১০৮-১১৭।

৭৫. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'তবলীগে দীনের ক্ষেত্রে প্রিয়নবী (সা)-এর নীতি', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হিজরী*, পৃ ৯-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

নবুওতের প্রথম তিন বছরে ইসলাম প্রচার[৭৬], ইসলাম প্রচার ও মহানবী (সা)[৭৭], মহানবী (সা) দাওয়াতী জীবন[৭৮] এবং বায়'আতে আকাবা ও মদীনায় ইসলাম প্রচার।

দীন প্রচারে রাসূলুল্লাহর (সা) বিশিষ্টতা[৭৯], হযরত নবী করিম সা.-এর পত্রাবলী[৮০], মহানবীর (সা.) হজরত[৮১], প্রিয় নবীজী (সা)-র পত্রাবলী[৮২], বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর তিন পত্র[৮৩], আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাসূল (সা)-এর ইসলাম প্রচার, ইসলাম প্রচারে মহানবী (সা)-এর উদারতা[৮৪], ইসলাম প্রচারে মহানবী (সা)-এর সুমহান আদর্শ।[৮৫]

---

৭৬. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, 'নবুওতের প্রথম তিন বছরে ইসলাম প্রচার', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৮ হি*, পৃ ৭২-৭৭।

৭৭. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, 'ইসলাম প্রচার ও মহানবী (সা)', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হিজরী সংখ্যা, পৃ ২৪-৩২।

৭৮. মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্দালভী (রা), 'মহানবীর (সা) দাওয়াতী জীবন', এ. জেড. এম শামসুল আলম অনূ., *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ৮০-৮৬।

৭৯. মো. আবুল কাশেম ভূঞা, 'দীন প্রচারে রাসূলুল্লাহর (সা) বিশিষ্টতা', *মাসিক মুসলিম জাহান*, বর্ষ ৯ সংখ্যা ১২, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ১৪২০ হিজরী/২৩-২৯ জুন ১৯৯৯, পৃ ৫৭।

৮০. মুহিউদ্দীন খান, 'হযরত নবী করিম সা.-এর পত্রাবলী', *মাসিক মদীনা*, ৪৪ বর্ষ ১২তম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, মার্চ ২০০৯, পৃ ২৭-৩২।

৮১. মনির উদ্দীন ইউসুফ, 'মহানবীর (সা.) হিজরত', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২১হি/২০০০, পৃ ৮৩-৯৯।

৮২. মুহিউদ্দীন খান, 'প্রিয় নবীজী (সা)-র পত্রাবলী', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ১৪১-১৭৬।

৮৩. মওলানা শাহ আবদুস সাত্তার, 'বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর তিন পত্র', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ৪৬-৪৮।

৮৪. মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক, 'ইসলাম প্রচারে মহানবী (সা)-এর উদারতা', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৩৯-১৪৩।

৮৫. মুহাম্মদ সিরাজুল হক, 'ইসলাম প্রচারে মহানবী (সা)-এর সুমহান আদর্শ', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৫৮-৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত, দৈনন্দিন ও পারিবারিক জীবন

রাসূলুল্লাহ (সা) মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তিনি আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী ও আদর্শ পরিবার প্রধান হিসেবে পৃথিবীর মানুষের জন্য এক অনন্য আদর্শ স্থাপন করেছেন। এখানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যক্তিগত, দৈনন্দিন ও পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে সেব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেসব প্রবন্ধের সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 'প্রাত্যহিক কাজকর্মের সময়' প্রবন্ধে বলা হয়েছে : দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সীমাহীন কর্মব্যস্ততা ছিল। আর রাত ছিল তাঁর একাগ্রচিত্ত দীর্ঘক্ষণ ইবাদতের সময়। দীন-দুনিয়ার সকল কাজকর্ম তাঁকে সমাধান করতে হয়েছে দিনরাতের এই সীমিত সময়ে। তাঁর সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত-প্রভৃতি বিধিবদ্ধ সময়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু তাঁর মুআমালাত বা পার্থিব জীবনের বহু কাজ কর্ম রুটিন বাঁধা ছকে আবদ্ধ ছিল না। রিসালতী জীবনের বিরাট অংশ তিনি ব্যয় করেছেন তাবলীগ ও জিহাদে। তবুও তাঁর প্রাত্যহিক চলাফেরা, ওঠাবসা, পানাহার, নিদ্রা-বিশ্রাম, ক্রয় বিক্রয়, গৃহস্থালী ইত্যাদি কোন কাজ কখন সাধারণত করতেন তা জেনে দেখতে চেষ্টা করা হয়েছে 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রাত্যহিক কাজ কর্মের সময়' নিবন্ধে। সীরাত ও হাদীসের গ্রন্থে নির্দিষ্ট সময়সমেত এসব কাজকর্মের বর্ণনা সাধারণভাবে পাওয়া যায় না। আবার এগুলোর অনেকটির ক্ষেত্রে সময় উল্লেখ করা সম্ভবও হয় না। যেমন জানাযায় অংশ গ্রহণ, রুগ্নের সেবা - এগুলো কখনোই রুটিন বাঁধা ছকে পরিচালিত হয় না।

নবুওয়াত লাভের পূর্বকালীন জীবনে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পাঁচটি জনহিতকর প্রাত্যহিক অভ্যাসের উল্লেখ পাওয়া যায় হযরত খাদিজা (রা)-এর উক্তিতে। দীর্ঘদিনের বৈবাহিক জীবনে হযরত খাদিজা (রা) তাঁর স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর যে মহৎ জীবনাচার প্রত্যক্ষ করেন তা তিনি বর্ণনা করেন এভাবে :

> হে মুহাম্মদ (সা)! না। আল্লাহ্ আপনাকে কখনই অপদস্থ করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখেন। আপনি তো বোঝা বহন করেন। আপনি তো বিত্তহীন নিঃসম্বলের জন্য অর্থোপার্জন করেন। আপনি তো অতিথি আপ্যায়ন করেন। আপনি তো সত্যপন্থীদের সহযোগিতা করেন।

নবুওয়াত পূর্বকালের এই পাঁচটি সামাজিক কর্ম তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবনে আরো ব্যাপকতা লাভ করে। প্রবন্ধকার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরে অতিবাহিত সময় সম্পর্কে এভাবে বলেছেন :

> রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন গৃহে গমন করতেন, তাঁর সময়কে তিন ভাগে ভাগ করতেন বলে একটি হাদীস থেকে জানা যায়। এক ভাগ একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগীর জন্য। আরেক ভাগ পরিবার-পরিজনের জন্য এবং তৃতীয় ভাগ নিজের আরামের জন্য। আবার নিজ আরামের সময়টুকুও

Dhaka University Institutional Repository

লোকজনকে দিয়ে দিতেন। বস্তুত তাঁর বহুমুখী কর্মব্যস্ততার মাঝেও কোন দিন উপরিউক্ত তিন প্রকারের কর্তব্য পালন থেকে তিনি বিরত থাকেননি। আল্লাহ্‌র ইবাদত তথা হাককুল্লাহ্ যেরূপ তিনি আদায় করেছেন সেরূপ আদায় করেছেন হাককুন্ নাস বা মানুষের অধিকার। পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, মুসলিম-অমুসলিম সর্বশ্রেণীর মানুষের কল্যাণ সাধনে তিনি সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। নিজের ও পরিবারের প্রতি যাবতীয় দায়িত্ব-কর্তব্যও তিনি যথাযথভাবে পালন করেছেন।

ফজর থেকে পূর্বাহ্ন, সালাতুদদুহা বা পূর্বাহ্নের নামায, পূর্বাহ্নের কাজকর্ম, গৃহে প্রবেশ ও আহার, হাটবাজার ও মেলায় গমন এবং ক্রয়-বিক্রয়, পাড়াপ্রতিবেশীর সান্নিধ্যে, যোহরের আগে পরে, যোহর থেকে আসর পর্যন্ত সময়ে,

আসর থেকে রাতের শয়ন পর্যন্ত সময়ে, ইশার আগে পরে, রাতে ঘুম, ইবাদত ও অন্যান্য কাজ, রাতে কবর যিয়ারত, রাতে পাড়াপ্রতিবেশীর খোঁজখবর, ফজরের সময়ে, পানাহার ও বিশ্রামের সময়, দু'বার খাদ্য গ্রহণ, ভোরের নাস্তা, পূর্বাহ্নের খাবার ও বিশ্রাম, যোহরের পরে আহার, আসরের পরে আহার, রাতের খাবার ইত্যাদি শিরোনামে বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন।[৮৬]

মহানবী হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর বাসগৃহ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রবন্ধে বলা হয়েছে : রাসূলে করীম (সা)-এর লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে পরকালীন সাফল্যময় জীবন। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের প্রতি তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপই ছিল না। আর ইচ্ছা করেই তিনি দুনিয়াবী জীবন এবং দীনহীনভাবে কাটাবার পথ বেছে নিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা) আমাকে বলেন, মক্কার মরুভূমি আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত করে দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আমি বলেছি, "না, হে আমার প্রতিপালক! আমি একদিন ভুখা থাকব আর একদিন তৃপ্ত হয়ে আহার করব। যেদিন ভুখা থাকব সেদিন তোমার কাছে আমি কান্নাকাটি করে, মিনতি জানিয়ে প্রার্থনা করব, আর যেদিন তৃপ্ত হয়ে আহার করব সেদিন তোমার প্রশংসা ও সানা-সিফাত করব।" এ জন্যই খানাপিনা, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি নিতান্ত যা না হলে চলেনা- সেরূপ ব্যবহার করেছেন। পিঠে শক্ত চাটাইয়ের দাগ পড়ে গিয়েছে তবুও নরম বিছানার এস্তে জাম নিজেতো করেনই নি, অন্যকেও করার অনুমতি দেননি। কেউ করে পৌঁছিয়ে দিলেও তিনি তা হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ তিনি যে দুনিয়াকে মুসাফিকের ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নেয়া 'বৃক্ষতল' থেকে অধিক কিছু ভাবতেন না। আর জানা কথাই যে, মাল-সামানা, তৈজসপত্রাদি যত কম হবে মুসাফিরের পথ চলা ততই আরামদায়ক হবে।

আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা ও মহান এ প্রতিনিধির ঘরবাড়ি ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি কেমন ছিল তার কিছু বিবরণ প্রাবন্ধিক আবদুল জলীল প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন : 'ব্যক্তি জীবনের খাওয়া-দাওয়া,

---

৮৬. আহমদ আবুল কালাম, 'রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রাত্যহিক কাজকর্মের সময়', *ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) স্মরণিকা ১৪২০ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ১৯৯৯, পৃ ১১৮-১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

চলা-ফেরা, উঠা-বসা, কথা-বার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রেই কোনরূপ আদর্শিক শূন্যতা তিনি রেখে যাননি। ছেড়ে যাননি তাঁর উম্মতকে অন্য কোন আদর্শ, মতবাদ বা 'ইজম'- এর মুখাপেক্ষী করে। তাই তো বিধর্মীরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলত, 'তোমাদের নবী তো দেখছি তোমাদের কিছুই শিক্ষা দিতে বাদ রাখে না, এমনকি প্রশাব-পায়খানার রীতিনীতিও'। বস্তুত গোটা উম্মাতকে পূতপবিত্র, শালীন ও মার্জিত এবং আখিরাত ও আল্লাহমুখী করার এক মহান উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এ আদর্শ ও রীতিনীতির প্রবর্তন ও বাস্ত বায়ন করে গেছেন। তাই নিঃসন্দেহে এর কোন একটি দিক 'ক্ষুদ্র বিষয়' জ্ঞানে অবহেলা ও অবজ্ঞা করার নয়। বর্তমানের এই নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে যদি তাঁর পূর্ণাঙ্গ আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণ করা হয় তবে উভয় জগতের কামিয়াবী যে অবধারিত তা নিঃসন্দেহ বলা যায়। প্রবন্ধে তাঁর ব্যক্তি জীবনের কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন : পোশাক-পরিচ্ছদ; জামা; জুব্বা; লুঙ্গি ও কম্বল; চাদর (বুরদা); জোড়া (হুল্‌লা); পাজামা; পাগড়ী; টুপি; চপ্পল; মোজা; খানা-পিনা; থালা; রুটি; গোশ্‌ত; সবজি; খেজুর; শসা; খরবূযা; লাউ; ঘি ও পনির; মিষ্টি ও মধু; পান পাত্র; দুধ; নবীয; ছাত এবং পান পদ্ধতি।[৮৭]

উম্মাহাতুল মুমিনীনের বর্ণনার আলোকে প্রিয় নবীজী (সা)-এর পারিবারিবক জীবন প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পারিবারিক জীবনের একটি চিত্র পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে ভাল মানুষ ওরাই যারা তাদের স্ত্রীদের চোখে ভাল। আর আমি আমার স্ত্রীদের দৃষ্টিতে ভাল মানুষ। মূলত এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশ্বময় সকল মুসলিম সদস্যকে আহ্বান করেছেন স্ত্রীর চোখে ভাল হয়ে ওঠার। কারণ স্বামী-স্ত্রী হলো পৃথিবীর জীবনের প্রধান স্তম্ভ অথবা প্রধান পরিচালক। তাদের আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, হাস্য-রসিকতা, তথা দৈনন্দিন জীবন স্পন্দনের আলোকেই গড়ে ওঠে তাদের সন্তানরা - আগামী প্রজন্মের কর্ণধাররা। তাই সভ্যতার এই প্রথম পাঠশালার প্রধান পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রসূলুল্লাহ্ (সা) - যেন তারা তাদের ভবিষ্যত স্বপ্ন-কাঙ্খিত উত্তরাধিকারীর সামনে সুন্দর আদর্শ তুলে ধরে একটি উন্নত মানব কাফেলা নির্মাণে অংশীদার হয়।

হ্যাঁ, নবী-পত্নীগণ নিশ্চয় পৃথিবীর অন্যান্য নারীদের মত নন। কারণ, সারা পৃথিবীর সকল নারীদের থেকে তাঁদেরকে নির্বাচন করেছেন মহান প্রভু তাঁর প্রিয় রাসূলের জীবনসঙ্গিনীরূপে। নির্বাচন করেছেন প্রিয়তম রাসূলের একান্ত খুঁটি-নাটি সকল বিষয় বিশ্বময় সকল মানুষের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে। কারণ, নবী-জীবনে প্রতিটি উচ্চারণ, স্পন্দন, কথন, সমর্থন সব কিছুই মানবজাতির জন্যে প্রত্যয়দীপ্ত পথ প্রদর্শক। সুতরাং উম্মাহাতুল মুমিনের সাথে যাপিত নবীজীর পারিবারিক জীবন-সৌন্দর্যের প্রতিটি কণিকাই নারী-পুরুষ সকলেরই সমানভাবে পথপ্রদর্শক, সমান কল্যাণকর, অনুসরণীয়।[৮৮]

---

৮৭. আবদুল জলীল, 'মহানবী হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর বাসগৃহ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) স্মরণিকা ১৪২২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ৭৪-৮১।

৮৮. মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন, 'উম্মাহাতুল মু'মিনীনের বর্ণনার আলোকে প্রিয় নবীজী (সা) এর পারিবারিক জীবন', *অগ্রপথিক, ঈদে মিলাদুন্নবী (স.)* ১৪২১ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০০, পৃ ১০৯-১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত রসূলে আকরাম (সা) 'তিনি কিভাবে শয়নে করতেন' প্রবন্ধে তাঁর এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে। যেমন– 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিছানা ' সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> 'হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শয়নের বিছানা ছিল চামড়ার, যার মধ্যে খর্জুর বৃক্ষের ছাল ভরে দেয়া হয়েছিল। হযরত আয়শা (রা) আরও বলেন, একবার জনৈকা আনসারী মহিলা আমাদের গৃহে আগমন করল এবং রসূলুল্লাহ (সা)-এর বিছানাটি দেখল। সেটি ছিল একটি বিছানো আবা (আরব দেশীয় পোশাক বিশেষ)। মহিলা ফিরে গিয়ে একটি পশমভর্তি বিছানা তৈরী করল এবং রসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যবহারের জন্য আমার কাছে পাঠিয়ে দিল। হুযুর (সা) গৃহে এসে এটি রাখা দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কি? আমি আরজ করলাম, অমুক আনসারী মহিলা এসেছিল। সে আপনার বিছানা দেখে এটি তৈরী করে পাঠিয়েছে। রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করলেন, এটি ফিরিয়ে দাও। বিছানাটি আমার কাছে খুব ভাল মনে হচ্ছিল; তাই ফিরিয়ে দিতে মন চাইছিল না। কিন্তু হুযুর (সা) পীড়াপীড়ি করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, আমি চাইলে আল্লাহ পাক আমার জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাহাড়ি চালু করে দেবেন। হুযুর (সা)-এর এ কথা শুনে আমি বিছানাটি ফেরত পাঠিয়ে দিলাম।'[৮৯]

এ ছাড়া এ প্রাসঙ্গিক আরো ক'টি প্রবন্ধ হচ্ছে : রাসূলুল্লাহর (সা) দাম্পত্য-জীবন[৯০], মহানবী (সা.)-এর পারিবারিক জীবন[৯১], বহু বিবাহ : রাসূল (সা)-এর দৃষ্টিতে[৯২], দৈনন্দিন জীবনে প্রিয়নবী (সা)-এর আদর্শ[৯৩], পরিবার প্রধান হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা)[৯৪], শ্রেষ্ঠ নবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠ সহধর্মিণী হযরত খাদীজা (রা)[৯৫], প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবন[৯৬], দৈনন্দিন জীবনে প্রিয়নবী (সা)।[৯৭]

---

৮৯. রায়হান মোহাম্মদ ইব্রাহীম, 'রাসূলুল্লাহ (সা) যেভাবে শয়ন করতেন', *মাসিক মদীনা*, ৩৫ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, জুন ১৯৯৯, পৃ ৭৯-৮০।

৯০. মুহিউদ্দীন খান, 'রাসূলুল্লাহর (সা) দাম্পত্য-জীবন', *মাসিক মদীনা*, ৩৮ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, জুন ২০০২, পৃ ১৩-১৯।

৯১. আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, 'মহানবী (সা.)-এর পারিবারিক জীবন', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ১৫২-১৫৬।

৯২. আবদুল খালেক, 'বহু বিবাহ : রাসূল (সা)-এর দৃষ্টিতে', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ৩৩-৪৬।

৯৩. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, 'দৈনন্দিন জীবনে প্রিয়নবী (সা)-এর আদর্শ', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ১৯৮-২০২।

৯৪. কাজী আবু হোরায়রা, 'পরিবার প্রধান হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা)', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ২৪৬-২৪৮।

৯৫. নজরুল ইসলাম ইবনে তাহের, 'শ্রেষ্ঠ নবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠ সহধর্মিণী হযরত খাদীজা (রা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ২৬৫-২৬৯।

৯৬. নীলুফার বানু, 'প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবন', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৩, পৃ ৮৪-৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইবাদত

রাসূলে কারীম (সা)-এর ইবাদত ছিল সে সময় সাহাবীদের কাছেও বিস্ময়কর প্রেরণাদায়ক। আখেরী নবী ও শাফায়াতের রাসূল হওয়া সত্ত্বেও ইবাদতের প্রতি তাঁর একাগ্রতার উদাহরণ বিশ্ব সৃষ্টির পর আরেকটি নেই। এখানে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা হলো।

হাফেজ রফিক আহমদ *রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাত্রিকালীন আমল* প্রবন্ধে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রাত্রিবেলার আমল উপস্থাপন করেছেন।[৯৮] এতে হযরত রাসূল (সা)-এর ফরয ও ওয়াজিব আমলসমূহ এবং এতদসংক্রান্ত মাসয়ালা-মাসায়েলের বর্ণনা থাকবে না। কেবল হযরত রাসূল (সা)-এর আমলের সেই অংশের উল্লেখ থাকবে, যেগুলো আমাদের উপর ফরয অথবা ওয়াজিব নয়, কিন্তু তাতে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রচুর কল্যাণ রয়েছে। প্রত্যেক আমলের সাথে বরাতের উল্লেখ থাকবে। যেসব আমল সহীহ্ রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত কেবল তাই উল্লেখ করা হবে। সব আমল রাসূল (সা) নিজে করেছেন অথবা উম্মতকে করার জন্য নির্দেশ করেছেন – উভয় প্রকার আমলই বর্ণনা করা হবে। যেহেতু শরীয়তের যাবতীয় বিষয়ের মূল হল কুরআনুল করীম তাই প্রথমে কুরআনুল করীমের আয়াত দিয়ে আলোচনা আরম্ভ করছি।

আবদুল আজীজ আল্-আমান *রাসূলে পাক (সা)-এর গভীর রাতের নামায* সম্পর্কে লিখেছেন :

> হযরত রাবিয়া ইবনে কাব দায়ামী (রা) হলেন তাঁদেরই একজন যাঁরা রাতের বেলা পালাক্রমে পবিত্র কুটির পাহারা দিতেন। একদিন রাতে এই মুবারক আস্তানার বাইরে এসে বসলেন তিনি, বসেই শুনতে পেলেন হুযূর আকরাম (সা)-এর যিকিরের সুমধুর গুঞ্জরণ। তসবিহ ও জিকিরের আওয়ায বহুক্ষণ ধরে শুনলেন, শুনতে শুনতে তিনি নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কেবল ক্লান্ত নন সেই মানুষটি, কর্মবহুল দিনে যাঁর অবসর মিলেনি এক মুহূর্ত, বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা, কুরাইশদের হামলার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ, ইয়াহুদি চক্রান্তে সতর্ক হওয়া, অভাব-অভিযোগ শ্রবণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ, বিচর-পরিচালনা প্রভৃতি হাজারো দায়িত্ব সম্পন্নের পর রাতের অবসর মুহূর্তে ক্লান্তি হীনভাবে আল্লাহর জিকিরে মশগুল তিনি।

---

৯৭. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'দৈনন্দিন জীবনে প্রিয়নবী (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) স্মরণিকা ১৪২০ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ১৯৯৯, পৃ ৪৪-৪৮।

৯৮. হাফেজ রফিক আহমদ, 'রসূলুল্লাহ (সা)-এর রাত্রিকালীন আমল', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ১৭৩-১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

মাসনাদ আহমদের চতুর্থ খন্ডে এ সম্পর্কে বর্ণনা; রাবিয়া ইবনে কাব দায়ামী (সা) বলেন, 'রাতের বেলায় হুযূর (সা)-এর যিকির-তসবিহর আওয়ায শুনতে শুনতে অনেক সময় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, আমার দু'চোখে নিদ্রার আবেশ নেমে আসত।'[৯৯]

অধ্যাপক মাওলানা আহমদ আবুল কালাম *রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেভাবে নামায পড়তেন* প্রবন্ধে লিখেছেন :

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিয়মিতভাবে কমপক্ষে দশ রাকআত সুন্নত নামায পড়তেন। ফজরের আগে দু'রাকআত, যোহরের আগে দু'রাতআত, যোহরের পরে দু'রাকআত, মাগরিবের পরে দু'রাকআত ও ইশার পরে দু'রাকআত। কম করে পড়তে চাইলে তিনি এই দশ রাকআত পড়তেন, মচেত তিনি যাহরের পূর্ব চার রাকআত সুন্নতসহ ১২ রাকআত পড়তেন, কোন কোন দিন ষোল রাকআত বা তার বেশিও পড়তেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের আযানের পরপরই নিজঘরে অবস্থান করে দু'রাকআত সুন্নত পড়তেন। সকল সুন্নতের মধ্যে তিনি ফজরের এই সুন্নতের প্রতি সর্বাধিক যত্নীশল ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তাঁর কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর চেয়ে ফজরের সুন্নত অদিকতর, পছন্দনীয় ছিল। তিনি এই দু'রাকআত নামায যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি এই নামাযে সূরা ইখলাস ও সূরা কাফিরূন পড়তেন, সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরানের অংশবিশেষও পড়তেন কখনও কখনও। তিনি ফজরের সুন্নতের পরে ডানদিকে কাত হয়ে শুয়ে কিছুটা আরাম করতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যোহরের পূর্বে কোনদিন দু'রাকআত, কোন কোন দিন চার রাকআতে পড়তেন। তিনি চার রাকআতে একবারে পড়তেন কিংবা দুই দুই রাকআত করে দুইবারে পড়তেন। যোহরের পরে তিনি দুই রাকআত সুন্নত পড়তেন। তিনি বলেছেন, যিনি যোহরের পূর্বে চার রাকআত ও পরে চার রাকআত নামায নিয়মিত পড়বেন আল্লাহ্ তার গোশত জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন। তাঁর যোহরের সুন্নত ছুটে গেলে তিনি তা অন্য সময় বিশেষ করে আসরের পরে কাযা করে নিতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসরের পূর্বে কখনও কখনও চার রাকআত সুন্নত নামায পড়তেন। তিনি সূর্যাস্তের পরপরও মাগরিবের নামায পড়তেন। মাগরিবের পূর্বে তিনি কোন সুন্নত পড়তেন না। তবে তাঁর সাহাবায়ে-কিরাম মাগরিবের পূর্বে দু'রাকআত সুন্নত নামায মসজিদে পড়তেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে তা পড়তে দেখতেন; তিনি তাদেরকে তা পড়তে না নিষেধ করতেন আর না আদেশ করতেন। মাগরিবের পরে তিনি নিয়মিত দু'রাকআত সুন্নত পড়তেন এবং তা নিজ ঘরেই পড়তেন। হাফিয ইবন আর কাইয়্যিম বলেছেন, মাগরিবের দু'রাকআত সম্পর্কে এমন কোন বর্ণনা নেই যে, তিনি তা মসজিদে পড়েছেন। একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) বনি আবদুল আশহাল মসজিদে মাগরিবের ফরয পড়ে দখতে পান তারা সুন্নত নামায পড়ছে। তিনি তাদের বললেন, 'এ তো ঘরের নামায' –

---

৯৯. আবদুল আজীজ আল-আমান, 'রাসূলে পাক (সা.) এর গভীর রাতের নামায', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ১১৪-১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

> তোমাদের এ নামায ঘরে পড়া উচিত'। ইশার পরে তিনি নিয়মিত দু'রাকআত সুন্নত নামায পড়তেন নিজ ঘরে এসে।

মূলত রসূলুল্লাহ্ (সা)–এর সাধারণ রীতি ছিল বিশেষ কোন ওযর না থাকলে তিনি যাবতীয় সুন্নত নামায ঘরেই পড়তেন যেমন পড়তেন যাবতীয় ফরয নামায মসজিদেই। তিনি বলেছেন, ফরয ব্যতীত অন্যান্য নামায আমার মসজিদে পড়ার চেয়ে নিজ ঘরে পড়া উত্তম।[১০০]

সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী *হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর দু'আ* সম্পর্কে লিখেছেন :

> দু'আ করার জন্য প্রয়োজন হল যে সত্তার নিকট দু'আ করা হবে তাঁর প্রতি পূর্ণ ও সঠিক বিশ্বাস পোষণ। অতঃপর এ বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি দান করার সর্বময় শক্তির অধিকারী এবং দান করার মত সব কিছুই তাঁর ভাণ্ডারে রয়েছে। এ কথাও বিশ্বাস ও স্বীকার করতে হবে দু'আ করার জন্য তাঁর দরবার ব্যতীত আর কোন দরবার নেই।

হযরত রাসূল (সা)-এর তায়েফের ঘটনা কত হৃদয়বিদারক তা তো সকলেরই জানা। ...হযরত রাসূল (সা) কত আশা করে ও আবেগসহ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন তায়েফবাসীর নিকট। কত আবেগভরা কণ্ঠে তাদেরকে উদাত্ত আহবান জানিয়েছিলেন আল্লাহর দীন গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু তায়েফবাসী কত নির্দয়ভাবে তার জবাব দিয়েছিল! আঘাত আর অত্যাচারে নবীর দেহ মুবারক রক্তে লাল করে দিয়েছিল। তেমনি আশাহতও ভগ্নমনের কষ্ট, দৈহিক আঘাতের যাতনা ও সফর এবং শত্রুকৃত জুলুমের ক্লান্তি-ক্লেশসহ তখন মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল তার সঠিক অবস্থা অনুভব করা খুবই দূরূহ। নবীজী ঐ অবস্থায় একটি বাগানে বসে মহান আল্লাহর দরবারে যে মুনাজাত করলেন তার শব্দমালা হল এই : 'হে আমার আল্লাহ! আমি আমার দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব এবং মানুষের উপেক্ষার জন্য আপনার দরবারে ফরিদয়াদ করছি। আপনি সকল দয়ালুর অধিক দয়ালু। অসহায় দুর্বলদের তো আপনিই মালিক এবং আমারও মালিক আপনিই। হে মালিক! আমাকে কার নিকট অর্পণ করা হচ্ছে? কোন অভদ্র ও নির্দয় শত্রুর নিকট, না কোন আপন প্রিয় বন্ধুর নিকট যিনি আমার কর্মসাধনে সহায়ক? আমার প্রতি যদি আপনার কোন অসন্তুষ্টি না থাকে তাহলে আমার আর কোন চিন্তা নেই। কিন্তু আপনার নিরাপত্তাই আমার জন্য অধিক বিস্তৃত। হে আল্লাহ! আমি আপনার মহান সত্তার সেই নূরের আশ্রয় চাই যা দ্বারা সকল অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং দীন দুনিয়ার সকল কর্মই তা দ্বারা সুসম্পন্ন হয়। হে আল্লাহ! আমার প্রতি আপনার অসন্তুষ্টি বা ক্রোধ যাই পতিত হোক না কেন, আপনার সন্তুষ্টিই

---

১০০. অধ্যাপক মাওলানা আহমদ আবুল কালাম, 'রসূলুল্লাহ্ (সা) যেভাবে নামাজ পড়তেন', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ১৮৪-১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

আমার কাম্য। সৎ কাজ করার বা পাপ কাজ পরিহার করার ক্ষমতা আমি আপনার কাছ হতেই লাভ করি।[১০১]

আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের চিন্তা সম্পর্কে বিশ্বনবী (সা)[১০২], নবী করীমের (সা) জীবনে দোয়ার ভূমিকা[১০৩], রাসূলে পাক (সা.) এর গভীর রাতের নামায, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাতের নামায[১০৪], আল্লাহর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভয়, আনুগত্য ও দাসত্ব[১০৫], হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর দু'আ, রাসূলুল্লাহ (সা)-র রাত্রিকালীন আমল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেভাবে নামাজ পড়তেন, ইবাদতে মহানবী (সা)-এর ভারসাম্য ও একাগ্রতা[১০৬]।

---

১০১. সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, মুফ্তী মুহাম্মদ নূরউদ্দীন অনূদিত, 'হযরত রসূলে করীম (সা)-এর দু'আ', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ৮৫-১১০।

১০২. মো. ফজলুল করীম, 'আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের চিন্তা সম্পর্কে বিশ্বনবী (সা)', *মাসিক মুসলিম জাহান*, বর্ষ ৯ সংখ্যা ১২, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ১৪২০ হিজরী/২৩-২৯ জুন ১৯৯৯, পৃ ৪৮-৫৪।

১০৩. মনযুর নোমানী, আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূদিত, 'নবী করীমের (সা.) জীবনে দোয়ার ভূমিকা', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ৫৯-৬১।

১০৪. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাতের নামায', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মীলাদুন্নবী (সা) ১৪২০, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৯, পৃ ৯৬-৯৯।

১০৫. আবদুল জলীল, 'আল্লাহর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভয়, আনুগত্য ও দাসত্ব', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মীলাদুন্নবী (সা) ১৪২০, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৯, পৃ ১২১-১২৫।

১০৬. মাওলানা কাজী আবু হোরায়রা, 'ইবাদতে মহানবী (সা)-এর ভারসাম্য ও একাগ্রতা', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৬৪-১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্টতা

হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন অনন্য ও অনুপম আদর্শ। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অনুসরণীয় ও বৈশিষ্টমণ্ডিত। এখানে রাসূল (সা)-এর বিশিষ্টতা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের কিছু দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা হলো।

মওলানা মুশতাক আহমদ *মহানবী (সা)-এর জন্য একান্ত বিধানসমূহ : মুজতাহিদ ও ফকীহদের দৃষ্টিতে* প্রবন্ধে লিখেছেন :

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বিশেষ কিছু বিধি-বিধান নির্ধারিত রাখেন যা উম্মতের জন্য ঠিক একই গুরুত্বে বিধি হিসেবে প্রযোজ্য নয় অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কোন কোন পবিত্র কাজ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য আদৌ প্রযোজ্য নয়। প্রবন্ধে এ ধরনের একান্ত বিধানসমূহ সম্পর্কে বিশিষ্ট মুজতাহিদ ও ফকীহগণের দৃষ্টিতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। মানব সমাজকে এ সকল বিধি-বিধানের আলোকে গড়ে তোলার স্বার্থে তাঁকে সন্দেহজনক সকল অবস্থানের উর্ধ্বে অবস্থান করতে হয়। এ কারণেই উম্মতের জন্য হালাল কিছু কিছু কাজ তিনি নিজের জন্য হারাম করে নেন, আবার উম্মতের জন্য মুবাহ কিছু কাজ তিনি নিজের জন্য ফরয করেন। পরিভাষায় এই ব্যতিক্রমী বিধানগুলো মহানবীর একান্ত বিধান নামে পরিচিত।

শরীয়তে মহানবী (সা.)-এর একান্ত বিধানগুলো চার ভাগে বিভক্ত, যথা : ১. উম্মতের জন্য ফরয নয় কিন্তু মহানবীর জন্য ফরয, ২. উম্মতের জন্য হালাল কিন্তু মহানবীর জন্য হারাম, ৩. উম্মতের জন্য মাকরূহ তবে মহানবীর জন্য মুবাহ, ৪. নবী হিসাবে মহানবীর জন্য বিশেষ অনুমতি।

১. মহানবীর জন্য ফরয বিধানসমূহ, যেমন– এক. তাহাজ্জুদ নামায পড়া, সকল ফকীহ ও মুজতাহিদের মতে প্রত্যহ শেষরাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়া অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। ব্যক্তি পক্ষে এ নামায দ্বারা আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করা সম্ভব, অন্য কোন নামায দ্বারা ততটা সম্ভব নয়। এতদসত্তেও কারো মতে এ নামায উম্মতের ওপর ফরয নয়।

২. মহানবীর জন্য হারাম ছিল এ পর্যায়ের বিধানসমূহ নিম্নরূপ, যথা– এক. সাদকা গ্রহণ করা, গরীব ও বিপদগ্রস্তদের জন্য সাদকা গ্রহণে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু মহানবীর জন্য সাদকা গ্রহণ সর্বাবস্থায় ছিল হারাম। যাকাত, ফিতরা, কাফফারা, মানত ইত্যাকার কোন কিছুই গ্রহণ করা তাঁর জন্য বৈধ ছিল না। তিনি ইরশাদ করেন ঃ এ সকল সাদকা মানুষের সম্পদের ময়লা অংশ। এগুলো ও মুহাম্মদের পরিবার-পরিজনের জন্য হারাল নয়।

৩. যে সকল বিষয় কেবল মহানবীর জন্য মুবাহ ছিল অন্যদের জন্য নয়, সেগুলো নিম্নরূপ : এক. আসরের পর নফল পড়া ঃ আসর নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নফল নামায পড়া উম্মতের জন্য মাকরূহ। কিন্তু মহানবী (সা.) এ সময়ে নফল পড়তেন, তাঁর জন্য মুবাহ ছিল। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন : প্রিয়নবী (সা.) আসরের পরে নিজে নফল পড়তেন, কিন্তু অন্যদেরকে নিষেধ করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪. নবী হিসেবে প্রিয় নবীর জন্য যে সকল বিশেষ অধিকার ও অনুমতি ছিল সেগুলো নিরূপ। যথা– এক. নবীর সমক্ষে অগ্রণী না হওয়া ও কণ্ঠস্বর উঁচু না করা, উম্মতের জন্য চলার পথে একজন অন্যজনের সম্মুখে চলে যাওয়া কিংবা স্বর উচ্চ করে কথা বলা আপত্তির নয়, কিন্তু উম্মতের জন্য মহানবীর সমক্ষে অগ্রণী হওয়া কিংবা কথা বলতে স্বর উচ্চ করা নিষিদ্ধ ছিল। ইরশাদ হচ্ছে, হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বষয়ে অগ্রণী হয়ো না। আরো ইরশাদ হচ্ছে,তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল নবীর সাথে সেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলবে না। কারণ এতে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে।

নবীপত্নীর পুনর্বিবাহ : যে কোন মুসলিম বিধবার জন্য স্বামীর ইন্তিকালের পর অন্যত্র বিবাহের অনুমতি আছে, বরং অন্যত্র বিবাহে আবদ্ধ হওয়া শরীয়তের নিকট অধিক পছন্দনীয়। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। তাঁর পত্নীগণ সকল মুসলমানের জননী হিসাবে স্বীকৃত। তাই প্রিয় নবীর ইনতিকালের তাঁর বিধবা পত্নীদের জন্য অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কিংবা তাদেরকে কারো বিবাহ করা হারাম।[১০৭]

মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী *ইলাহ হিফাযতে মহানবী (সা) জীবনকালে ও ওফাতের পরে* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন :

> কুরআন ও হাদীস যেমনিভাবে সংরক্ষিত ছিক তেমনিভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর যাত এবং সত্তাও সংরক্ষিত। আকীদা-বিশ্বাস, তাবলীগে আহকাম, ফাতাওয়াও ইজতিহাস, কাজ-কর্ম, স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে তিনি যেমনি ভাবে নাফস ও শয়তান থেকে সংরক্ষিত অনুরপভাবে তাঁর সত্তাও সদ্য ইলাহী হিফাযত দ্বারা সংরক্ষিত। নূরে মুহাম্মদীর সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে ওফাত পর্যন্ত এমনকি ওফাতের পরও নবী করীম (সা)-এর পবিত্র সত্তা সর্বক্ষণ হিফাযতে বিদ্যমান। এ হিফাযত ক্ষণিকের জন্যও তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি।
>
> এক সময় এমন ছিল যখন আল্লাহর সত্তা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ফুল ছিল, ফুলের ঘ্রাণ ছিল, কিন্তু ঘ্রাণ নেওয়ার মত কোন বস্তু ছিলনা। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মা রিফাতের সুমধুর ঘ্রাণ সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সৃষ্টি করলেন নূরে মুহাম্মদী। মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক গ্রন্থে উদ্ধৃত এক হাদীসে আছে হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, একদা আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোন। আমাকে এই তথ্যটি জানিয়ে দিন যে, আল্লাহ্ তাআলা কোন জিনিসটি সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হে জাবির! আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম তাঁর নূর (এর ফয়েয) থেকে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেন। অতপর সে নূর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তার কুদরতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছিল। সেই সময়টাতে লওহ্ ছিলনা, কলম ছিলনা, জান্নাত ছিলনা, জাহান্নাম ছিলনা, ফিরিশতা ছিলনা, আসমান ছিলনা, যমীন ছিলনা, সূর্য ছিলনা, চন্দ্র ছিলনা, জিন ছিলনা, মানুষ ছিলনা – কিছুই ছিলনা। তারপর যখন আল্লাহ্ তাআলা আরো

---

১০৭. মওলানা মুশতাক আহমদ, 'মহানবী (সা.)-এর একান্ত বিধান : মুজতাহিদ ও ফকীহদের দৃষ্টিতে', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ১৩২-১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

> মাখলুক সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি সে নূরকে চার ভাগে বিভক্ত করলেন। এক ভাগ দ্বারা কলম তৈরী করলেন, অপর ভাগ দ্বারা সৃষ্টি করলেন লওহ এবং আরেক ভাগ দ্বারা আরশ তৈরী করলেন..... ।

মক্কা থেকে বের হয়ে হযরত নবী করীম (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে গারে সাওরে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং সেখানে তারা তিনদিন আত্মগোপন করে থাকেন। এদিকে নবীজীর গৃহ অবরোধকারী কাফির যুবকরা সকালে নবীজীকে সেখানে না পেয়ে তাঁর তালাশে বেরিয়ে পড়ে। এমনকি 'কিয়াফা সিনাস' তথা পদচিহ্ন বিশারদ লোকেরা পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে করে ঠিক গুহার মুখ বরাবর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। একটু উঁকি মেরে তাকালেই তারা নবীজীকে পেয়ে যেতো। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীকে তখনও এদের হাত থেকে কুদরতে হিফাযত করেন। কিতাবে আছে, মহানবী (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা) গুহার ভিতর প্রবেশ করতেই আল্লাহ পাকের গায়েবী নির্দেশে রাতের মধ্যেই গুহার দ্বারে মাকড়সা জাল বুনে দেয় এবং বন্য কবুতর এসে সেখানে বাসা বানিয়ে একজোড়া ডিম দিয়ে সে ডমের উপর তা দিতে থাকে। এমন কি এক রাতের মধ্যে ঐ গুহারমুখে বাবুল বৃক্ষ গজিয়ে ওঠে। তা-সত্ত্বেও সঙ্গী আবূ বকরের মনে ভীষণ বয়। না জানি দুশমনরা ধরে ফেলে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মনে বিন্দুমাত্রও চিন্তা নেই। তিনি কেবল আবূ বকর (রা)-কে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ঃ ভয় করোনা, আল্লাহর হিফাযত আমাদের সাথে আছে। কুরআন মজীদে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে : তোমরা যদি তাকে সাহায্য না কর তবে আল্লাহ্ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাকে বের করে দিয়েছিল এবং সে ছিল দুই জনের দ্বিতীয় জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; সে তদখন তাঁর সঙ্গীকে বলেছিল, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন। অতপর আল্লাহ তাঁর উপর স্বীয় প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন। আল্লাহর কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৯-৪০)। এমনি করে তায়িফে এবং ওহুদ প্রান্তরেও আল্লাহ্ তাআলা আপন হিফাযতে মহানবী (সা)-কে রক্ষা করেন। পক্ষান্তরে, পাপিষ্ঠ কাফিররা চেয়েছিল তাঁকে জীবনে শেষ করে দিতে। কিন্তু আল্লাহর হিফাযতের সামনে তাদের সমুদয় কারসাজি অসফল ও ব্যর্থ হয়ে যায়।

আল্লাহ্ পাক যেমনিভাবে তাঁর প্রিয় হাবীবকে জীবদ্দশায় ও ওফাতের পর হিফাযত করেছেন ঠিক তেমনিভাবে তিনি তাঁর কথা, কর্ম ইত্যাদিরও হিফাযত করছেন পরিপূর্ণ ভাবে। বাতিলের মিশ্রণ থেকেও তিনি তাঁকে ও তাঁর সুন্নাকে হিফাযত করছেন। সর্বোপরি তিনি ও মুবারক কাজে নিয়োজিত করেছেন সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, মুহদ্দিসীন, সুলাহা ও ফুকাহায়ে উম্মতের সুমহান জামাআতকে। তাঁরা আমরণ সাধনা করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা, কর্ম ও সমর্থনকে হিফাযত করেছেন পূর্ণাঙ্গরূপে।[১০৮]

---

১০৮. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, 'ইলাহী হিফাযতে মহানবী (সা) : জীবনকালে ও ওফাতের পরে', *ঈদে মিলাদুন্নবী সা. স্মরণিকা ১৪২১ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০০, পৃ ৫৭-৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

মি'রাজ

আরবী মি'রাজ শব্দের অর্থ হল সিঁড়ি, সোপান, ঊর্ধ্বগমন বা আরোহণ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় হিজরতের এক বছর পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হয়। মি'রাজ মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়ত ও রিসালতের এক শ্রেষ্ঠতম অলৌকিক নিদর্শন। এ বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকদের আগ্রহ ব্যাপক। একানে কয়েকটি প্রবন্ধের মৌল ধারাণা উপস্থাপন করা হলো।

ড. শহীদুল্লাহ্ মৃধা তাঁর *মহানবী (সা.)-এর মি'রাজ ও বিজ্ঞান* প্রবন্ধে বলেছেন :

> মহানবী (সা.) মি'রাজের রাত্রে মহাশূন্যলোকে ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেখানে রসূলে করীম বেহেশত ও দোযখ দেখেছিলেন, রব্বুল আলামীন আল্লাহর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তা ছাড়া আঠারো হাজার আলম বা জগত তথা সমগ্র সৃষ্টিলোকের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি যখন পৃথিবীতে মক্কা নগরীতে স্বীয় গৃহে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁর শয়নকক্ষের বিছানায় তাঁর দেহের উষ্ণতা বিদ্যমান ছিল এবং তিনি দেখলেন যে, ওযূর অবশিষ্ট পানিটুকু তখনও গড়িয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন হাদীসে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।
>
> বর্ণিত আছে, মি'রাজে তিনি তিন লক্ষ বছরের পথ পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং তাতে জাগতিক সাতাশ বছর সমপরিমাণ সময় ব্যয়িত হয়েছিল। অথচ অযূর পানি তখনও গড়িয়ে পড়েছে অর্থাৎ পৃথিবীর ঘড়িতে ৬০ সেকেন্ডেরও কম সময় এতে লেগেছে। এক কথায় বলা চলে মহানবী (সা.) এক মিনিটের মধ্যে সাত আকাশ সাত জমিন ভ্রমণ করে বিশ্ব জগতের সব রহস্য দেখে নিয়েছিলেন; বহু নবী-রসূলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি নবী ও ফেরেশতাদের নামাযে ইমামতি করেছিলেন। বেহেশত ও দোযখে তাদের অধিবাসীদেরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, মহান আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছিলন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিধান নিয়ে বুরাক ও রাফরাফে করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন।
>
> বাংলায় জাহান মিয়া, মেজর কামাল ও আশরাফুল কাদেরের তিনটি বই রয়েছে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য বা মি'রাজ ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনার। এই প্রচেষ্টাগুলো আশাব্যঞ্জক। অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে গবেষণার মাধ্যমে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির স্বরূপ বোঝাবার জন্য তাগিদ রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধকার বিশ্বাস করেন যে, কোন একটি অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন মহাকাশযানে করে মহানবী (সা)-এর মি'রাজ সংগঠিত হয়েছিল।[১০৯]

ড. এম. শমশের আলী *মিরাজুন্নবী (সা)* প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিরাজকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন :

> বিজ্ঞানের সূত্র ধরে এটুকু বলা চলে, অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে মক্কা থেকে জেরুজালেমে গমন করা কোন অসম্ভব বিষয় নয়। তবে অধিকতর কঠিন যে প্রশ্নটি তা হচ্ছে সপ্ত আসমানে আরোহণের

---

১০৯. ড. শহীদুল্লাহ মৃধা, 'মহানবী (সা)-এর মি'রাজ ও বিজ্ঞান', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, পৃ ৬৩-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারটি। এখানে অসাধারণ গতিবেগে পৌছানোর আগে acceleration বা ত্বরণের প্রশ্নটি নিহিত আছে। আরো একটা প্রশ্ন। ভ্রমণে সময় কতটুকু লেগেছে? এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে যিনি ভ্রমণ করছেন না, তার ঘড়িতে এই ভ্রমণে যতটা সময় ব্যয়িত হয়েছে বলে মনে হবে - ত, যিনি ভ্রমণ করছেন তার ঘড়িতে ব্যয়িত সময়ের থেকে আলাদা হবে। এটা হেঁয়ালী ঠেকলেও আপেক্ষিকতা তত্ত্ব তাই বলে। সুতরাং দ্রুতগতিবেগ অর্জন করা এবং এর প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তিগত সমস্যা যতই দুরূহ বলে মনে হোক - ভ্রমণটা যে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটতে পারে সেটা বোঝা তত দুরূহ নয় - বিশেষ করে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব জানবার পর।

... পরিশেষে বলা চলে যে, জগৎসমূহের পরিচালক আল্লাহ যে কোন সময়ে যে কোন ঘটনা ঘটাতে পারেন। তার নিজের কথাতেই, তিনি যখন কোন কিছু ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন 'হও' এবং তা হয়ে যায়। এখন এই ধরনের ঘটনা আমাদের দৃশ্যজগতের প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর নিয়মে ঘটে থাকে না-কি এমন নিয়মে যা আল্লাহই জানেন, কিন্তু আমরা জানতে পারি না। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার মত অবস্থায় আমরা আসিনি। আমরা বিজ্ঞানে এ পর্যন্ত যা জেনেছি, তা দিয়ে মি'রাজের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে এখনও অসমর্থ। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞানের আরো বিকাশ ঘটরে, মি'রাজের উপর হয়ত ভবিষ্যতে আরো আলোকপাত করা সম্ভব হবে।[১১০]

আবদুল কাদির আল-হাসান *নবীজী (সা)-এর মি'রাজ* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন :

হযরত শাদ্দাদ বিন আউস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, দমহানবী মুহাম্মদ (সা) ইরশাদ করেন, আমি যখন পথিমধ্যে অধিক খেজুর গাছসম্বলিত জায়গা অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম, তখন জিবরাঈল (আ) আমাকে বললেন, এখানে অবতরণকরত নফল নামায আদায় করুন। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি কি জানেন, কোথায় আপনি নামায আদায় করেছেন? আমি বললাম, না, আমার জানা নেই। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি ইয়াসরীবে (মদীনায়) নামায আদায় করেছেন। এখানে অদূর ভবিষ্যতে আপনি হিজরত করবেন। এরপর কিছুদূর অতিক্রম করে অন্য একটি ভূখণ্ডে উপনীত হলাম। তখন জিবরাঈল (আ) বললেন, এখানে নেমে নামায আদায় করুন। আমি নামলাম। নামায আদায় করলাম। জিবরাঈল (আ) জানালেন, আপনি সিনাই উপত্যকায় হযরত মূসা (আ)-এর গাছের কাছে নামায আদায় করেছেন। এই বরকতময় উপত্যকায়ই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলেছেন। তারপর আরো কিছুক্ষণ অতিক্রম করে অন্য একটি ভূখণ্ডে গিয়ে উপনীত হলাম। জিবরাঈল (আ) এবারও বললেন, এখানে নামুন। নামায আদায় করুন। আমি নামলাম নামায আদায় কররাম। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি এখন মাদায়েনে নামায আদায় করেছেন। এখানে হযরত শুয়াইব (আ) বসবাস করতেন। তারপর সেখান থেকে রওয়ানা দিয়ে আরেকটি ভূখণ্ডে পৌছলে জিবরাঈল (আ) বললেন, এখানেও নেমে নামায আদায় করুন। পরে আমি এখানেও নেমে

---

১১০. ড. এম. শমশের আলী, 'মিরাজুন্নবী (সা.)', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ১২২-১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

নামায আদায় করলাম। জিবরাঈল (আ) বললেন, এটা 'বায়তুল লাহম', এখানেই হযরত ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন।[১১১]

মি'রাজ বিষয়ক ক'টি প্রবন্ধ হল : মিরাজুন্নবী (সা)[১১২], মহানবী (সা)-এর মি'রাজ ও বিজ্ঞান, শবে মি'রাজ[১১৩], মে'রাজ ও বর্তমান বিজ্ঞান[১১৪], লাইলাতুল মি'রাজ : একটি সমীক্ষা[১১৫], মি'রাজ[১১৬], ইসরা ও মি'রাজ[১১৭], মি'রাজ, দৈহিক আত্মিক না স্বপ্ন[১১৮], মি'রাজের ১৪ দফা কর্মসূচী[১১৯] এবং মে'রাজুন্নবী (সা)[১২০]। মহানবী (সা)-এর মিরাজের তাৎপর্য[১২১], আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মি'রাজ[১২২], মি'রাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা[১২৩]।

---

১১১. আবদুল কাদির আল-হাসান, 'নবীজী (সা)-এর মি'রাজ', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩১ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৭০-৭৭।

১১২. ড. এম. শমসের আলী, 'সীরাতুন্নবী (সা)', সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি, পৃ ৪৩-৪৫।

১১৩. ড. সিরাজুল হক, 'শবে মি'রাজ', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ১৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃ ১৬৩-১৬৯।

১১৪. আবদুল ওয়াহাব, 'মি'রাজ ও বর্তমান বিজ্ঞান', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৮ম বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন ১৯৭০, পৃ ৩৫০-৩৭১।

১১৫. ড. এম. এস. এ. ইবরাহিমী, 'লাইলাতুল মি'রাজ : একটি সমীক্ষা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ২১ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮১, পৃ ৩১-৩৭।

১১৬. অধ্যাপক সাইয়েদ আবদুল হাই, 'মি'রাজ', *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, ২২ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩, পৃ ২৫১-২৫৫।

১১৭. মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্‌দেহলভী, 'ইসরা ও মি'রাজ', মুহাম্মদ আবূ তাহের সিদ্দীকী অনূ., *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ২৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৫, পৃ ২১২-২৩০ এবং ২৪ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৮৫, পৃ ৩২১-৩৩২।

১১৮. আবুল কালাম মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, 'মি'রাজ, দৈহিক আত্মিক না স্বপ্ন', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ২৬ বর্ষ ৩য় বর্ষ, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৭, পৃ ৩২৯-৩৩৪ এবং ২৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৮৭, পৃ ৪২৭-৪৩০।

১১৯. মুহাম্মদ হাসান রহমতী, 'মি'রাজের ১৪ দফা কর্মসূচী', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৩৩ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৩, পৃ ১৭৩-১৮৫।

১২০. বেগম ফজিলাতুল কদর, 'মিরাজুন্নবী (সা)', সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২১ হি, জা সী ক বা, পৃ ১৮৯-১৯২।

১২১. টেক্স. ইঞ্জি. মো. আবদুল মোতালেব, 'মহানবী (সা)-এর মিরাজের তাৎপর্য', *মাসিক মদীনা*, ৪১ বর্ষ ১ম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৫, পৃ ১০৭-১১০।

১২২. অধ্যাপক দেওয়ান নূরুল হক, 'আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মি'রাজ', *মাসিক মদীনা*, ৪৬ বর্ষ ১১তম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ ২৪-২৫।

১২৩. মাওলানা মোঃ এমদাদুল হক, 'মি'রাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৩০-১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

পোশাকনীতি

সতর ঢাকা বা দৈহিক লজ্জাবরণ মানুষের স্বভাবজাত। এজন্যই তারা আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। মানুষ তো বটেই, পশু-পাখিসহ অন্য সকল প্রাণীর লজ্জাবরণের জন্য মহান রাব্বুল আলামীন প্রাকৃতিক নিয়মেই ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এক্ষেত্রে তিনি সাধারণত রং-বেরংয়ের পশম ও পালক ব্যবহার করেছেন। যা আমরা চারদিকে তাকালেই প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। মানুষের স্বভাবজাত এই লজ্জাবরণের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজনে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) আমাদের জীবনের প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি বিষয়ের সাথে নীতিনির্ধারণীসহ আমাদের জন্য একটি পোশাকনীতিও প্রদান করেছেন। যা গ্রহণ করা আমাদের প্রত্যেকেরই অপরিহার্য কর্তব্য। আর-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, 'রাসূল তোমাদের জন্য যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।' (৪৯ : ৭) রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের জন্য যে পোশাকনীতি প্রদান করেছেন।[১২৪] মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন *খান মহানবী (সা)-এর পোশাকনীতি* প্রবন্ধে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> পোশাকের আকৃতিগত মৌলনীতি হচ্ছে, ভৌগোলিক দিক থেকে স্থানীয়ভাবে নির্ধারিত এ স্বীকৃত পুরুষের পোশাক মহিলারা এবং মহিলাদের পোশাক পুরুষেরা পরিধান করতে পারবে না। পোশাক এত আঁটসাঁট হতে পারবে না যাতে পরিধানকারী রুষ মহিলাদের শারীরিক ও অংগ-প্রত্যঙ্গীয় গঠন কাঠামো ফুটে ওঠে এবং দৃষ্টিকটু হওয়ার কারণে সুশীল সমাজের নিকট সে ঘৃণার পাত্র হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি অধিক প্রযোজ্য। সুতরাং প্রত্যেক নর-নারীর রুচিসম্মত কিঞ্চিৎ ঢিলা-ঢালা পোশাক পরা বাঞ্ছনীয়। মহিলারা তাদের পরিধেয় বস্ত্রের উপর পৃথক চাদর পরে প্রয়োজনে বাইরে বেরুবে যাতে তাদের পোশাকের সৌন্দর্য বাইরে প্রকাশ না পায়। মসজিদে বা অন্য স্থানে নামায আদায়কালে অধিকতর ভাল পোশাক পরিধান করতে হবে। আল কুরআনে এ পোশাককে 'লিবাসুত্তাকওয়া বা তাকাওয়ার পোশাক' বলা হয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের উচিত নবী করীম (সা)-এর পোশাকনীতির আলোকে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে এ ক্ষেত্রে ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুন সমুন্নত রাখা।

পোশাক সভ্যতার মাপকাঠি। সুশৃঙ্খল ও সভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় শালীন পোশাকের বিকল্প নেই। এ জন্য রাসূল (সা) মানুষের জন্য একটি ড্রেস কোড প্রবর্তন করেছেন। যুগে যুগে যার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। এখানে রাসূল (সা)-এর পোশাকনীতি সম্পর্কে আরো কয়েকটি প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা হলো : মহানবী (সা.) এর পোশাক-পরিচ্ছদ[১২৫], হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর পোশাক-পরিচ্ছদ ও খানা-পিনা[১২৬], মহানবী (সা)-এর পোশাকনীতি।

---

১২৪. মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান, 'মহানবী (সা)-এর পোশাকনীতি', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৯৩-৯৯।

১২৫. মুহাম্মদ যাকারিয়া, 'মহানবী (সা.) এর পোশাক-পরিচ্ছদ', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ২১৭-২১৯।

১২৬. আবদুল জলীল, 'হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর পোশাক-পরিচ্ছদ ও খানা-পিনা', *ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) স্মরণিকা ১৪২০ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ১৯৯৯, পৃ ৯৯-১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেষ্ঠত্ব

রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বকালের সর্বযুগের সেরা ব্যক্তিত্ব। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রাবন্ধিকদের ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্যণীয়। এ বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ রয়েছে। এখানে অল্প ক'টি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। *জগতের আদর্শ মহামানব* প্রবন্ধে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> জগতে অনেক মহামানব আবির্ভূত হয়েছেন। তাদের কৃতিত্ব এক এক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কেউ ধর্মে, কেউ যুদ্ধে, কেউ বাগ্মিতায়, কেউ সাহিত্যে, কেউ রাজনীতিতে মহত্ত লাভ করেছেন। কিন্তু মহত্তের সর্বক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করেছেন কেবল একজন। তিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা)।[১২৭]

ইনসানে কামিল বিষয়ে লিখতে গিয়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেছেন :

> আল্লাহ্ ছিলেন অব্যক্ত। তাঁর ব্যক্ত হওয়ার ইচ্ছার ফলেই সৃষ্টি হলো নূর-ই-মুহম্মদী বা দর্শনের ভাষায় তার লোগোস এবং তার জন্যই সৃষ্টি হলেন হযরত মুহম্মদ (সা)। এজন্যই তিনি পরিপূর্ণ মানুষ বা ইনসান-ই-কামিল। তিনি নিশ্চয়ই এ দুনিয়ার বহমতস্বরূপ। কেননা তাঁর নূর-সৃষ্টি না হলে এ দুনিয়ার সৃষ্টি হত না।
>
> প্রকৃতপক্ষে হযরত রসূল-ই-আকরাম (সা) সম্বন্ধে কুরআন-উল-করীমে এতসব বর্ণনা রয়েছে যে তাঁকে একদিকে যেমন এ দুনিয়ার তথা বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টির আদি কারণ বলা যায়, তেমনি ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন পূর্ণ-মানবও বলা যায়। জীবনকে স্থান মনে করে যারা আল্লাহর অস্তিত্বে লীন হওয়াকে জীবনের চরম পরিণতি বলে মনে করেন এবং সমাজ জীবনে ধ্বংস ডেকে আনেন, প্রকৃত সুফিগণের জীবনে তা প্রকাশ পায় না। তারা আল্লাহ্র সঙ্গে একীভূত হয়ে তাদের সত্ত্বা হারাতে চা না; বরং তার অস্তিত্বের মধ্যে স্বকীয় সত্ত্বার পূর্ণ বিকাশ লাভ করেন। তারাই হচ্ছেন পূর্ণমানব বা ইনসান-ই-কামিল। তবে এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, এ দুনিয়ার মধ্যে কোন মানুষই পূর্ণ মানুষ হতে পারে না। কেবলমাত্র আল্লাহর রসূলই সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। একজন তার আদর্শের অনুসরণ করে অবিরাম প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে সফল হওয়াই হচ্ছে ইনসান-ই-কামিলের জীবনের চরমতম লক্ষ্য।[১২৮]

রাসূলুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মুহাম্মদ আবু তালিব বলেছেন :

> কুরআনে রসূলুল্লাহকে মানুষের মধ্যে নয়, শুধু-নবীদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। মি. হার্ট আজ তাঁকে সকল কালের, সকল মানুষের মধ্যেই শ্রেষ্ঠতম বলে স্বীকৃতি দিয়ে কুরআনের বাণীরই সত্যতা স্বীকার করলেন মাত্র। খ্রীষ্টীয় পনেরো শতকের ফারসী কবি মোল্লা আব্দুর রহমান জামীও বলেছেন :
>
> বাদ আজ খুদায়ে বোজর্গ তুয়ী, কিস্সায়ে মুক্তাসার।

---

১২৭. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'জগতের আদর্শ মহামানব', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হিজরী সংখ্যা, পৃ ৬।

১২৮ মোহাম্মদ আজরফ, 'হযরত রসূল-ই-আকরাম ও ইনসান-ই-কামিল', সীরাতুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪০৭ হি, পৃ ১০-১২।

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষেপে বলতে গেলে খুদাতায়ালার পরেই তোমার স্থান। মি. হার্ট এখানে তারই প্রতিধ্বনি প্রকাশ করলেন।[১২৯]

মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম *সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম* প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এভাবেই তুলে ধরেছেন :

> যিনি সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী, যিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য শ্রেষ্ঠতম পথপ্রদর্শক, যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা রব্বুল 'আলামীনের প্রিয়তম রসূল, পেয়ারা হাবীব, বিশ্ব-সভ্যতায় যাঁর অবদান সর্বাধিক, যিনি সমগ্র বিশ্ব মানবের কল্যাণের জন্য প্রেরিত, যাঁর আগমনের অপেক্ষা করেছেন লক্ষাধিক আম্বিয়ায়ে কেরাম যুগ যুগ ধরে, যিনি শুধু নবী বা রসূল নন, বরং তাঁদের দলপতি-সাইয়েদুল মুরসালীন, খাতেমুন নবিয়ীন, যিনি শুধু মহামানব নন, বরং সর্ব কালের সর্ব শ্রেষ্ঠ মহামানব, যাঁর দীদার লাভ না হলে ব্যাকুল হতেন ফেরেশতাদের দলপতি হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম, যাঁর দরবারে জিবরাঈল আলায়হিস সালামকে ২৩ বছরে ২৪ হাজার বার হাজির হতে হয়েছে, যিনি আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করেছেন শবে মিরাজে।
>
> যিনি সর্ব প্রথম মহাশূন্য পরিভ্রমণ করেছেন, সারা বিশ্বে আজ প্রায় দেড় শত কোটি মানুষ যাঁর অনুসারী, যাঁর আদর্শ মহান, বিশ্বজনীন, অতুলনীয়, অদ্বিতীয়, চিরস্মরণীয়, চিরসংরক্ষিত, চিরপ্রশংসিত, তিনিই সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। মিরাজের সফরে সকল নবীর ইমাম হওয়া এবং বিশেষ নৈকট্য ও মহব্বত লাভ করা তাঁর সর্বোচ্চমর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।
>
> কুরআন মজীদের অনেক আয়াত তাঁর মর্যাদা ঘোষণা করেছে, তার কয়েকটি উদাহরণ প্রদান করা যেতে পারে। যেমন তাঁর সাক্ষ্যের দ্বারাই সমস্ত নবী রেহাই পাবেন, মানুষের ঈমান না আনার জন্য তাঁকে জবাবদিহি না করা, সকল আম্বিয়া কেরামের নিকট থেকে তাঁর প্রতি ঈমান রাখার এবং তাঁকে সাহায্য করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা, আল্লাহ পাকের এই ওয়াদা করা যে, আল্লাহ পাক তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন, তাঁর বক্ষ মুবারক বিদীর্ণ করা, তাঁর নাম সর্বোচ্চ হারে প্রচারের ব্যবস্থা করা, তাঁর উম্মতকে উত্তম উম্মত হিসাবে ঘোষণা করা, আগের শরীয়তসমূহকে তাঁর শরীয়ত এসে বাতিল করে দিয়েছে বলে ঘোষণা করা, তাঁকে কাওসার প্রদান, তাঁর কাজকে আল্লাহ পাকের নিজের কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করা। যেমন : 'যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে, তখন আসলে তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছিলেন।' (সূরা আনফাল : আয়াত ১৭)
>
> আবার আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নির্দোষ হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন : 'তিনি নিজের ইচ্ছায় কোন কথা বলেন না।' (সূরা নাজম : আয়াত ৩) এমনিভাবে কুরআন মজীদে তাঁর ফযিলত বর্ণনায় ভরপুর হয়ে রয়েছে। আল্লামা বাগাভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন যে, অন্যান্য নবীকে যতো মুজিযা দেওয়া হয়েছে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সেই সমস্ত মুজিযা এবং তার অতিরিক্ত অনেক মুজিযা প্রদান করা হয়েছে। যেমন চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া, তাঁর বিরহে মসজিদগৃহের খুঁটির এবং খেজুর- বৃক্ষের ক্রন্দন করা, তাঁকে সালাম করা, চতুস্পদ জন্তুর তাঁর সাথে কথা বলা এবং

---

১২৯. মুহম্মদ আবূ তালিব, 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানব : হযরত মুহম্মদ (সা)', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪০৭ হি*, পৃ ১৩-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

> তাঁর রসূল হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া, তাঁর অঙ্গুলি মুবারকের মাঝখান দিয়ে ঝর্ণার ন্যায় পানি প্রবাহিত হওয়া এবং এমনি অসংখ্য মুজিযা রয়ে গেছে যেগুলোর মধ্যে একটি হলো কুরআন মজীদ। আসমান এবং যমীনে এমন কেউ নেই যে, কুরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করতে পারে।[১৩০]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক আরো কয়েকটি প্রবন্ধ হচ্ছে : মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব[১৩১], হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার শ্রেষ্ঠত্ব[১৩২], সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম[১৩৩], মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ মহানবী (সা)[১৩৪], মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা)[১৩৫], সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল[১৩৬] এবং মানবজাতির ওপর প্রবল পরাক্রমশালী প্রভাবক হিসেবে মহানবী (সা)[১৩৭], মর্যাদা ও গৌরবের উৎস মহানবী (সা.)[১৩৮], মহানবীর বিশ্বজনীনতা[১৩৯], শ্রেষ্ঠনবী[১৪০], প্রিয় নবী (সা)-র জীবনের বৈশিষ্ট্য[১৪১], সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম[১৪২], মহানবী (সা)-এর সত্যবাদিতা ও আমানতদারি[১৪৩]।

---

১৩০. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৪ হি*, পৃ ১৯-৩২।

১৩১. ড. আবদুল হক, 'মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব', ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৩ হি, ঢাকা : ই ফা বা, মে ২০০২, পৃ ১১৯-১২১।

১৩২. মোবিনুদ্দীন আহমদ জাহাগীর নগরী, 'হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার শ্রেষ্ঠত্ব', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২১ হি*, জা সী ক বা, ঢাকা, জুন ২০০০, পৃ ১৪-১৭।

১৩৩. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৪ হি*, পৃ ১৯-৩২।

১৩৪. মুহম্মদ মতিউর রহমান, 'মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ মহানবী (সা)', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৪৭-১৬৫।

১৩৫. গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, 'মহামানব হযরত মুহম্মদ (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৩১-১৪৭।

১৩৬. মুহাম্মদ সিরাজুল হক, 'সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৮৭-১৯৩।

১৩৭. ড. আবদুল্লাহ্, 'মানবজাতির ওপর প্রবল পরাক্রমশালী প্রভাবক হিসেবে মহানবী (সা)', *মিলাদুন্নবী স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, পৃ ১৪১-১৪৮।

১৩৮. আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল, 'মর্যাদা ও গৌরবের উৎস মহানবী (সা.)', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ২৯-৩৩।

১৩৯. সৈয়দ সোলায়মান নদভী, আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত, 'মহানবীর বিশ্বজনীনতা', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ৪১-৫০।

১৪০. শেখ আবদুর রহিম, 'শ্রেষ্ঠনবী', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২১হি/২০০০, পৃ ৯-১৩।

১৪১. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'প্রিয় নবী (সা)-র জীবনের বৈশিষ্ট্য', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ১৬-২৩।

১৪২. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৩, পৃ ১৯-৩২।

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ

মানব জাতির চরম দুর্দিনেই শুভাগমন হয়েছিল বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলামীন হযরত রসূলে করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। তাঁর প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছিল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন। মাত্র তেইশ বছরের স্বল্প সময়ে পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টে গেল। ভৌগোলিক সীমারেখায় এক অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিল। যাঁরা ছিলো জুলুম-অত্যাচারে অভ্যস্ত, তারা শুধু যে সুবিচারের আদর্শ গ্রহণ করলেন তাই নয়; বরং সারা বিশ্বের এক বিরাট অংশে তাঁরা এই মহান আদর্শের বাস্তবায়ন করলেন। এটি নিঃসন্দেহে মানব জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব। এই বিপবের মহানায়ক হলেন স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সালালাহু আলাইহে ওয়াসালাম, আর এ বিপ্লবের সংবিধান হলো পবিত্র কোরআন।

প্রিয়নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুহাজেরগণের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আনসার এবং মুহাজেরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের কথা ঘোষণা করলেন। একজন আনসার এবং একজন মুহাজেরকে একত্রি করে বললেন, তোমরা পরস্পর ভাই ভাই। প্রিয়নবী সালালাহু আলাইহে ওয়াসালামের পবিত্র জবান মোবারক থেকে ঘোষিত, এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন এমন সুদৃঢ় হলো যে, দু'সহদোর ভাইয়ের মধ্যেও তা ছিল দুর্লভ। হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সালালাহু আলাইহে ওয়াসালাম আনসার ও মুহাজেরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের কথা ঘোষণা করলেন। তাঁর এ ঘোষণায় সাহাবায়ে কেরামের দু'দল-মুহাজের ও আনসারগণের মধ্যে এক অপূর্ব ভ্রাতৃত্ব ভাব সৃষ্টি হলো। এ ঘোষণার পর আনসারী সাহাবীগণ তাঁদের মুহাজের ভাইদেরকে নিজ নিজ বাসস্থানে নিয়ে যান এবং বাড়ী-ঘর, দোকান-পাট সব কিছুর অর্ধেক মালিকানা মুহাজের ভাইকে দিয়ে দেন। এ কথা সন্দেহাতীত রূপে বলা যায় যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কর্মসূচীর কোন নজির নেই, যা প্রিয়নবী সালালাহু আলাইহে ওয়াসালাম মদীনায়ে তৈয়্যেবার জীবনের শুরুতে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রিয়নবী সালালাহু আলাইহে ওয়াসালাম আনসার ও মুজাজেরগণের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের সূত্রপাত করলেন, তাতে শুধু যে বিপদগ্রস্ত মুহাজেরগণের পুনঃর্বাসন সম্ভব হলো তাই নয়; বরং পাশাপাশি মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতিও সুনিশ্চিত হলো এবং আরবে যুগ যুগ ধরে যে গোত্রভিত্তিক কলহ-দ্বন্দ্ব চলছিল, তারও অবসান ঘটলো। এভাবে হযরত রসূলে করীম সালালাহু আলাইহে ওয়াসালামের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার বাস্তব প্রমাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। সমকালীন বিশ্বে নৈতিকতাহীন বস্তুবাদী সভ্যতার ব্যর্থতায় দিশেহারা মানুষের নিকট প্রিয়নবী সালালাহু আলাইহে ওয়াসালামের মহান আদর্শের অপরিহার্যতা যে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে, তা সন্দেহাতীতরূপেই বলা চলে। সমকালীন বিশ্ব প্রেক্ষাপটেও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শের অপরিহার্যতা প্রবন্ধে বিষয়টি মওলানা মোহাম্মদ

---

১৪৩. মুফতী মাসুম বিল্লাহ, 'মহানবী (সা)-এর সত্যবাদিতা ও আমানতদারি', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৪৭-১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

মমিনুল ইসলাম খুবই বিজ্ঞতার সাথে উপস্থাপন করেছেন।[১৪৪] এখানে রাসূল (সা)-এর আদর্শ বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের পর্যালোচনা করা হলো।

প্রফেসর ড. আবু বকর সিদ্দিক *রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুপম আদর্শের বৈশিষ্ট্য* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন : ... ইসলামী রাষ্ট্রের অধিপতি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন তাঁর প্রিয়তম কন্যা ফাতিমাতুজ জাহরার গৃহে গিয়ে শুনলেন, কন্যা অন্নাভাবে তিন দিন উপবাসে কষ্ট পাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ধীরচিত্তে সান্ত্বনা প্রসঙ্গে কন্যাকে বললেন, "মা, দুঃখিত হয়ো না, ধৈর্য ধারণ কর, তোমার পিতাও আজ চারদিন অনাহারে আছেন।" ফলত ঐহিক আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আত্মসুখ লাভ কখনোও তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল না। ধরাধামে অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠা, পাপ নিমজ্জিত জগতের উদ্ধার সাধন, মানব সমাজে তাওহীদের প্রতিষ্ঠা, সমতা ও ভ্রাতৃভাব বিস্তার এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান-দ্বার উদঘাটন তাঁর জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অভিনব মুসলিম সাম্রাজ্য তাঁর প্রবর্তিত দীন ইসলামের গৌণফল মাত্র। পার্থিব সুখ-সম্পদ, ধনৈশ্বর্য, মান-মর্যাদা তিনি অতি হেয় জ্ঞান করতেন। প্রলোভন এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশ্বজনীন শান্তির ভিত্তি স্থাপন করেছেন। কেমন করে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে, এক পরিবার অন্য পরিবারের সাথে ও এক জাতি অন্য জাতির সঙ্গে শান্তিতে বাস করতে পারে এবং কেমন করে জগতের পরস্পর বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হতে পারে, তার বিশদ পন্থা নির্দেশ করে গেছেন। জগতের অন্য কোন নবী এই দুরূহ কার্যে অগ্রসর হননি। জগতের সকল নবীতে বিশ্বাস স্থপন ও সকলকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন তিনি ধর্মের অঙ্গীভূত করে জগতের পরস্পর-বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন ও মিলনপথ সুপ্রশস্ত করে গেছেন। এক কথায় তিনি একদিকে মহান আল্লাহর একত্ব ও মহিমা ঘোষণা করেছেন, অন্যদিকে সেই মহান আল্লাহর সৃষ্ট সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে মহামিলন সাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন এবং সাফল্য লাভও করেছেন।[১৪৫]

প্রফেসর ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন *ঈদে মিলাদুন্নবী ও মহানবী (সা)-এর পরিপূর্ণ আদর্শ* প্রবন্ধে বলেন : মহানবীর (সা) আদেশ ছিল 'ঘরে বাইরে, মসজিদে ও যুদ্ধক্ষেত্রে, শয়নে ও জাগরণে সকল অবস্থায় আমার যা কিছু দেখ, সব মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করে দাও।' তাই তো তাঁর প্রিয় সহচরগণ তাঁর জীবনের সব বিষয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জগতের সামনে রেখেছেন। তাঁর পূণ্যবতী সহধর্মিণীগণও তাঁর নিভৃত জীবনের সব কিছুই অকুণ্ঠচিত্তে বর্ণনা করেছেন। মহানবী (সা) নির্মিত মসজিদের সংশ্লিষ্ট একটি চত্বরে সুফফায় হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও অন্য তাপসবৃন্দ বাস করতেন যাঁরা সত্য সাধনায় নিজেদের

---

১৪৪ মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'সমকালীন বিশ্ব-প্রেক্ষাপট ও হযরত রাসূলে করীম (দ:)-এর আদর্শের অপরিহার্যতা', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) স্মরণিকা ১৪২২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ১৭-২২।

১৪৫. প্রফেসর আবু বকর সিদ্দীক, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুপম আদর্শের বৈশিষ্ট্য', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৭-২২।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা বছরের পর বছর ধরে মহানবীর (স) অমিয় বাণী একাগ্রতার সঙ্গে শুনেছেন এবং অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।[১৪৬]

আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন *দয়াল নবী, দয়াল সাগর* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন : শিশু যখন ছিলেন তখনই অন্যের প্রতি তাঁর দয়ার প্রকাশ ঘটে। তিনি যখন একেবারে শিশু তখন তিনি দুধ মাতার একটি স্তনের দুধ খেতেন এবং অন্য স্তনটি দুধ মাতার সন্তানের জন্য রেখে দিতেন।

তিনি অতি শৈশবেই মানুষের প্রতি দয়াশীল ছিলেন। দাদার ইনতিকালের পর তিনি চাচা আবু তালিবের পরিবারে বাস করতেন। আবু তালিব ছিলেন আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল, নবী করীম (সা) ছোট হওয়া সত্ত্বেও চাচার আর্থিক অভাব অনটনের বিষয়টি উপলব্ধি করেন। তিনি ধনীদের মেষ বকরী শহরের বাইরে নিয়ে চরানোর কাজে বহাল হন। এতে যা কিছু তাঁর উপার্জন হতো তিনি তা তাঁর চাচার হাতে তুলে দিতেন।

তাঁর যখন ১৪ বা ২০ বছর বয়স তখন কুরাইশ ও অন্যান্য কিছু কবীলা এবং কায়স কবীলার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ যুদ্ধে এভাবে জড়িত ছিলেন যে, তিনি তাঁর মুরুব্বীদের তীর সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষ হলে তিনি তাঁর সমবয়স্ক আরো কতক যুবককে নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল' নামে একটি সংঘ গঠন করেন যার উদ্দেশ্য ছিল পরস্পরের যুদ্ধ বিগ্রহ ও কলহ উৎখাত করা। তাঁর এ কাজটি নিঃসন্দেহে তাঁর মানব প্রীতি ও দয়ার প্রকাশ।[১৪৭]

অধ্যাপক আবদুল গফুর *বিশ্বনবী (সা)-এর আদর্শ এবং আজকের মুসলিম বিশ্ব* প্রবন্ধে লিখেছেন : ইসলামের আদর্শ তথা ঈমান থেকে বিচ্যুতি পার্থিব ভোগলালসার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান পশ্চাৎপদতা মুসলিম উম্মাহর বর্তমান দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ। পৃথিবীর বহু মুসলিম দেশই অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানে পশ্চাৎপদ থাকার দরুন নিজেদের সে সম্পদ আহরণের ক্ষমতা তার নেই। এ কাজে পাশ্চাত্য বা অন্যান্য অমুসলিম দেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার কারণে এ সব ধনী দেশেরও নিজেদের সম্পদের উপর নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। একদিকে আদর্শিক বিচ্যুতি, অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পশ্চাৎপদতা মুসলিম বিশ্বকে আজ তার এই হীন অবস্থার মুখে নিক্ষেপ করেছে। এই সত্য আমরা যতশীঘ্র বুঝি ততই মঙ্গল।[১৪৮]

সৈয়দ আলী আহসান তাঁর প্রবন্ধ *রাসূলুল্লাহর (সা)-এর আদর্শ সৌন্দর্য, সুরুচি ও পরিমিতিবোধ* সম্পর্কে বলেন : আমরা সংস্কৃতিবান মানুষ বলতে তাঁকেই বুঝি যিনি সত্যবাদী, পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ, বিনয়ী এবং কল্যাণব্রতের অধিকারী। একজন সংস্কৃতিবান পুরুষ কখনও অপসংস্কৃতির দ্বারা আক্রান্ত

---

১৪৬. প্রফেসর ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন, 'ঈদে মিলাদুন্নবী ও মহানবী (সা)-এর পরিপূর্ণ আদর্শ', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ২৫-২৬।

১৪৭. আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, 'দয়াল নবী, দয়াল সাগর', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৩-১৫।

১৪৮. অধ্যাপক আবদুল গফুর, 'বিশ্বনবী (সা.)-এর আদর্শ এবং আজকের মুসলিম বিশ্ব', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ১৪৫-১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

হবেন না। সত্যপথ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কখনও দ্বিধাগ্রস্ত থাকবেন না এবং মানুষের কল্যাণের জন্য সর্বদা সচেতন থাকবেন। তিনিই যথার্থ সংস্কৃতিবান পুরুষ যিনি জীর্ণতাকে দূর করবেন এবং যিনি মানুষের মধ্যে সৎকর্মের জন্য চৈতন্য আনবেন। কোন প্রকার অহমিকা এবং ঔদ্ধত্য তার জীবন সাধনায় থাকবে না। ঔদ্ধত্য অসম্মাননা আনে এবং জীবনের যাত্রাপথে বিশ্বাসকে বিনষ্ট করে। আমরা যখন মহামানব মহানবী (সা) সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই তখন যথার্থ সংস্কৃতিবান মানুষের সমস্ত গুণ তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করি।

কোন প্রকার নিরর্থক এবং উদ্দেশ্যহীন কাজে মহানবী কখনই অংশগ্রহণ করেন নি। খৃষ্টান পণ্ডিতগণও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, মহানবীর চালচলন, রীতি-নীতি এবং পবিত্র স্বভাব মক্কাবাসীর জন্য দুর্লভ ছিল। তিনি বৈষয়িক বহুবধি কর্মে জড়িত ছিলেন এটা সত্য এবং ব্যবসা উপলক্ষে তাঁকে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ভ্রমণ করতে হত, কিন্তু তিনি কখনও পরিপূর্ণভাবে বৈষয়িক কর্মে জড়িয়ে পড়েন নি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য যার কারণে পার্থিব আকর্ষণ তাঁকে কখনও পথভ্রষ্ট করতে পারেনি।

তিনি পরিচ্ছন্ন পুরুষ ছিলেন এবং তাঁর পরিচ্ছন্নতা তাঁর সকল কর্মে প্রকাশ পেত। তিনি একবার বলেছিলেন, মানুষের জীবনে প্রতিটি কর্মের জন্য সময় থাকে। সর্ব সময় একই কর্মে মানুষ নিযুক্ত থাকবে এটা ঠিক নয়। ইবাদতের জন্য সময় নির্ধারিত আছে, খাদ্য গ্রহণের সময় নির্ধারিত আছে, বিশ্রামের জন্য সময় নির্বাচিত করে নিতে হয়, নিদ্রার জন্যও সময় আছে। সর্ব সময় যে ইবাদতে মগ্ন থাকে সেও যেমন পরিপূর্ণতা পায় না, তেমনি সর্ব সময়ে যে সাংসারিক কর্মে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রাখে সেও পরিপূর্ণতা পায় না।

দৈনন্দিন জীবনে মদীনা শরীফে অবস্থানকালে তিনি পদব্রজে হাঁটতেন, পথে মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত হলে তাদের কুশল জিজ্ঞেস করতেন। শিশুদের কাছে পেলে তাদের নিয়ে আনন্দ করতেন। একবার তিনি যখন হাঁটছেন তখন সামনে দেখলেন যে, একদল বালিকা সম্মিলিতভাবে গান গাইছে। তিনি খুশি মনে তাদের কাছে গেলেন। তারা তাঁকে ঘিরে বেষ্টনী রচনা করে নতুন একটি গান গাইতে লাগলো। গানের বাণীতে ছিল "আলাহ তা'আলাকে অশেষ ধন্যবাদ, তিনি আমাদের মধ্যে এমন একজন পয়গম্বর দিয়েছেন যিনি ভবিষ্যত বলতে পারেন। রাসূল (সাঃ) তাদেরকে এ গানটি গাইতে নিষেধ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন তারা পূর্বে কি গান গাইছিল। তারা উত্তরে বলল, তারা একটি ফুলের গান গাইছিল। তিনি তাদেরকে ফুলের গান গাইতে বলে হাসিমুখে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি ফুল পছন্দ করতেন এবং সুগন্ধি পছন্দ করতেন। তিনি একবার বলেছিলেন, 'তোমার কাছে যদি একটি পয়সা থাকে তাহলে তা দিয়ে খাবার কিনে খেয়ো, কিন্তু যদি দুটি পয়সা থাকে তাহলে একটি পয়সা খাবারের জন্য রেখে অন্য পয়সাটি দিয়ে ফুল কিনে নিও।' এ কথার মধ্যে রাসূলের বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক উদ্ভাসন ধরা পড়ে।[১৪৯]

---

১৪৯. সৈয়দ আলী আহসান, 'রাসূলুল্লাহর (সা)-এর আদর্শ সৌন্দর্য, সুরুচি ও পরিমিতিবোধ', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২১ হি/২০০০, পৃ ৫২-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর প্রবন্ধ *রাসূল (সা)-এর জীবনের বৈশিষ্ট-এ্য* উল্লেখ করেছেন এভাবে : আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জীবনের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শ্রেষ্ঠ রসূলের (সা.) মর্যাদা লাভ করলেও মানবজীবন থেকে পৃথক হয়ে যাননি। তিনি যথার্থই মানুষের নবী। কেননা মানুষের সঙ্গে বাস করেই মানুষকে তিনি আলাহর গুণে গুণান্বিত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। এ মাটির মানুষ যাতে আলাহর গুণে গুণান্বিত হয়ে এ দুনিয়াতে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। সম্মান লাভ করেছেন আবার নানাভাবে লাঞ্ছিতও হয়েছেন। তবু তাঁর নীতি থেকে তিনি এক তিলও বিচ্যুত হননি।

কুরআনুল করীম, হাদীসে কুদসী ও হাদীস শরীফ পাঠে জানা যায়-তাঁকে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা এ দুনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন পথ-নির্দেশকরূপে, কুরআনুল করীম নাযিল করেছিলেন নির্দেশিকারূপে এবং তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন- মানব সমাজকে তাঁর গুণে গুণান্বিত করে তোলার জন্য।

মানুষের জীবনে এ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হলে, মানুষকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করতে হবে এবং তার জন্য মানব-জীবন থেকে নানাবিধ পংকিল দিক উৎপাটিত করে তাতে তওহীদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রক্ত, বর্ণ, ভাষা প্রভৃতি ভেদের ফলে মানবজীবনে যে ভেদের সৃষ্টি হয়- তাকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করে তার স্থলে প্রেম, মৈত্রী ও ঐক্যের নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা হলেই ক্রমশঃ সাধনার ফলে তাতে দেখা দেবে আল্লাহর সে গুণাবলী এবং মানুষের এ মাটির দেহে দেখা দেবে ফেরেশতাদের চেয়েও উজ্জ্বল আলো।[১৫০]

মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার তাঁর প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) কথা বলার অনন্য সুন্নাহ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। মানুষের জীবনে এমন অনেক সময় আসে যখন সরব হওয়ার চাইতে নিরবতা এবং বলার চাইতে শোনা অনেক বেশি কল্যাণকর হয়ে থাকে। শরীয়াতের ভাষায় একটি কথা বা বাক্য কখনো 'রায়', কখনো বা নসিহত, শুরা (পরামর্শ), আবার কখনো কলেমায়ে তাইয়্যেবা। কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তের একটি কথা, এমনকি শয়তানী কুমন্ত্রণায় সচেতন কোন উচ্চারণও হয়ে দাঁড়ায় কলেমায়ে খবিছাহ। পরিস্থিতি অনুসারে, বিশেষতঃ যখন কথা বলা একেবারেই নিরর্থক তখন নিরবতা অবলম্বনের গুরুত্ব সম্পর্কে রসূল (সা)-এর সুন্নাহ অতীব শিক্ষণীয়।

'যদি কেউ আলাহ্ এবং শেষ বিচারের দিনে ঈমান রাখে তবে সে যেন কথা বলার সময় ভাল কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে।' (মুসলিম শরীফ) অবাঞ্ছিতভাবে কোন মজলিসে উপস্থিত হয়ে কথা বলা কিংবা যে বিষয়ে ব্যক্তির সম্পৃক্ততা নেই সে বিষয়ে কথা বলা বা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করাকে সুন্নাহ অনুসারে অশোভন বিবেচনা করা হয়।

---

১৫০. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, 'রাসূল (সা)-এর জীবনের বৈশিষ্ট্য', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৫ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

'মুসলমানদের জন্য এটাই শোভন যে তার সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন বিষয়ে সে চুপ থাকে।' (মিশকাত) পবিত্র কুরআনে ঈমানদারগণকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কথা বলতে উৎসাহিত করা হয়েছে। 'হে মু'মিনগণ আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।' (সূরা আল আহযাব : ৭০)

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে কথা বলার যোগ্যতা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে কথা বলার আদব কায়দাও শিখিয়ে দিয়েছেন রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে। তাঁর শেখানো নিয়মে কথা বলা হলে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি গড়ে উঠে, পরম শত্রুও হয়ে উঠে অন্তরঙ্গ বন্ধু, হযরত মুহাম্মদ (সা) হচ্ছেন বর্তমান বিশৃংখল সামাজিক অবস্থায় কথা বলা এবং না বলার উত্তম আদর্শ। তাই, সুসংবদ্ধ পরিবার ও সমাজ, সর্বোপরি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনে রাসূল (সা)-এর কথা বলা এবং না বলার নমুনা অনুসরণ আমাদের জন্য অপরিহার্য। এই আদর্শের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে সহ্যিতারের কল্যাণ।[১৫১]

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ সম্পর্কে বলেছেন : জগতে অনেক মহামানব আবির্ভূত হয়েছেন। তাদের কৃতিত্ব এক এক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কেউ ধর্মে, কেউ যুদ্ধে, কেউ বাগ্মিতায়, কেউ সাহিত্যে, কেউ রাজনীতিতে মহত্ত লাভ করেছেন। কিন্তু মহত্তের সর্বক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করেছেন কেবল একজন। তিনি মুহাম্মদ রাসূলুলাহ্ (সা)। এটা আমি ভক্তির উচ্ছ্বাসে বলছি না। একজন ফরাসী লেখক আলফ্রেড মে-লামার্টিন তাঁর তুর্কীর ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে বলেছেন- "দার্শনিক, বক্তা, ধর্ম-প্রচারক, যোদ্ধা, আইন-রচয়িতা, ভাবের বিজয়কর্তা, ধর্মমতের ও প্রতিমাবিহীন ধর্ম-পদ্ধতির সংস্থাপক, কুড়িটি পার্থিব রাজ্যের এবং একটি ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠিতা দেখ সেই মুহাম্মদকে (সা)। মানুষের মহত্তের যতগুলি মাপকাঠি আছে তা দিয়ে মাপলে, কোন লোক তাঁর চেয়ে মহৎ হতে পারে? আমরা এই জন্য তাঁকে বলি জাতি মুহামানব 'খায়রুল বাশার।'[১৫২]

মওলানা উবায়দুল হক *নবীয়ে রহমত ঃ মানবতার দিশারী* প্রবন্ধে বলেছেন :

> মানুষকে আল্লাহ তা'আলা আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ হিসাবে পয়দা করেছেন। আসমান যমীনে তাকে পরম মর্যাদার অধিকারী করেছেন এবং সর্বোত্তম আকৃতি-প্রকৃতি দান করেছেন। কিন্তু ঐ মানুষ যখন মানবতার গুণ হারিয়ে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করতে থাকে, ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আত্মস্বার্থের ও আত্মগর্বের বশবর্তী হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত করে দেন। সে মানুষের কাতার থেকে বের হয়ে জীব-জন্তু এবং পশুশ্রেণী বরং এর চেয়েও অধম হয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে মানুষকে রক্ষা এবং তার সৃষ্টিগত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমাজপতি ও মানবদরদীগণ সাধারণত ওয়ায-নসীহত ও উপদেশবাণী প্রচারের আশ্রয় নিয়ে থাকেন বা উন্নত ও অকৃত্রিম চরিত্র গঠন সম্বলিত বই-পুস্তক রচনা করে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষমতার অধিকারীগণ আইন-কানুন প্রণয়নের মাধ্যমে লোকদেরকে চরিত্রবান

---

১৫১. মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার, 'রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ : কথা বলার আদব', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) স্মরণিকা ১৪২০ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ১৯৯৯, পৃ ৭৮-৮০।

১৫২. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'জগতের আদর্শ মহামানব', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ৬-৮।

Dhaka University Institutional Repository

> হওয়ার জন্য বাধ্য করার প্রয়াস পান। কিন্তু নৈতিক অধঃপতন থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করার সর্বোত্তম পন্থা হলো তার সম্মুখে এমন কোন আদর্শবান ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী মনীষীর নিখুঁত নমুনা ও প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা-যার আকর্ষণে সে অনুযায়ী নিজের জীবন গড়ে তোলার প্রেরণা জাগে যে নমুনা থেকে সর্বকালের সর্বশ্রেণীর ও সর্বঅবস্থার শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। আজকের দিনে বিশ্ববাসীর কাছে জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও হিদায়েতের ঐ ধরনের নমুনা ও দৃষ্টান্তের অধিকারী হলেন একমাত্র নবীয়ে আরাবী মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।[১৫৩]

একমাত্র আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সার্বিক জীবনাদর্শ সংরক্ষিত এবং তাতে সকল শ্রেণীর মানুষের সর্ব প্রকার সমস্যার সমাধান বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এমন পবিত্র ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, এর আকর্ষণে অল্প সময়ের মধ্যে একটি ওয়াহ্‌শী, বর্বর, মূর্খ ও দুর্ধর্ষ আরবজাতি সভ্য, শিক্ষিত ও কল্যাণমুখী জাতিতে পরিণত হয়ে যায়। এই পরিবর্তন কোন শক্তি, ক্ষমতা বা অলৌকিক ঘটনার প্রভাবে নয়; বরং নবী আলায়হিস্ সালামের অতুলনীয় চরিত্র গুণের আকর্ষণে প্রভাবিত হয়ে, অন্তরের আবেগে একে একে সবাই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

এ প্রাসঙ্গিক উল্লেখযোগ্য কয়েটি প্রবন্ধ হচ্ছে : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন-ই চিরন্তন আদর্শ[১৫৪], অতিথি সেবার অনুপম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সা)[১৫৫], আজকের বিশ্ব ও মহানবী (সা.)-এর আদর্শ[১৫৬], মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ মহানবী (সা)[১৫৭], জগতের আদর্শ মহামানব[১৫৮], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্বদেশ প্রেম[১৫৯], হযরত মুহাম্মদ (সা), ইসলাম ও আমরা[১৬০], যুব-সমাজের আদর্শ হিসেবে মহানবী (সা)[১৬১], অনুপম আদর্শের প্রতীক হযরত মুহাম্মদ (সা)[১৬২], ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে মহানবী (সা.)-এর

---

১৫৩. মওলানা উবায়দুল হক, 'নবীয়ে রহমত : মানবতার দিশারী', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, ই ফা বা ১৯৯৬, পৃ ৪-৮।

১৫৪. সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, গোলাম সোবহান সিদ্দিকী অনূদিত, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন-ই চিরন্তন আদর্শ', *মাসিক মদীনা*, ৩৭ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, জুন ২০০১, পৃ ৪৪-৫৭।

১৫৫. মুফতী মুতীউর রহমান, 'অতিথি সেবার অনুপম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সা)', *মাসিক মদীনা*, ৩৮ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, জুন ২০০২, পৃ ৮৭-৮৯।

১৫৬. অধ্যাপক আবদুল গফুর, 'আজকের বিশ্ব ও মহানবী (সা.)-এর আদর্শ', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২০ হি/১৯৯৯, পৃ ২৭৩-২৭৫।

১৫৭. মুহম্মদ মতিউর রহমান, 'মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ মহানবী (সা)', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ১৪৭-১৬৫।

১৫৮. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'জগতের আদর্শ মহামানব', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ৬-৮।

১৫৯. অধ্যাপক মাওলানা আহমদ আবুল কালাম, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্বদেশ প্রেম', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ১৫৭-১৬৯।

১৬০. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, 'হযরত মুহাম্মদ (সা), ইসলাম ও আমরা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মীলাদুন্নবী (সা) ১৪২০, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৯, পৃ ২১-২৬।

১৬১. ড. এ. কে. এম ইয়াকুব হোসাইন, 'যুব-সমাজের আদর্শ হিসেবে মহানবী (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মীলাদুন্নবী (সা) ১৪২০, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৯, পৃ ৪৭-৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ[১৬৩], বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ হযরত রসূলে করীম (সা)[১৬৪], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ : কর্মে, আচরণে[১৬৫], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ : প্রেক্ষাপট যুগ সমস্যার সমাধান[১৬৬], মহানবী (সা)-এর আদর্শে জীবনঘনিষ্ঠতা[১৬৭], মহানবী (সা)-এর আদর্শের বিশ্বজনীনতা খ্রিষ্ট ধর্মালম্বীদের অপতৎপরতা[১৬৮], মহানবী (সা)-এর আদর্শ বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়[১৬৯], হযরত মুহাম্মদ (সা) এর তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্য[১৭০], সর্বোত্তম আদর্শের প্রতীক বিশ্বনবী (সা)[১৭১], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শে ক্ষমা, উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতা[১৭২], নৈতিক শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ[১৭৩], উন্নয়ন ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শ।[১৭৪]

মানবতা-উদারতা

---

১৬২. এ.বি.এম রবিউল ইসলাম, 'অনুপম আদর্শের প্রতীক হযরত মুহাম্মদ (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) ১৪২২, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ১৫১-১৫৭।

১৬৩. এ. জেড. এম শামসুল আলম, 'ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ১৫-২০।

১৬৪. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ হযরত রসূলে করীম (সা)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ১১-১৫।

১৬৫. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ : কর্মে, আচরণে', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) স্মরণিকা ১৪২২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ১৩৫-১৪০।

১৬৬. ড. আ. ছ. ম তরিকুল ইসলাম, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ : প্রেক্ষাপট যুগ সমস্যার সমাধান', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১০৫-১১১।

১৬৭. ড. আবদুল্লাহ আল মা'রুফ, 'মহানবী (সা)-এর আদর্শে জীবনঘনিষ্ঠতা', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১১০-১১৪।

১৬৮. এম. আবদুর রব, 'মহানবী (সা)-এর আদর্শের বিশ্বজনীনতা খ্রিষ্ট ধর্মালম্বীদের অপতৎপরতা', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৪৪-১৫২।

১৬৯. ড. আব্দুল্লাহ আল মা'রুফ, 'মহানবী (সা)-এর আদর্শ বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৫৯-১৬৩।

১৭০. মাওলানা আব্দুল গফুর হামিদী, 'হযরত মুহাম্মদ (সা) এর তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্য', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৩৪-৪৩।

১৭১. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, 'সর্বোত্তম আদর্শের প্রতীক বিশ্বনবী (সা)', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১২০-১২৪।

১৭২. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শে ক্ষমা, উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতা', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৫৪-১৫৮।

১৭৩. ড. শারমিন ইসলাম, 'নৈতিক শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৫৯-১৬৫।

১৭৪. অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের, 'উন্নয়ন ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শ', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃ ৩৪-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব ইতিহাসের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব মানবতার পরিপূর্ণ আদর্শ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মানবতার নবী, মানুষকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন, সকল অবস্থায় মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগী হতেন, মানুষকে আপন মনে করতেন, মানুষের সাথে এত আপনজনের মত মিলেমিশে চলতেন যে, ইতিহাসে তার নজীর বিরল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহান চরিত্র ও মহানুভবতার প্রশংসা শুধু তাঁর অনুসারিগণই নয় বরং অমুসলিম শত্রুগণও করতো। কুরআনুল কারীমে আছে, "অবশ্য আমি জানি যে, তারা যা বলে তা আপনাকে নিশ্চয়ই কষ্ট দেয়, কিন্তু তারা আপনাকে তো মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমালংঘনকারীরা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করে। নবুয়তের পূর্বে কুরাইশরা তাঁকে এ কারণেই "আল-আমীন" ও "আস-সাদিক" নামে অভিহিত করেছিল।

হযরত আবূ সুফিয়ানের নিকট তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বাইজান্টাইন সম্রাট নবী করীম (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, নবুয়তের পূর্বে কখনও তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন? আবূ সুফিয়ান উত্তর দিলেন, না। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি কখনও কাউকে প্রতারণা করেছেন, আবূ সুফিয়ান বললেন, না। কাবা শরীফ পুনঃ নির্মাণ করার সময় মক্কাবাসী যখন নেতৃত্বের প্রশ্নে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল তখন অকস্মাৎ তাঁকে দেখে কুরায়শরা বলে উঠল, "এই যে আল-আমীন। আমরা তাঁর মীমাংসাই মেনে নিব।" সর্বোপরি রাসূল (সা)-এর মহান চরিত্র ও মহানুভবতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হচ্ছে, যারা তার সাথে কিছু সময় অতিবাহিত করেছেন তারা সকলেই তাঁর সদাচারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল আকীদা-বিশ্বাস এবং আখলাক ও চারিত্রিক গুণাবলীর সংশোধন। রাষ্ট্রগঠন ও বিশ্ব বিজয় আদৌ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এই কারণে তাঁর পক্ষে দাঙ্গা-হাঙ্গামা অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহ করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। ফলে শান্তিপ্রিয় অমুসলিমদের সাথে মহানবীর কোন বিবাদ বাধে নাই। ইসলামের কেন্দ্র মদীনাতেই দীর্ঘকাল যাবৎ এ জাতীয় অমুসলিম, মুশরিকদের অবস্থিতি ছিল। হিজরতের অব্যবহিত পরেই মদীনা মনোয়ারার উত্তর-দক্ষিণে বসবাসকারী অমুসলিম গোত্র-গোষ্ঠীর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ সকল অমুসলিম জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) কোন দিন কোন চুক্তি ভংগের অভিযোগ করেন নাই, অপর পক্ষে তারাও কোন দিন সামান্যতম বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই। ধীরে ধীরে তারা একদিন ইসলাম কবুল করে। এমনকি কেউ কেউ মক্কা বিজয়ের পরে মুসলমান হয়েছিল।

একবার এক বেদুঈন মসজিদে নব্বীতে পেশাব করে দিলেন। সাহাবাগণ তাকে মারতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বাধা প্রদান করেন এবং লোকটিকে তার প্রয়োজন শেষ করবার অবকাশ দেন। অতঃপর তিনি সেই স্থান ধৌত করার নির্দেশ দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) লোকটিকে নম্রতার সাথে মসজিদের পবিত্রতা বুঝিয়ে দেন।

একবার নাজরানের একদল নাসারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মেহমান হিসেবে আগমন করে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে মসজিদে নববীতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। এমনকি তাদেরকে তাদের নিয়ম অনুযায়ী সেখানে উপাসনা করারও অনুমতি দিয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা, যে উহুদের যুদ্ধে মহানবীর চাচা হযরত হামযা (রা)-এর পবিত্র লাশকে তার পৈশাচিক প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার মাধ্যমে বানিয়েছিল, মক্কা বিজয়ের পরই একটি হাতুড়ি দ্বারা তার নিজের গৃহে রক্ষিত মূর্তিগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বলতে থাকে, তোমরা আমাকে দীর্ঘদিন ধরে ধোঁকায় ফেলে রেখেছ। আজ আর আমার বুঝতে বাকি নেই যে, তোমাদের শক্তি কতটুকু। এরপর মুখমণ্ডলের উপর ভারী পর্দা পরিধান করে অন্যান্য মহিলার সঙ্গে সঙ্গোপনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

ওয়াহশী ছিল হযরত হামযা (রা)-এর হত্যাকারী। তিনিও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকেও ক্ষমা করলেন। তবে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে শুধু এতটুকু বললেন, "ভাল হবে, আগামীতে তুমি আমার সম্মুখে আসবে না। যাতে হযরত হামযা (রা)-এর স্মৃতি স্মরণ হেতু আমাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত না হতে হয়।' এ ধরনের অনেক উদারতার বিষয় উঠে এসেছে অমুসলিমদের প্রতি মহানবী (সা)-এর মহানুভবতা প্রবন্ধে।[১৭৫]

মাওলানা শামছুল হুদা খান তাঁর এ প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ মহানবী (সা)-র মানবিক উদারতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বেশ কটি উজ্জ্বল উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন :

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্রের নাম আবদুল্লাহ। তিনি ছিলেন একজন পাক্কা ও সাচ্চা মুসলমান। বাপের সকল মুনাফিকীর অপকর্ম সম্পর্কে জেনে রাসূলুল্লাহর নির্দেশ কামনা করলেন যে তাঁর বাপের গর্দান নিজ হাতে কর্তন করে নিয়ে আসবেন। প্রিয়নবী বললেন, এটা কখনো হতে পারে না। কেননা সে তো বাহ্যত আমার সঙ্গে রয়েছে, এখন তার সঙ্গে নম্র ব্যবহার করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না।

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন - তিনি রাসূল (সা)-এর সাথে নাজদ অভিযানে গিয়েছিলেন। রাসূল (সা) যখন ফিরে আসেন তিনিও তাঁর সাথে প্রত্যাবর্তন করেন। দুপুর বেলায় তাঁরা এমন একটি বস্তিতে গিয়ে পৌঁছলেন যেখানে বহু কন্টকময় ঝোপ ছিল। রাসূল (সা) সেখানে যাত্রা ক্ষান্ত দিলেন। লোকজন বৃক্ষের ছায়ার সন্ধানে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়লো। রাসূল (সা) একটি বাবলা বৃক্ষের নিচে অবতরণ করলেন এবং স্বীয় তরবারীখানা বৃক্ষে ঝুলিয়ে দিলেন। সবেমাত্র আমাদের তন্দ্রা এসেছে এমন সময় দেখতে পেলাম রাসূল (সা) আমাদের ডাকছেন এবং রাসূল (সা)-এর নিকট একজন গেঁয়ো ব্যক্তি রয়েছে। রাসূল (সা) বললেন, আমি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছি, এমন সময় এই ব্যক্তি আমাকে হত্যা করার জন্যে আমার তরবারী ধারণ করে। সাথে সাথে আমিও জাগ্রত হয়ে পড়ি। দেখি আমার তরবারীখানা তার হাতে। সে বললো এখন আমার থেকে তোমাকে কে রক্ষা করতে পারবে? আমি তিনবার বললাম, 'আল্লাহ'। (বর্ণনাকারী বলেন) অতঃপর রাসূল (সা) বসে পড়লেন এবং কোন প্রতিশোধ নিলেন না।

465325

১৭৫. মোহাম্মদ আশরাফ উজ-জামান, 'অমুসলিমদের প্রতি মহানবী (সা)-এর মহানুভবতা', পবিত্র মীলাদুন্নবী (স) ১৪২০ সংখ্যা '৯৯/১০১।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে - যখন সে বললো, তোমাকে আমার থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম 'আল্লাহ', তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে তরবারী পড়ে গেল এবং তখন রাসূল (সা) উক্ত তরবারী হাতে নিয়ে বললেন - বলো এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? সে বলল - তরবারী ধারণকারীদের উত্তম ব্যক্তি আপনিই হোন। রাসূল (সা) বললেন, আচ্ছা তুমি কি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে যে "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। এবং আমি আল্লাহর রাসূল।" সে বলল, না, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে ভবিষ্যতে আমি নিজেও কখনো আপনার সাথে লড়বো না, এবং তাদের সাথেও যোগ দিব না যারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করে। রাসূল (সা) তাকে ছেড়ে দিলেন। সে তার সাথীদের নিকট গিয়ে বললো, আমি সর্বোত্তম ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছি।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে দক্ষ আলিম ছিল। সে হুযূর (সা)-এর নিকট কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা পেত। একদা সে হুযূর (সা)-কে তার ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে খুবই তাগিদ দিল। রাসূল (সা) বললেন - হে ইয়াহুনী! আমার নিকট তোমাকে দেওয়ার মত কিছুই নেই। সে বলল - আমার পাওনা না দেয়া পর্যন্ত তোমাকে ছাড়ব না। হুযূর (সা) বললেন, তাহলে আমি তোমার কাছেই বসে থাকব। অতঃপর তিনি এই ইয়াহূদীর সাথে বসে পড়লেন। সেকানে তিনি যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং পরদিন ফজরের নামাযও আদায় করলেন। আর সাহাবাদের একদল ঐ ইয়াহূদীকে ধমক দিতে শুরু করলেন ও ভয় দেখাতে লাগলেন। হুযুর (সা) সাহাবাদের এই আচরণ টের পেয়ে গেলেন। সাহাবাগণ আরজ করলেন - হে আল্লাহর রাসূল একজন ইয়াহূদী আপনাকে বন্দী করে রাখবে? হুযূর (সা) বললেন - আমার রব আমাকে মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানকারী কাফির-মুশরিক বা অন্য কাউকে জুলুম করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর যখন দুপুর হতে লাগল তখন ইয়াহূদী বলে উঠল - "আশহাদু আনলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ"। এবং বলল - আমার অর্ধেক মাল আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিলাম। আল্লাহর শপথ, আমি আপনার সাথে এই ব্যবহার নিছক এই জন্য করেছি যে, তৌরাতে আপনার সম্বন্ধে যে সব গুণ উল্লেখ আছে তা আপনার মধ্যে আছে কিনা? তৌরাতে লেখা আছে যে, তিনি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ, তাঁর জন্মস্থান মক্কা, তাঁর হিজরত হবে তায়বাতে (মদীনাতে)। তিনি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হবেন না। বাজারী লোকদের ন্যায় চেঁচিয়ে কথা বলবেন না। বাহ্যিক পোশাকেও হবেন ভদ্র এবং কতায় হবেন মিষ্ট। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। এই নিন আমার ধনসম্পদ, আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক এগুলোর ব্যাপারে ফয়সালা দিন। (বর্ণনাকালী বলেন) ইয়াহূদী লোকটি প্রচুর সম্পদের মালিক ছিল।

রাসূল (সা)-এর উদারতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসী ইসলামদ্রোহীর প্রতি তাঁর সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা।

মক্কা বিজয়ের পর কাফির মুশরিকগণ হরম শরীফে অসহায় অপরাধী হয়ে আসামীর কাঠগড়ায় বসা। হুযূর (সা) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন - বল আজ তোমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? তৎক্ষণাৎ তারা সমস্বরে বলতে লাগল - হে ভাতিজা! হে শাহজাদা - "দয়া ও ক্ষমা, "দয়া ও ক্ষমা"। উত্তরে দয়ার নবী শান্তির দূত রাসূল (সা) ঐ দু'টি বাক্য ইরশাদ করলেন যা হযরত ইউসুফ (আ) স্বীয়

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধী ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ১. আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই - আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, তিনি সকল দয়ালুর মহান দয়ালু, ২/ তোমরা সকলেই আজাদ, তোমাদের কারো উপর দাসত্বের দাগ লাগবে না।[১৭৬]

মহানবী (সা)-এর উদারতা প্রবন্ধে মুহাম্মদ আবদুল মালেক মহানবীর উদারতা সম্পর্কে অসাধারণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা)-এর আদর্শ ও উদারতা সমস্ত জাতির নিকট এক ও অভিন্ন। মুসলমান হলে তাঁর ব্যবহার ভাল হবে। আর অমুসলিম হলে তার ব্যবহার ভিন্ন রকম হবে-মহানবী (সা)-এর চরিত্রে এমনটি দেখা যায় না। ধনী, গরীব, মুসলিম, অমুসলিম, মু'মিন, কাফি-সকলের সাথে তার ব্যবহার ও চরিত্র অভিন্ন, তাঁর মধ্যে কোন রকম পার্থক্য নেই। এ পৃথিবীতে তাঁর মত চরিত্র, আদর্শ ও উদারতায় দ্বিতীয় আর কেউ হতে পারে না বা হবে না। এ ব্যাপারে আল-কুরআন স্পষ্টই ঘোষণা করেছে ঃ নিশ্চয়ই আপনি এক মহোত্তম চরিত্রের অধিকারী।

মহানবী (সা) ৬২৪ খৃষ্টাব্দে সকল গোত্র ও সম্প্রদায়ের নেতাদের নিয়ে একটি অপূর্ব সন্ধিপত্র সম্পাদন করেন, যাকে মদীনার সনদ হিসেবে অভিহিত করা হয়। পৃথিবীবাসী তাঁর এ উদার মানসিকতা আজো শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। এটি মানবেতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান।

প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে কুসাইয়া ওহুদের যুদ্ধে সকল বাধা উপেক্ষা করে মহানবী (সা)-এর নিকট পৌছে এবং পবিত্র মুখমণ্ডলের উপর সজোরে তরবারির আঘাত করে। ফলে মহানবী (সা)-এর দুটি দাঁত মুখের ভিতরে প্রবেশ করে। চারদিক থেকে তীর তলোয়ার বিরামহীনভাবে বর্ষণ হতে লাগল। অবস্থা দেখে সাহাবীগণ হুযূর (সা)-কে চারদিক থেকে ঘিরে পেলেন। আবূ দুজানা (রা) ঝুঁকে ঢালের ন্যায় তাঁকে আড়াল করলেন। হযরত তালহা (রা) হাত দ্বারা তলোয়ারের আঘাত প্রতিহত করলেন। তাঁর একখানি হাত কেটে নিচে পড়ে গেল। কাফিরের দল মহানবী (সা)-এর উপর ক্রমাগত তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। তখনও মহানবী (সা) তাদের বিরুদ্ধে কটু কথা উচ্চারণ না করে বলতে শুরু করলেন : হে আল্লাহ্! তুমি আমার কওমকে ক্ষমা কর। কেননা তারা জানে না।

সমঝোতা হলো। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই আনসারদের উদ্দেশ্যে বলল, "তোমরা যদি মুহাজিরদের সাহায্যে-সহায়তা না কর তাহলে বাধ্য হয়ে তারা চলে যাবে। এ ঘটনা মহানবী (সা) অবগত হলেন। হযরত ওমর শুনে মুনাফিকদের শিরোচ্ছেদের অনুমতি চাইলেন। হযরত (সা) উত্তরে বললেন, তোমরা কি পছন্দ কর যে মুহাম্মদ (সা) তার সঙ্গীদের হত্যা করার পরামর্শ দিবেন? এ সংবাদ শুনে উক্ত মুনাফিক পুত্র রাসূলের প্রিয় সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ মহানবী (সা)-এর নিকট আরয করলেন, "যদি অনুমতি হয় তা হলে আমি এখনই পিতার মস্তক ছিন্ন করে হুযূরের সমীপে হাযির করি। এমন যেন না হয় যে অন্য কাউকে আপনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং আমি পিতৃশোকে অভিভূত হয়ে পুনরায় তাকে হত্যা করি। মহানবী (সা) বললেন, হত্যার পরিবর্তে আমি তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার

---

১৭৬. মাওলানা শামছুল হুদা খান, 'মহানবী (সা)-র মানবিক উদারতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ১৪-২০।

Dhaka University Institutional Repository

করব। পরিশেষে মহানবী (সা) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর মৃত্যুর পর কাফনের জন্য নিজের চাদর দান করেন এবং জানাযার নামায পড়ান।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, এক রাত্রে এক কাফির এসে হুযূর (সা)-এর মেহমান হলো। তাকে একটি ছাগল দোহন করে দিলে এক নিঃশ্বাসে তা পান করে ফেলল। এভাবে পরপর সাতটি বকরীর দুধ সে পান করে ফেলল। কিন্তু মহানবী (সা) এ লোকটির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। বরং পরম যত্নে শেষ পর্যন্ত তাকে দুধ পরিবেশন করতে থাকলেন। এ অনুপম আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে ভোর হওয়ার পূর্বেই সে মুসলমান হয়ে গেল।

একবার জনৈক বেদুঈন এসে দেখতে পেল হুযূর (সা)-এর সামনে একটি বৃহৎ ছাগলের পাল রয়েছে। সে তার অভাবের কথা নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ছাগলের পালটিই তাকে দিয়ে দিলেন। বেদুঈন তার গোত্রে ফিরে গিয়ে প্রচার করলেন, "তোমরা সকলে ইসলাম গ্রহণ কর। মুহাম্মদ (সা) এমন উদার লোক যে, নিজে দরিদ্র হয়ে যাবেন এরূপ ভয় না করেই মুক্ত হস্তে দান করতে থাকেন। মহানবী (সা)-এর চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা ও উদারতা ছিল অতুলনীয়। তিনি উদারতার যে অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন, তাঁর দ্বিতীয় কোন নযীর দুনিয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাসে নেই।[১৭৭]

এ প্রাসঙ্গিক আরো কিছু প্রবন্ধ হচ্ছে : মানবতার নবী মুহাম্মদ (সা)[১৭৮], রসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শে মানবতা ও সাম্য[১৭৯], মহানবী (সা)-এর উদারতা[১৮০], মহানবী (সা)-র মানবিক উদারতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা[১৮১], যাঁর আগমনে পুরা মানবতার জন্ম[১৮২], সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ (সা)-এর অবদান[১৮৩], অমুসলিমদের প্রতি মহানবীর (সা) উদারতা[১৮৪],

---

১৭৭. মুহাম্মদ আবদুল মালেক, 'মহানবী (সা)-এর উদারতা', *অগ্রপথিক*, সীরাত স্মরণিকা ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ৬৫-৭৩।

১৭৮. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, 'মানবতার নবী মুহাম্মদ (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৭০-১৭৯।

১৭৯. প্রফেসর মোঃ ইউনুছ শিকদার, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শে মানবতা ও সাম্য', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ১৪২১ হিজরী সংখ্যা, পৃ ৩৯-৪২।

১৮০. মুহাম্মদ আবদুল মালেক, 'মহানবী (সা)-এর উদারতা', *অগ্রপথিক*, সীরাত স্মরণিকা ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ৬৫-৭৩।

১৮১. মাওলানা শামছুল হুদা খান, 'মহানবী (সা)-র মানবিক উদারতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ সংখ্যা, পৃ ১৪-২০।

১৮২. সৈয়দ আবুল হাসান 'আলী নদভী, 'যাঁর আগমনে পুরা মানবতার জন্ম', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ২৯-৩৪।

১৮৩. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি, গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ (সা)-এর অবদান', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ৮৭-১০১।

১৮৪. খোন্দকার আবদুর রশীদ, 'অমুসলিমদের প্রতি মহানবীর (সা) উদারতা', *মাসিক মদীনা*, ৪২ বর্ষ ১ম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৬, পৃ ৪৯-৫০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রিয়তম নবীর সা.-এর উদারতা[১৮৫], মানবতার নবী মুহাম্মদ (সা)[১৮৬], মহানবী (সা)-র মানবিক উদারতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা[১৮৭], উদারতার মূর্ত প্রতীক হয়রত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)[১৮৮], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শে মানবতা ও সাম্য[১৮৯], ক্ষমা ও ঔদার্য এবং বিনয়ের প্রতীক হযরত রাসূলে করীম (সা)[১৯০], মহানবী (সা)-এর উদারতা[১৯১], মানবতা বাস্তবায়নে মহানবী (সা)[১৯২], দয়াল নবী, দয়ার সাগর[১৯৩], মানবতার উন্মেষ ও রাসূলুল্লাহ (সা)[১৯৪] প্রবন্ধসমূহে বিশ্বনবী (সা)-এর মানবতা-উদারতা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

১৮৫. মুহিউদ্দীন খান, 'প্রিয়তম নবীর সা.-এর উদারতা', *মাসিক মদীনা*, ৪৬ বর্ষ ১১তম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ ৪৩-৪৫।

১৮৬. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, 'মানবতার নবী মুহাম্মদ (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ১৭০-১৭৯।

১৮৭. মাওলানা শামছুল হুদা খান, 'মহানবী (সা)-র মানবিক উদারতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ১৪-২০।

১৮৮. মাওলানা মুস্তাক আহমদ, 'উদারতার মূর্ত প্রতীক হয়রত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ১৬৯-১৭২।

১৮৯. প্রফেসর মোঃ ইউনুছ শিকদার, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শে মানবতা ও সাম্য', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) সংখ্যা ১৪২১, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০০, পৃ ৩৯-৪২।

১৯০. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'ক্ষমা ও ঔদার্য এবং বিনয়ের প্রতীক হযরত রাসূলে করীম (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) ১৪২২, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ৮-১৩।

১৯১. মুহাম্মদ আবদুল মালেক, 'মহানবী (সা)-এর উদারতা', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ৬৫-৭৩।

১৯২. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, 'মানবতা বাস্তবায়নে মহানবী (সা)', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩১ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৪০-১৪৩।

১৯৩. আ. ত. ম মুছলেহউদ্দীন, 'দয়াল নবী, দয়ার সাগর', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৩-১৫।

১৯৪. ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান, 'মানবতার উন্মেষ ও রাসূলুল্লাহ (সা)', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১১৪-১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে সম্পর্ক

বিশ্বশান্তির জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বদা রত ছিলেন। মদীনায় আগমনের পর য়্যাহূদীদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলেন, যাতে কুরাইশদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে পারেন এবং মুসলমান ও ইয়াহূদী উভয়েরই নিরাপত্তা রক্ষিত হয়। কিন্তু য়্যাহূদীরা চুক্তি অনবরত ভঙ্গ করেই চললো। রাসূলে খোদার মদীনার জীবনে য়্যাহূদীদের ষড়যন্ত্র[১৯৫] মহানবী (সা)-এর সঙ্গে য়্যাহূদীদের আচরণ[১৯৬] এবং মহানবীর (সা) সাথে য়্যাহূদী-খ্রীস্টানদের সম্পর্ক : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা[১৯৭] প্রবন্ধসমূহে মহানবীর শান্তি প্রয়াস ও য়্যাহূদীদের ষড়যন্ত্রের চিত্র ফুটে উঠেছে।

সৈয়দ আলী আহসান তাঁর *রাসূলে খোদার মদীনার জীবনে ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র* লিখেছেন : ইয়াহূদীদের বনি কায়নুকা গোত্রের লোকেরা ব্যবসায়ী ছিল। তারা স্বর্ণালংকার প্রস্তুত করত এবং তাদের মধ্যে লোহার কাজে দক্ষ কামারও ছিল্ একদিন এক বেদুঈন মুসলমান রমণী বনি কাইনুকা গোত্রের বসত বাড়িগুলোর কাছে একটি স্বর্ণালঙ্কারের দোকানে কিছু অলঙ্কার নির্মাণের জন্য এল। মহিলার মস্তক এবং মুখমণ্ডল আবরিত ছিল। দোকানের স্বর্ণকার এবং আশেপাশের ইয়াহুদীরা বেদুঈন রমণীকে ঠাট্টা করতে লাগল। তার আবরণ উন্মোচন করতে বলল এবং পিছন থেকে একজন ইয়াহূদী গিয়ে তার মস্তকের আবরণ খুলে ফেলল। এই ঘটনা একজন আনসারের চোখে পড়ল। সে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে রমণীর সম্ভ্রম বাঁচাবার চেষ্টা করল এবং যে ইয়াহূদী বেদুঈন রমণীর আবরণ খুলে ফেলেছিল তাকে হত্যা করল। ইয়াহূদীরা তখন সম্মিলিতভাবে আনসারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং হত্যা করল। আনসারের পরিবারবর্গ হত্যার প্রতিশোধ দাবি করল এবং কাইনুকা গোত্রের ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হল। ইয়াহূদীরা তাদের চুক্তির সনদ মত রাসূলে খোদা (সা)-র কাছে সংঘর্ষ বন্ধ করার দাবি জানাতে পারত কিন্তু তারা তা না করে তাদের পূর্বতন মিত্র ইবন উবাই এবং উবাদাহ ইবন শামিতকে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে বলল এবং নিজেরা আপন এলাকার অভ্যন্তরে আশ্রয় নিল। বনি কাইনুবার এলাকাটি দুর্ভেদ্য ছিল ও সুরক্ষিত ছিল। ইয়াহূদীরা আশা করেছিল উবাই এবং উবাদাহ তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে, কিন্তু তারা এগিয়ে এল না। মুসলমানরা এদিকে বনি কাইনুকার এলাকার চতুর্দিক বেষ্ট করে ফেলেছে এবং সেই বেষ্টনী ভেদ করে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা যেমন সম্ভবপর ছিল না তেমনি বাইরে থেকে সাহায্য আসাও সম্ভবপর ছিল না। তখন ইবন উবাই রাসূলে খোদার কাছে এসে বনি কাইনুকা গোত্রের লোকদের প্রতি সদ্ব্যবহার দাবি করল। ইবন উবাইয়ের ধারণা হল যে, বনি কাইনুকা গোত্রের সকল লোককে বোধ হয় হত্যা করা হবে। সে বলল, "বনি কাইনুকের লোকেরা আমাকে সবসময় রক্ষা করেছে। আপনি কি তাদের হত্যা করবেন?" রাসূল (সা) বললেন, "আমি তাদের প্রাণদণ্ড দেব না।" সাহাবাদের সাথে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল যে, বনি কাইনুকার সকল লোককে তাদের সম্পদ ও বাসস্থান পরিত্যাগ করে চিরকালের জন্য মদীনা ত্যাগ করে

---

১৯৫. সৈয়দ আলী আহসান, 'রাসূলে খোদার মদীনার জীবনে ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হিজরী সংখ্যা, পৃ ৩-৩০।

১৯৬. মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইস্লামাবাদী, 'মহানবী (সা)-এর সঙ্গে ইয়াহূদীদের আচরণ', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৯ হি*, পৃ ১৭-২৩।

১৯৭. আ ফ ম খালিদ হোসেন, 'মহানবীর (সা) সাথে ইহূদী-খ্রীস্টানদের সম্পর্ক : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২০ হি*, জা সী ক বা, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ ১০০-১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

চলে যেতে হবে। তিনি উবাদাহকে পথ প্রদর্শক হিসেবে বনি কাইনুকার লোকদের সঙ্গে যেতে বললেন। মদীনার বাইরে উত্তর-পশ্চিম দিকে ওয়াদিলকুরা বলে একটি ইয়াহূদী বসতি ছিল, তারা সেখানেই গিয়ে প্রথমে আশ্রয় নিল। পরে সিরিয়ার সীমান্তে বসতি স্থাপন করল। বনি কাইনুকার লোকেরা ধাতব দ্রব্যের ব্যবসা করত। তারা স্বর্ণালঙ্কার বানাত, রৌপ্যের অলঙ্কার বানাত এবং লোহা দিয়ে কৃষির যন্ত্রপাতি বানাত। এ সমস্ত ব্যবসার উপকরণ তারা ফেলে যেতে বাধা হল।

মদীনায় রসূলের বিরুদ্ধে ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র চিরকালের জন্য অবসান হল। রাসূলে খোদা (সা), আমরা লক্ষ করলাম যে তাঁর বিচারে শত্রুদের প্রতি কখনও কঠোর হয়েছেন, আবার অধিকাংশ সময়ই শত্রুদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। রাসূল (সা)-এর কাছে ক্ষমার মহিমা ছিল অগাধ, কিন্তু অন্যায় কর্মের জন্য দণ্ড বিধানও ছিল। রাসূল (সা) সমগ্র পৃথিবীর কাছে যে আদর্শ উপস্থিত করেছেন তা হচ্ছে - ক্ষমা এবং ন্যায়ানুগ প্রতিকার বিধানের আদর্শ। প্রথমটি হচ্ছে 'আখলাক' এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'কানুন'। এ উভয়ের সমন্বয়েই ইসলামের ন্যায় বিধান গড়ে উঠেছে। ধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা, সমাজের কল্যাণ ও রাষ্ট্রীয় শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ন্যায়ানুগ শাস্তির ব্যবস্থা করতেন, কিন্তু ক্ষমা ও অনুকম্পাই ছিল তাঁর জীবনের মৌলিক আদর্শ।[১৯৮]

ইহুদীদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

মদীনায় নব প্রতিষ্ঠিত ইসলাম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইহুদীরা যখন অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণা করল, রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ আরম্ভ করে প্রজাতন্ত্রের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে দিল, এমনকি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র প্রধান আল্লাহর নবীকে (সাঃ) হত্যার প্রচেষ্টা চালাল এবং চুক্তির শর্তাবলী ভঙ্গ করে বিদোহ ঘোষণা করল, তখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসঘাতকতা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ইহুদীদের বিরুদ্ধে কতিপয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মন্টেগোমারী ওয়াট বলেন :

> পুরো মুসলিম উম্মাহর ভিত্তি বিধ্বংস্ত করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ইহুদীগণ সাধারণত কোরআনের প্রত্যাদেশের মৌখিক বিরোধিতার প্রয়াস চালায়। অধিকন্তু তারা মুহাম্মদের শত্রু এবং বিরুদ্ধবাদী বিশেষত মুনাফিকদের রাজনৈতিক সহায়তা প্রদান করে। ইহুদীগণ তাদের এই শত্রুতামূলক তৎপরতা যতদিন পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছে মুহাম্মদ ততদিন তাদেরকে সম্মানের সহিত মদীনায় থাকার অনুমতি দিয়েছেন।

আরবের বাইরে বসবাসকারী খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের বিরোধ দেখা দিলে আরবের খৃষ্টানদের উপর কোন প্রকার নির্যাতন চারানো হয়নি।

দক্ষিণ ও মধ্য আরবের অনেক খৃষ্টান জাতি জিযিয়া / কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্তাপন করেন। দামেশকের নিকটবর্তী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনস্থ এক খৃষ্টান রাজার কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইসলাম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণপত্র সহ দূত পাঠালে, নিষ্ঠুরতার সাথে উক্ত দূতকে হত্যা করা হয়। দূত হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নবী করীম (সা) সিরিয়ায় এক

---

১৯৮. সৈয়দ আলী আহসান, 'রাসূলে খোদার মদীনার জীবনে ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হিজরী সংখ্যা, পৃ ৩-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

অভিযান প্রেরণ করেন। এভাবে ইসলামের দ্রুতবিকাশে খৃষ্টানগণ বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে উঠে এবং ইহুদীদের সাথে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্র পাকাতে শুরু করে।[১৯৯]

মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী তার প্রবন্ধ *মহানবী (সা)-এর সঙ্গে ইয়াহূদীদের আচরণ*-এ লিখেছেন :

হযরত নূহ্ (আ)-এর যুগে ঐতিহাসিক তুফানের পর 'সাফীনায়ে-নূহ্' বা নূহ্ নবীর নৌকা- জুদি পর্বতে স্থির হলে নৌকার আরোহিগণ বাবিল শহরে অবতরণ করেন। তাদের সংখ্যা ছিল ৮০ জন। তারা যে স্থানটিতে অবতরণ করেন তাদর সংখ্যার স্মৃতিস্বরূপ যে স্থানটি 'সূক-উস-সামানীন' নামে খ্যাত হয়। যার অর্থ ৮০ জন লোকের বাজার। সে নগরীতে তাদের বংশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। নমরূদ ছিল তাদের অধিপতি। তাদের ভাষার সংখ্যা দাঁড়াল ৭২টি। এর একটি হল আরবী ভাষা। 'আবিলী' বংশের লোকেরা অবস্থান করল মদীনা নগরীতে। তখন এ নগরীর নাম ছিল ইয়াসরাব। ইয়াসরাব 'আবিলী বংশের প্রধান ব্যক্তির নাম। তার বংশ পরিচয় এরূপ-ইয়াসরাব ইবন 'আবীল ইবন 'আওয ইবন এরম ইবন সাম ইবন নূহ্ (আ)। ইয়াসরাব প্রথম মদীনায় বসবাসকারী ব্যক্তি তার নামানুসার নগরীর নাম হয় ইয়াসরাব। নবী করীম (সা)-এর হিজরতের পর এ নগরীর নাম হয় মদীনা।[২০০]

এ ধারার ক'টি প্রবন্ধ হচ্ছে : মহানবীর (সা.) সাথে ইহুদী-খৃষ্টানদের সম্পর্ক : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা[২০১], রাসূলে খোদার মদীনার জীবনে ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র[২০২], অমুসলিমদের প্রতি মহানবী (সা)-এর মহানুভবতা[২০৩], অমুসলিমদের প্রতি মহানবী (সা)[২০৪], মহানবী (সা)-এর সঙ্গে ইয়াহুদীদের আচরণ[২০৫]। সকল প্রবন্ধেই একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আচার-আচরণ এক ব্যতিক্রম অধ্যায়ের সূচনা করে।

---

১৯৯. আ ফ ম খালিদ হোসেন, 'মহানবীর (সা) সাথে ইহূদী-খ্রীস্টানদের সম্পর্ক : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২০ হি*, জা সী ক বা, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ ১০০-১০৫।

২০০. মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, 'মহানবী (সা)-এর সঙ্গে ইয়াহূদীদের আচরণ', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৯ হি*, পৃ ১৭-২৩।

২০১. আ. ফ. ম খালিদ হোসেন, 'মহানবীর (সা.) সাথে ইহুদী-খৃষ্টানদের সম্পর্ক : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২০ হি/১৯৯৯, পৃ ১০০-১০৫।

২০২. সৈয়দ আলী আহসান, 'রাসূলে খোদার মদীনার জীবনে ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ২৩-৩০।

২০৩. মোহাম্মদ আশরাফ-উজ-জামান, 'অমুসলিমদের প্রতি মহানবী (সা)-এর মহানুভবতা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মীলাদুন্নবী (সা) ১৪২০, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৯, পৃ ১০০-১০৬।

২০৪. অধ্যাপক এ.কে.এম ইয়াকুব হোসাইন, 'অমুসলিমদের প্রতি মহানবী (সা)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ১৬৭-১৭২।

২০৫. মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, 'মহানবী (সা)-এর সঙ্গে ইয়াহুদীদের আচরণ', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ১৭-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও শিশু

ইসলামের কল্যাণ বার্তা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই। নারী ও শিশুর জন্যও রয়েছে শান্তি ও মুক্তির বাণী। শৈশবকাল মানব জীবনের মূল ভিত্তি এবং শিশুরা জাতির ভবিষ্যত। রাসূলুল্লাহ (সা) শিশুদের অধিকার, শিশুর জীবনের নিরাপত্তা বিধান ও বিকাশ, চরিত্র গঠন ও শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর কল্যাণেই নারী জাতি সর্বপ্রথম পরিবার ও সমাজ জীবনে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদার আসন অধিকারের সুযোগ পায়।

নারীর অবমাননা প্রতিরোধে মহানবী (সা)-এর আদর্শ শীর্ষক প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে :

নারীর অবমাননা ছিল আইয়্যামে জাহেলিয়তের প্রতীক। এক যুবকের কথা। মদীনায় ইসলামের মহান শিক্ষায় যখন আঁধর মনে একে একে হিদায়াতের বাতি জ্বলে উঠছিল, তখন এই যুবক একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তার লাইফ ষ্টাইল অনুসারে বললো, ইয়া মুহাম্মদ! আমি এক শর্তে ইসলাম গ্রহণ করতে পারি। শর্তটি হলো, "ইসলামের সবকিছু মেনে চলব, কিন্তু ব্যভিচার আর অবাধ যৌনতা ত্যাগ করতে পারব না।" সমবেত সাহাবীরা তো জিব কাটলেন, চোখ কপালে উঠিয়ে বললেন, এ কী ঔদ্ধত্য? মহানবী (সা)-এর সামনে এমন দুর্বিনীত ভাষায় কথা বলে! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে শান্ত থাকতে বলে যুবকটিকে প্রশ্ন করলেন :

হে যুবক! তুমি যার সাথে এই কাজটি করবে, সে তো হতে পারে কারও বোন, কারও কন্যা, কারও মা, তাই নয় কি?

সে বলল : হ্যাঁ, হতে পারে।

মহানবী (সা) বললেন : তোমার কেমন লাগবে যদি তোমার বোনের সাথে কেউ এ কাজটি করে।

সে বলল, কী বলেন আপনি।

: কেমন লাগবে যদি তোমার মায়ের সাথে ওই জঘন্য কাজটি করে?

: এ সহ্য করা যায় না।

এরপর মহানবী (সা) তার আরও কয়েকজন আত্মীয়ের উল্লেখ করে একই কথা জিজ্ঞেস করেন। এক সময় সে চিৎকার দিয়ে বললো, আমার মনে এখন এ ঘৃণ্য কাজের প্রতি কোনই আসক্তি নেই। আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করুন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কী লাগসই দাওয়াতি কৌশল। মনোজগতে বিপ্লব সাধন করাই ছিল তাঁর প্রধান পদ্ধতি। এটাই আধ্যাত্মিকতার হাকীকত।[২০৬]

ড. মাহবুবা রহমান *নারী-শিক্ষা বিস্তারে রাসূলে করীম (সা)-এর অবদান* সম্পর্কে উল্লেখ করেন :

---

২০৬. ড. আব্দুল্লাহ আল মারুফ, 'নারীর অবমাননা প্রতিরোধে মহানবী (সা)-এর আদর্শ', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৮৪-৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানার্জনের কোন বিকল্প ইসলামে নেই। সুতরাং ইসলাম জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। ফলে ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হতে থাকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে জ্ঞানচর্চার যে প্রবাহ শুরু হয়, নারীরাও সেখানে শামিল হয়েছিল। পরবর্তীতে আব্বাসীয় ও উমাইয়া যুগে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

ইসলামের শিক্ষার আলোকে পুরুষদের মধ্য হতে যেমনি হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত ইবন আব্বাস, হযরত ইবন মাসউদ, হযরত ইব্নে উমর (রা) এবং হাসান বসরী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম রাযী, ইমাম গাযযালী (রা)-এর মত মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা, হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ্, হযরত কারীমা বিনতে মিকদাদ, হযরত উম্মে কুলসুম (রা) এবং হযরত রাবেয়া বসরী (রা)-এর মত মহিয়ষী নারীরাও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মোট কথা ইসলামের নির্ধারিত সীমা ও গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করেই সে যুগের মহিলাগণ আত্মসংশোধন এবং জাতির খিদমতের উদ্দেশ্যে দীনী-শিক্ষা লাভ করতেন এবং নিজ সন্তানদেরকে এমন আদর্শবান করে গড়ে তুলতেন, যাতে তাঁরা নিজেদের যুগের পথিকৃৎরূপে কওমের শান্তি ও উন্নতিতে অবদান রাখতে পারতেন।

মহান আল্লাহ্ নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীদেরকে জ্ঞান চর্চার নির্দেশ দান করে বলেন ঃ 'তোমাদের ঘরে আল্লাহর যেসব আয়াত ও হিকমতের কথা শেখানো হয়, তোমরা তা স্মরণ রাখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ব বিষয়ে অবহিত।'[২০৭] (সূরা আহযাব : ৩-৪)

হাফেজা আসমা খাতুন *নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)* বিষয়ে লিখেছেন :

বর্তমানে নারী মুক্তি, নারী স্বাধীনতার বিষয়টি সবচেয়ে আলোচিত, সবচেয়ে বিতর্কিত, সবচেয়ে ঘটনাবহুল বিষয়ে পবিণত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর এ সভ্য যুগে, এ সভ্য সমাজে বিশ্বাসযোগ্য না হলেও বাস্তব সত্য এই যে, নারী আজকের সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত শ্রেণী। নারী আজ ব্যাপকভাবে হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার। শিক্ষা অংগনে, কর্মক্ষেত্র, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, ঘরে-বাইরে কোথাও নারীর সম্মান, মর্যাদা, নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই। আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগের চেয়ও আজকের নব্য জাহেলিয়াতের যুগে নারী আরো করুণ অবস্থার শিকার। তাই স্বাভাবিকভাবেই নারী মুক্তি, নারী স্বাধীনতার প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে।

অতীতের দিকে তাকালেও আমরা নারীর একই করুণ অবস্থা দেখতে পাই। অতীতে নারীকে লাঞ্ছনা ও পাপের প্রতিমূর্তি হিসাবে বিবেচনা করা হতো। কন্যার জন্মগ্রহণ পিতার জন্য বিরাট অপরাধ ও লজ্জার বিষয় ছিল। পবিত্র কুরআনে জাহিলী যুগের মানসিকতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

---

২০৭. ড. মাহবুবা রহমান, 'নারী-শিক্ষা বিস্তারে রাসূলে করীম (সা)-এর অবদান', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৫১-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

'যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায়; সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তা রেখে দেবে না মাটিতে পুঁতে দেবে। (সূরা আন-নহল, ৫৮-৫৯)

শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বড় বড় মনীষীরাও চিন্তা করতেন এবং বহুদিন এই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন ছিলেন যে, নারী প্রকৃতই মানুষ কি কনা, খোদা তাদের মধ্যে কোন আত্মা দিয়েছেন কি না ইত্যাদি।

এরূপ অবস্থায় শুধু আইনের দিক থেকে নয়, বরং মানবিক দিক দিয়েও অনতিক্রমী বিপ্লব আনয়ন করেছে ইসলাম।[২০৮]

মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন *বিশ্বনবী (সা)-এর শিশু স্নেহ* সম্পর্কে লিখেছেন :

ছোট্ট বালক যাইদকে শৈশবে জনৈক লোক নিয়ে এসে গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দিলে প্রিয় নবীজী (সা) তাকে কিনে আনেন এবং লালন-পালন করেন। সে প্রিয় রাসূল (সা)-এর স্নেহের ছায়ায় প্রতিপালিত হয়ে এত বেশি অভিভূত হয়ে গিয়েছিল যে, পরবর্তীতে তার পিতা-মাতা সংবাদ পেয়ে যখন তাকে নিতে আসলেন, তখন নবীজী (সা) তাকে কাছে ডেকে স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, এখন তোমার ইচ্ছা, তুমি চাইলে তোমার বাবা-মার সাথে দেশেও ফিরে যেতে পার বা আমার কাছেও থেকে যেতে পার। আমার কোন আপত্তি নেই। তখন ছোট্ট বারক যাইদ আপন পিতা-মাতার সাথে যাওয়ার বদলে প্রিয় নবীজী (সা)-এর কাছে থেকে যাওয়াকে আনন্দচিত্তে গ্রহণ করে নিল এবং তাঁদের সাথে যেতে কিছুতেই সম্মত হল না। রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বপ্রথম যাইদকে যয়নাবের সাথে বিয়ে দেন। এই বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটলে তাকে অন্যত্র বিয়ে দেন।

যাইদ-তনয় উসামাকে প্রিয় নবীজী (সা) দারুণ আদর করতেন। একদা তিনি মা আয়েশা (রা)-কে আদশ করলেন উসামাকে গোসল করিয়ে দিতে। তিনি তাকে গোসল করিয়ে দিতে গেলে তাঁর কাছে একটু খারাপ লাগে - তা বুঝতে পেরে নবীজী নিজ হাতে তাকে গোসল করিয়ে দিলেন ও সোহাগভরে তাকে চুমু খেলেন। এ ছিল শিশু কিশোরদের প্রতি মহানবী (সা)-এর স্নেহ-মমতার অপ্রতিম দৃষ্টান্ত।

আল্লাহর রাসূল (সা) শিশু-কিশোরদের হৃদয় দিয়ে, প্রাণ খুলে ভালোবাসতেন। তাদের আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে নিজের ঘোড়ার পেছনে চড়াতেন এবং হাসি-কৌতুক করতেন। সময় সময় তাদর সাথে বিনোদনমূলক নানারকম খাশগল্প করতেন। তবে তিনি নিছক তাদের আদর-সোহাগ আর আনন্দই দেননি; বরং সেই সাথে তাদেরকে উত্তম চরিত্রবান করে গড়ে তুলেছেন। যদি তাঁর সামনে কাউকে ভাল কাজ করতে দেখতেন, তাকে সে ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন, বাহবা দিতেন। পক্ষান্তরে কাউকে কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত দেখলে, তাকে সুন্দর ও কোমল ভাষায় বুঝিয়ে বারণ করতেন। ফলে তারা হাসিমুখে নবীজীর কথা মেনে নিতে এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকত।

---

২০৮. হাফেজা আসমা খাতুন, 'নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ১৬৭-১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন হাদীসে তাদের ভালোবাসা ও স্নেহ করার উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন ও নির্দেশ দিয়ে গেছেন। 'যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের শ্রদ্ধা করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।' শিশু-কিশোরদের প্রতি প্রেম-প্রীতি ও মায়া-মমতা প্রদর্শন করা প্রতিটি মুসলিমের নৈতিক দায়িত্ব। এ কথা বোঝাতে গিয়ে আল্লাহ্‌র নবী (সা) মুজাহিদদেরকে আহ্বান করে বলতেন, 'হে খোদার দীনের সৈনিকেরা। মনে রেখো। তোমরা কখনো কোন মাসুম শিশুর উপর আঘাত হানবে না।' এভাবে তিনি শিশুদের অধিকারের বিষয়েও বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে সকলকে সতর্ক করে গেছেন।[২০৯]

এ ধারার সমৃদ্ধ কয়েটি প্রবন্ধ হচ্ছে : শেষ নবী (সা) এর অপূর্ব শিশুপ্রীতি[২১০], নবী পাক (সা) মহিলাদের শ্রেষ্ঠ হক সংরক্ষণকারী[২১১], নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)[২১২], নারী সমাজের প্রতি বিশ্বনবীর (সা.) ইহসান[২১৩], মহানবী (সা)-এর দৃষ্টিতে নারী ও শিশু[২১৪], রাসূল (সা)-এর দৃষ্টিতে শিশু অধিকার ও নিরাপত্তা[২১৫], বিশ্বনবী (সা) এর শিশু-স্নেহ[২১৬], নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)[২১৭], নারীর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম[২১৮], নারী মুক্তিতে হযরত রসূলে করীম (সা.)[২১৯], নারীর

---

২০৯. মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন, 'বিশ্বনবী (সা) এর শিশু-স্নেহ', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) ১৪২২, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ১৫৮-১৬৭।

২১০. খন্দকার হাসান শাহরিয়ার, 'শেষ নবী (সা) এর অপূর্ব শিশুপ্রীতি', *মাসিক মুসলিম জাহান*, বর্ষ ৯ সংখ্যা ১২, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ১৪২০ হিজরী/২৩-২৯ জুন ১৯৯৯, পৃ ৩৩-৩৫।

২১১. অধ্যাপক দেওয়ান নুরুল হক, 'নবী পাক (সা) মহিলাদের শ্রেষ্ঠ হক সংরক্ষণকারী', *মাসিক মদীনা*, ৪১ বর্ষ ১ম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৫, পৃ ৮৮-৯২।

২১২. হাফেজা আসমা খাতুন, 'নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ১৬৭-১৭০।

২১৩. মোছাম্মত কবিতা সুলতানা, 'নারী সমাজের প্রতি বিশ্বনবীর (সা.) ইহসান', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ২৭৭-২৮৩।

২১৪. অধ্যাপক এ. কে. এম ইয়াকুব হোসাইন, 'মহানবী (সা)-এর দৃষ্টিতে নারী ও শিশু', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ২০৮-২৩২।

২১৫. মুহাম্মদ তাহের হোসেন, 'রাসূল (সা)-এর দৃষ্টিতে শিশু অধিকার ও নিরাপত্তা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ১৯৭-২১৮।

২১৬. মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন, 'বিশ্বনবী (সা) এর শিশু-স্নেহ', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) ১৪২২, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ১৫৮-১৬৭।

২১৭. হাফেজা আসমা খাতুন, 'নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ ৫১-৫৪।

২১৮. অধ্যাপিকা মওলানা শারাবান তহুরা, 'নারীর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ১২৬-১৩১।

২১৯. মেহেরুন্নেছা মেরী, 'নারী মুক্তিতে হযরত রসূলে করীম (সা.)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ১৩৮-১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রিয় নবী (সা)[২২০], হযরত মুহাম্মদ (দ.) নারীমুক্তির পথিকৃৎ[২২১], শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)[২২২], নারী-শিক্ষা বিস্তারে রাসূলে করীম (সা)-এর অবদান[২২৩], নারীর অবমাননা প্রতিরোধে মহানবী (সা)-এর আদর্শ[২২৪], হাদীসের আলোকে শিশুদের সাথে আচরণ[২২৫], হযরত মুহাম্মদ (দ.) নারী মুক্তির পথিকৃৎ[২২৬], নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রিয়নবী (সা)[২২৭], নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা) : পর্যালোচনা[২২৮], নারী মুক্তিতে হযরত রসূলে করীম (সা)[২২৯], নারীর মর্যাদা স্থাপনে হযরত মুহাম্মদ (সা)[২৩০], প্রবন্ধসমূহে নারী ও শিশুদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়েছে।

---

২২০. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম, 'নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রিয় নবী (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী সা. স্মরণিকা ১৪২১ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০০, পৃ ৬৪-৬৬।

২২১. সৈয়দ আশরাফ আলী, 'হযরত মুহাম্মদ (দ.) নারীমুক্তির পথিকৃৎ', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৩৯-৪৩।

২২২. মুহাম্মদ লুতফুল হক, 'শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১২৫-১৩০।

২২৩. ড. মাহবুবা রহমান, 'নারী-শিক্ষা বিস্তারে রাসূলে করীম (সা)-এর অবদান', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৫১-৫৫।

২২৪. ড. আব্দুল্লাহ আল মারুফ, 'নারীর অবমাননা প্রতিরোধে মহানবী (সা)-এর আদর্শ', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৮৪-৮৮।

২২৫. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, 'হাদীসের আলোকে শিশুদের সাথে আচরণ', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১০০-১০৪।

২২৬. সৈয়দ আশরাফ আলী, 'হযরত মুহাম্মদ (দ.) নারী মুক্তির পথিকৃৎ', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, ২০০৩, পৃ ৩৯-৪৩।

২২৭. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম, 'নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রিয় নবী (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা* ১৪২১ হি, পৃ ৬৪-৬৯; মাওলানা শারাবান তহুরা, 'নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)', *ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, মে ২০০২, পৃ ১২৫-১২৯।

২২৮. ড. মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী, 'নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা) : পর্যালোচনা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০১, পৃ ৪৩-৫১।

২২৯. মেহেরুন্নেছা মেরী, 'নারীমুক্তিতে হযরত রসূলে করীম (সা)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, পৃ ১৩৮-১৪০।

২৩০. নীলুফার ইসলাম নেলী, 'নারীর মর্যাদা স্থাপনে হযরত মুহাম্মদ (সা)', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ১৭ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৭, পৃ ১২৯-১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসাবিধান

রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থদের পাশে সেবকের ভূমিকা পালন করেছেন, কখনো চিকিৎসা পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর নিজের অসুস্থতার জন্যও তিনি চিকিৎসা নিয়েছেন। এ সকল চিকিৎসা পদ্ধতি ও উপকরণ মহানবী (সা)-এর চিকিৎসা বিধান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মহানবী (সা)-র ভেষজ বিধান[২৩১], মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান[২৩২], মহানবীর (সা) চিকিৎসা পদ্ধতি[২৩৩] এবং মহানবী (সা)-এর চিকিৎসা বিধান[২৩৪] প্রবন্ধসমূহে তাঁর চিকিৎসা বিধান সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। এখানে এ ধারার কয়েকটি প্রবন্ধের পর্যালোচনা করা হলো।

ডা. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান *মহানবী (সা)-র চিকিৎসাবিধান* সম্পর্কে লিখেছেন :

ইসলাম প্রচারের পূর্বেই আরবদেশে খৃষ্টান ও ইয়াহূদী কর্তৃক গ্রীক ও ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। শিক্ষিত, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও ধনী সম্প্রদায় ইয়াহূদী চিকিৎসকদের কদর করতেন। গরীব, বেদুঈন, অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে লোকজ চিকিৎসার সমাদর ছিল বেশি। গাছ-গাছড়া থেকে তৈরি ঔষধের সাথে সনাতনী পদ্ধতির তাবিজ-কবজ ঝাড়-ফুঁক লোকজ চিকিৎসা হিসেবে পরিচিত ছিল। দেব-দেবীর নামে মানবত, উৎসর্গ প্রথাও চিকিৎসায় ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছিল।

হযরত রাসূলে মকবুল (সা)-এর জন্ম হয় ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে। পবিত্র কাবা ঘর মক্কায় অবস্থিত থাকায় এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কাবা ও তাওয়াফ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে কাবা এলাকায় লোকজনের আগমনের কারণে রসূল (সা)-এর জন্মস্থান মক্কা আরবদের অন্যান্য এলাকার চাইতে কিছুটা উন্নত ও অগ্রসরমান ছিল। ফলে অন্যান্য এলাকায় প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কেও মক্কার অধিবাসীরা কিছুটা জ্ঞাত ছিল। এসব কারণে মন-মানসিকতায় ও চিন্তার ক্ষেত্রে তারা ছিল অগ্রসর। সে হিসেবে রসূল (সা)-এর মাধ্যমে যখন ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটল তখন চিকিৎসা ব্যবহস্থায়ও তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

পবিত্র কুরআনে মধু, দুধ ও যয়তুন তৈল সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। তাদর মাঝে যে মূল্যবান ওষধি গুণ ও উপকারিতা রয়েছে তার কিছু ইঙ্গিতও সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারীর সহীহ্ বুখারীর হাদীস, শামস আল দীন আবু আবদ আল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ

---

২৩১. ড. শহীদুল্লাহ মৃধা, 'মহানবী (সা)-র ভেষজ বিধান', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৬৬-১৬৯।

২৩২. ড. মোঃ আমির হোসেন সরকার ও মোঃ রুহুল আমিন, 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ ৯-২৫।

২৩৩. অধ্যাপক মুহাঃ সাইফুল ইসলাম, 'মহানবীর (সা) চিকিৎসা পদ্ধতি', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪১৯ হি*, জা সী ক বা, পৃ ২০৫-২০৮।

২৩৪. ডা. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, 'মহানবী (সা)-র চিকিৎসা বিধান', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮ হিজরী সংখ্যা পৃ ২৩৩-২৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল দাহাবী, শাফয়ী পণ্ডিত শামস আল দীন আবু আবদ আল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন আবূ বকর, ইবনে কাইয়িম আল জাওজিয়া প্রমুখের বক্তব্য থেকে মহানবী (সা)-র চিকিৎসাবিধান সম্পর্কে প্রামাণ্য দলীল পাওয়া যায়।

প্রাক-ইসলাম যুগে আরবরা যমযম কূপের পানিকে পবিত্র জ্ঞান করত এবং পেটের বিভিন্ন পীড়া নিরাময়ে ব্যবহার করত। ইসলাম প্রতিষ্ঠার যুগে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এমনকি রসূল (সা)-এর যুগ থেকে আজ ১৪০০ বছর পরেও সারা বিশ্বে যমযমের পানির ওষধি গুণ এক স্বীকৃত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

ওষধি চিকিৎসায় রসূল (সা) যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহার করেছেন বা করতে উপদেশ দিয়েছেন সেগুলো হচ্ছে :

১. মধু : আল্লাহ বাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে সূরা নাহলের ৬৯ নং আয়াতের এক স্থানে মধুমক্ষিকা সম্পর্কে বলেন, ... তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার।....

২. যয়তুন : রাসূল (সা) বলেন, যয়তুন তৈল খাও এবং শরীরে মালিশও কর। কেননা এটা কল্যাণময় বৃক্ষ। (মাযহারী)

৩. খেজুর : রসূলে মকবুল (সা) বলেছেন, 'খেজুর বেহেশতী মেওয়া এবং এটা বিষের প্রতিষেধক।'

৪. কালজিরা : রসূল (সা) বলেছেন, 'কালজিরা একমাত্র মৃত্যু ছাড়া সব রোগের মহৌষধ।'[২৩৫]

ড. শহীদুল্লাহ মৃধা *মহানবী (সা.)-এর ভেষজ বিধান* সম্পর্কে লিখেছেন :

> রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাসে ৪ দিন সকালে মধু খায় তার কোন বড় ব্যাধি হবে না। আবূ সাইদ আল খুদরীর বর্ণনা মতে, একদিন এক ব্যক্তি হযরত (সা)-এর কাছে এসে বলল যে, তার ভাইয়ের পাতলা পায়খানা হচ্ছে। মহানবী তাকে মধু খেতে বললেন। লোকটি তিনবার এসে জানাল মধু খেয়ে তাঁর ভাইয়ের পেট নিরাময় হয়নি। তিনি আবার তাকে মধু খেতে বললেন, এবার খবর এলো সে ভাল হয়ে গেছে।[২৩৬]

ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন *সুস্থ জীবন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নবী করীম (সা)-এর নির্দেশনাকে* মানবকূলের পাথেয় বলে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন :

> স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নবীকরীম (সা) নিয়মিত ব্যায়াম, নির্দোষ ক্রীড়া, ঘোড়দৌড়, তীর নিক্ষেপ ইত্যাদি অনুশীলন করতে বলেছেন। স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা প্রত্যেককে জীবিকা অর্জন করতে বলেছেন। স্বাস্থ্য

---

২৩৫. ডা. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, 'মহানবী (সা)-র চিকিৎসা বিধান', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮ হিজরী সংখ্যা পৃ ২৩৩-২৩৮।

২৩৬. ড. শহীদুল্লাহ মৃধা, মহানবী (সা.)-র ভেষজ বিধান, *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৬, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ১৬৬-১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষাকে তিনি প্রধান কর্তব্যরূপে গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে বৈধ, উত্তম ও সংযত আহার-বিহার করতে ওযু ও গোসল করতে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে, সময়মত নিদ্রা যেতে বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন।

স্বাস্থ্য রক্ষায় মহানবী (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তার যত ধন, সম্পত্তি আছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হলো স্বাস্থ্য।' তিনি আরও বলেন- 'হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট সুস্বাস্থ্য ও শান্তি প্রার্থনা করি।' আরও বলেন - 'তোমার দেহের প্রতি তোমার একটি কর্তব্য আছে।' এরূপে তিনি প্রতিটি কর্তব্যের প্রতি নির্দেশ দিতে ভোলেননি।

রোগের ভয়ে মানুষ যেন মানুষকে ঘৃণা না করে। চিকিৎসার প্রধানত চারটি প্রণালী - দূষিত রক্ত বের করা, মুখ দ্বারা ঔষধ খাওয়া, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ নেওয়া, জোলাপ নেওয়া। মহানবী (সা) অস্ত্রোপচার সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন এবং তিনি নিজ হাতে অস্ত্রোপচার করেছেন। আল্লাহর নামে তাবিজ দেওয়া বা ফুঁ দেওয়াকে বৈধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট কাতর মুনাজাত করা একান্ত প্রয়োজন। অসুখ হলে ঔষধ ব্যবহার করা আল্লাহর বিধান বলে ঘোষণা করেছেন।

রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সেবা-শুশ্রূষায় মহানবী (সা)

মহানবী (সা) যখনই কোন মানুষের অসুখের কথা শুনতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখতে যেতেন, তিনি যে বর্ণেরই লোক হোন। মানুষের সেবায় তিনি এই মহান দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর বাণী : (১) যখন তুমি রোগী দর্শন করতে যাও, তখন তুমি তার নিকট হতে দোয়া প্রার্থনা করো, তা ফেরেশতাদের দোয়ার ন্যায়। (২) রোগীর নিকট স্বল্পক্ষণ থাকো এবং মিষ্টি কথা বলো। (৩) রোগী যাতে শান্তি ও সাহস পায় এরূপ কথা বলো। (৪) রোগীর ইচ্ছানুযায়ী (ক্ষতিকর না হলে) খেতে দেবে। (৫) আল্লাহর নিকট রোগীর কুশল কামনা করো ঃ 'হে শান্তিময়, কষ্ট দূর কর। হে নিরাময়কারী, নিরাময় কর। তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান করো যাতে কোন ব্যাধি না থাকে। (৬) কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি রোগীর সেবার জন্য বাইরে থেকে লোক আসা ঠিক নয়। এই সমস্ত রোগে কোন লোকের স্থান ত্যাগ করা উচিত নয়। সুস্থ জীবন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নবী করীম (সা)-এর নির্দেশনা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সুবিন্যস্ত।[২৩৭] এ ধারার সমৃদ্ধ কয়েটি প্রবন্ধ হচ্ছে : মহানবীর (সা) চিকিৎসা-পদ্ধতি[২৩৮], মহানবী (সা)-এর চিকিৎসাবিধান[২৩৯], নিরাপদ খাবার গ্রহণে মহানবী (সা)-এর শিক্ষা[২৪০]।

---

২৩৭. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন, 'সুস্থ জীবন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নবী করীম (সা)-এর নির্দেশনা', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২১ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৯০-৯৪।

২৩৮. অধ্যাপক মুহাঃ সাইফুল ইসলাম, 'মহানবীর (সা.) চিকিৎসা-পদ্ধতি', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ২০৫-২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

তাসাওউফ

তাসাওউফ ও আসহাবে সুফ্‌ফা[২৪১] এবং রসূলুল্লাহ (সা)-এর আধ্যাত্মিক জীবন[২৪২] প্রবন্ধ দু'টি তাসাওউফ বিষয়ক। তাসাওউফ হল এমন ইলম যার সাহায্যে মানুষের আত্মা ও বিবেককে সাফ বা পরিষ্কার রাখা যায়। যিনি এই ইলমের চর্চা করেন তাঁকে সূফী বলা হয়। *রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আধ্যাত্মিক জীবন* প্রবন্ধে এ বিষয়ে বলা হয়েছে :

ইসলাম মানুষের মানবীয় গুণকে বিকশিত করে উন্নত চরিত্র অর্জনের শিক্ষা গ্রহণের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসৃত শিক্ষা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> 'তিনিই (আল্লাহ) নিরক্ষরদের একজনকে তাদের মাঝে রসূল করে পাঠিয়েছেন যিনি তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত আবৃত্তি করেন, তাদের পবিত্র করেন, শিক্ষা দেন কিতাব ও তত্ত্বজ্ঞান, যারা এর আগে অজ্ঞতার মধ্যে ছিল।' (সূরা জুম'আ : আয়াত-২)

আলোচ্য আয়াতে পবিত্রকরণকে একটি স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে য, শিক্ষা যতই বিশুদ্ধ হোক না কেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অধীনে কার্যত প্রশিক্ষণ লাভ না করা পর্যন্ত শুধু শিক্ষা দ্বারাই চরিত্র সংশোধিত হয় না। কারণ, শিক্ষার কাজ হলো প্রকৃতপক্ষে সরল ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন। এ কথা সুস্পষ্ট যে, পথ জানা থাকাই গন্তব্যস্থানে পৌছার জন্য যথেষ্ট নয়। এ জন্যে সাহস করে পা ফেলতে হবে এবং চলতেও হবে। যে সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সহবতে থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন, শিক্ষার সাথে সাথে তাঁদের আত্মিক পরিশুদ্ধিও সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে রসূলুরলাহ্ (সা)-এর প্রশিক্ষণাধীনে সাহাবীদের যে দলটি তৈরী হয়েছিল, একদিকে তাঁতের জ্ঞান-বুদ্ধির গভীরতা ছিল বিস্ময়কর, বিশ্বের দর্শন তাঁদের সামনে হার মেনেছিল এবং অন্যদিকে তাঁদের 'তাযকিয়া' বা আত্মিক পবিত্রতা, আল্লাহর সংগে সম্পর্ক এবং আল্লাহর উপর ভরসাও ছিল অভাবনীয়। 'তাযকিয়ার' ফলেই এককালের দুশ্চিরিত্র ব্যক্তিরাও চরিত্র-দর্শনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের আসনে সমাসীন হয়েছিলেন। চরিত্রহীনতার রোগীরা শুধু রোগ মুক্তই হয়নি, বরং তাঁরা সফল চিকিৎসকের পর্যায়ে উন্নীত

---

২৩৯. ডা: মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, 'মহানবী (সা)-এর চিকিৎসাবিধান', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ২৩৩-২৩৮।

২৪০. মাওলানা কাজী আবু হোরায়রা, 'নিরাপদ খাবার গ্রহণে মহানবী (সা)-এর শিক্ষা', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৩৩-১৩৯।

২৪১. আবদুল মতীন জালালাবাদী, 'তাসাওউফ ও আসহাবে সুফ্‌ফা', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হিজরী সংখ্যা, পৃ ২০৩-২০৬।

২৪২. ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, 'রসূলুল্লাহ (সা)-এর আধ্যাত্মিক জীবন', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, পৃ ৩৯-৪২।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল। যারা দুস্যু ছিল, তারা পথ প্রদর্শক হয়ে গেল, কঠোরতা ও যুদ্ধ লিপসার স্থলে নম্রতা ও পারস্পরিক শান্তি বিরাজমান ছিল। এক সময় ডাকাতি যাদের পেশা ছিল তারাই মানুষের ধন-সম্পদের রক্ষকে পরিণত হয়েছিল। কুরআনের ভাষায় যাকে 'তাযকিয়া' বলা হয়েছে, হাদীসে একে 'মারিফাত' বলা হয়েছে। এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, আত্মার পরিচয় জানা একান্ত প্রয়োজন।

কেবল আত্মার মাধ্যমেই আল্লাহর মারিফাত হাসিল করা সম্ভব, অন্য কোন ভাবে নয়। সুতরাং এটা অবধারিত সত্য যে, আত্মা বা 'কালবই' আল্লাহ্ পাকের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আত্মা তখনই আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় যখন তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত থাকে।

এই 'কলব্' বা আত্মাকে পবিত্র করার পদ্ধতি যে 'ইলমের দ্বারা জানা যায় তাকে 'ইলম তাসাওউফ বলে। আল-কুরআনে একে 'তায্কিয়া' বলা হয়েছে। তাসাওউফ শব্দের ব্যবহারিক অর্থ ঃ মানব-অন্তর কাম, ক্রোধ, হিংসা-দ্বেষ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য ইত্যাদি যাবতীয় কলুষিত বিষয় থেকে ছাপ বা পরিষ্কার হওয়া।

যথা নিয়মে এ নূরের পরিচর্যা করলে অন্তরে পূর্ণাঙ্গ ঈমান জন্মলাভ করবে, যা পার্থিব কোন প্ররোচনায় আর বিনষ্ট হবে না। পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রক্রিয়া যেহেতু মানুষ সৃষ্টির উপাদানের মধ্যেই নিহিত আছে, এজন্যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পূর্ণ অনুসারী মুর্শিদের সোহবত অবলম্বন করেনা এমন মানুষ সর্বযুগে সহজেই পাপাচারে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরকে শয়তানের প্রতিনিধি বা পাপিষ্ঠে পরিণত করেছে। পক্ষান্তরে যারা নিজেদেরকে আল্লাহর ইচ্ছায় পরিচালিত করার লক্ষ্যে নবীদের অনুসরণ করেছে এবং পরবর্তীতে নায়েবে নবীদের অনুসরণ করেছে, তারাই কামিয়াব হয়েছে।

বস্তুত দেহকে জীবিত রাখার জন্য যতদিন অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়বে, আত্মাকে জীবিত রাখার জন্য ততদিন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর আধ্যাত্মিক জীবনের অনুসারী কামিল মুকাম্মিল মর্শিদের পবিত্র হৃদয় থেকে ফয়েয আহরণের প্রয়োজনও অব্যাহত থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

জিহাদ, যুদ্ধবন্দী ও প্রতিরক্ষা

রাসূল (সা) মাক্কী জীবনে জিহাদের আদেশ প্রাপ্ত হননি। আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হওয়ায় হিজরতের নির্দেশ পেয়েছিলেন। মদীনা দারুল ইসলামে পরিণত হবার পরও শত্রুদের গায়ে পড়ে আক্রমণের দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি পান। বদর : ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধ[২৪৩], ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় ও তার কারণ[২৪৪], ওহুদ যুদ্ধ : ফলাফল ও নৈতিক শিক্ষা[২৪৫], খন্দকের যুদ্ধ ও ইসলামের বিজয়[২৪৬], গাযওয়ায়ে আহযাব বা জঙ্গে খন্দক[২৪৭] হুদাইবিয়ার সন্ধি : একটি প্রকাশ্য বিজয়[২৪৮], মক্কা বিজয় : বহুমাত্রিক তাৎপর্য ও সাফল্য[২৪৯], তাবুক অভিযান : বিশ্বের প্রথম ঐতিহাসিক লংমার্চ[২৫০], সমরাঙ্গনে রাসূলুল্লাহ (সা)[২৫১], রণাঙ্গনে সমর নায়ক মহানবী (সা)[২৫২] - এ সকল প্রবন্ধে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবা কিরামের আত্মত্যাগ ও অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

মুহাম্মদ মূসা *রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জিহাদে মানবিকতা ও মানবতা* প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

> রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধবন্দীদের জন্য যে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন তা নিম্নরূপ : মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী– '(বন্দী করার) পর হয় অনুকম্পা অথবা মুক্তিপণ'। (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৪)। বদর যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা মুক্তিপণ দিতে অক্ষম

---

২৪৩. আবদুল ওয়াহিদ, 'বদর : ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধ', *অগ্রপথিক*, মার্চ ১৯৯৩।

২৪৪. সৈয়দ আলী আহসান, 'ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় ও তার কারণ', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৩-২৮।

২৪৫. ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন ও আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর, 'ওহুদ যুদ্ধ : ফলাফল ও নৈতিক শিক্ষা', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৯ হি*, পৃ ৪৭-৫৪।

২৪৬. সৈয়দ আলী আহসান, 'খন্দকের যুদ্ধ ও ইসলামের বিজয়', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, পৃ ৯-১৯।

২৪৭. ডা. (ক্যাপ্টেন) আবদুল বাছেত, 'গাযওয়ায়ে আহযাব বা জঙ্গে খন্দক', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১১ হি বিশেষ সংখ্যা, পৃ ৩৬-৩৯।

২৪৮. ড. বি এম শামসুদ্দীন আহমদ, 'হুদায়বিয়ার সন্ধি : একটি প্রকাশ্য বিজয়', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৮ হি*, পৃ ৩৬-৩৯।

২৪৯. আবদুল মুকীত চৌধুরী, 'মক্কা বিজয় : বহুমাত্রিক তাৎপর্য ও সাফল্য', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২১ হি*, পৃ ১০১-১০৮।

২৫০. রহমান মজনিব, 'তাবুক অভিযান : বিশ্বের প্রথম ঐতিহাসিক লংমার্চ', আবদুল ওয়াহিদ অনূ., *অগ্রপথিক*, ডিসেম্বর ১৯৯২ ও জানুয়ারী ১৯৯৩।

২৫১. মুহাম্মদ সিরাজুল হক, 'সমরাঙ্গনে রসূলুল্লাহ (সা)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, পৃ ৭১-৭৬।

২৫২. আবদুল ওয়াহিদ, 'রণাঙ্গনে সমর নায়ক মহানবী (সা)', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪১৯ হি*, জা সী ক বা, পৃ ২১৩-২১৬।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল তাদেরকে শিশুদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল এবং তাদের এই কর্তব্য পালনকে মুক্তিপণ হিসেবে ধার্য করা হয়েছিল।

অনুকম্পা প্রদর্শনের মধ্যে মোটামুটি চারটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত– (ক) বন্দী থাকা অবস্থায় তার সাথে সদাচরণ করতে হবে; (খ) স্থায়ীভাবে বন্দী করে রাখার পরিবর্তে তাকে সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে; (গ) নিজ ধর্মে বহাল থাকলে নিরাপত্তা কর আরোপ করে তাকে দেশের নাগরিক (যিম্মী) করে নিতে হবে; (ঘ) কোনোরূপ বিনিময় গ্রহণ ব্যতিরেকে নিঃস্বার্থভাবে তাকে মুক্ত করে দিতে হবে। একইভাবে মুক্তিপণ গ্রহণের ক্ষেত্রেও তিনটি বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে – (ক) মুক্তিপণের অর্থ গ্রহণের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া; (খ) মুক্তিদানের শর্ত হিসেবে বিশেষ কোনো সেবা গ্রহণের পর মুক্তি দেয়া; (গ) প্রতিপক্ষের কাছে বন্দী মুসলিম সৈনিকদের সাথে বিনিময় করা। মুসলিম সরকার এসব পন্থার মধ্যকার যে পন্থাকে সর্বাধিক উপযুক্ত ও সুবিধাজনক মনে করবে তদুনাসারে ব্রবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কেরামের কার্যপ্রণালী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন যুদ্ধবন্দী যতক্ষণ সরকারের হাতে বন্দী থাকবে ততক্ষণ তার পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। বন্দীদের অভুক্ত, বস্ত্রহীন ও চিকিৎসাহীন রাখার কোনো সুযোগ ইসলামী শরীয়াতে নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'তোমরা বন্দীদের সাথে সদয় ব্যবহার করো'। (সীরা ইবনে হিশাম)

মহানবী (সা)-এর পূর্বকালে, তাঁর সমসাময়িক কালে এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে যুদ্ধের ভয়াবহতা যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকতো না। পরাজিত জাতির জনপদসমূহ মারাত্মকভাবে তছনছ করা হতো। নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ চালানো হতো এবং বেসামরিক লোকজনকেও বন্দী করে নিজ দেশে নিয়ে যাওয়া হতো। নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ চালানো হতো এবং বেসামরিক লোকজনকেও বন্দী করে নিজ দেশে নিয়ে যাওয়া হতো তাদের সাথে ইতর প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট ব্যবহারের কথা হতো। শত শত বছর ধরে মানুষ যুদ্ধের এই ভয়াবহ চিত্রই দেখে আসছিল। তাদের সামনে যুদ্ধে পরাজয় মানেই সমূলে ধ্বংস।

রহমাতুল্লিল আলামীন সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা) এই বিভীষিকাময় চরিত্রে আমূল পরিবর্তন আনেন। তিনি যুদ্ধের ভয়াবহতাকে কেবল যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেন এবং বেসামরিক জনপদে সৈন্য পরিচালনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। সাহাবায়ে কিরাম এবং তাদের পরবর্তী মুসলিম শাসকগণ এই নীতি মনে-প্রাণে মেনে নেন। ইরাক, ইরান, সিরিয়া, মিসর ও এশিয়া মাইনরসহ পৃথিবীর বিরাট একটি অংশ সাহাবায়ে কিরামের শাসনামলেই মুসলিম শাসনাধীন আসে। এসব এলাকার পরাজিত জনগণ যুদ্ধের সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চিত্র লক্ষ করে। মুসলিম সেনাবাহিনী জনপদের ভেতর দিয়ে মার্চ করেছে, কিন্তু লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নির্বিচার হত্যাকাণ্ড জনসাধারণকে বন্দী করার কোনো ঘটনাই তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়নি। এমনকি তারা কোনো নারীর প্রতিও চোখ তুলে তাকায়নি। শত শত বছর পরে জনগণ যেন আসমানী ফেরেশতাদের বাহিনী অবলোকন করলো।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে এসব এলাকার জাতি-গোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে ইসামের সুশিতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে।[২৫৩]

ড. এ. এইচ এম মুজতবা হোছাইন *বদর-যুদ্ধবন্দীদের সাথে রাসূল (সা)-এর আচরণ সম্পর্কে* বলেন :

বদরযুদ্ধে রাসূল (সা.)-এর চাচা আব্বাস, হযরত আলীর ভাই আকীল, নওফল, আসওয়াদ, আবদুল্লাহ বিন যমআ প্রমুখসহ সত্তরজন কুরাইশ বন্দী হয়েছিলেন। মসীনায় পৌঁছার পর বন্দীদের সাথে রাসূল (সাঃ) যে আদর্শ ব্যবহার দেখিয়েছিলেন, বিশ্বের ইতিহাসে এর তুলনা বিরল। তাঁর আদেশে আনসার ও মুহাজিরগণ বন্দীদেরকে ভাগ করে নিয়ে আপন আপন গৃহে স্থান দিলেন এবং অতিযত্নের সাথে মেহমানদারী করতে লাগলেন। অনেক সময় বন্দীদেরকে রুটি খাইয়ে তারা নিজেরা শুধু খেজুর খেয়ে থাকতেন। হযরত মুসআর বিন উমায়েরের ভাই আবূ 'আযীয বলেন আমি যে আনসারীর ঘরে বন্দী ছিলাম, তারা সকাল-বিকাল আহারের জন্য আমাকে রুটি দিতেন, আর তারা শুধু খেজুর খেয়ে থাকতেন। আমি লজ্জিত হয়ে অনেক সময় খেজুর খাওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা রুটি গ্রহণ করেনি বরং আমাকেই রুটি খেতে বাধ্য করেছেন। এ জন্যই মুসলমানদের চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে অনেক কয়েদীই ইসলাম গ্রহণ করেন। মুক্তিপণ হ্রাস করার মানসে কুরায়শরা বহু দিন পরে তাদের মুক্তির জন্য দূত পাঠায়। এ সুদীর্ঘ সময় যাবত বন্দিগণ মুসলমানদের নিকট সমানভাবেই সেবা যত্ন পেতে থাকে। তৎকালীন সামরিক আইন অনুযায়ী তাদেরকে হত্যা করা কিংবা আজীবন দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা যেত। অতীত জীবনের কৃত অপরাধে এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কা নিষ্কৃতি লাভের জন্যও তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া অন্যায় ছিল না। তথাপি মূর্ত রহমত রাসূল (সা) তাদেরকে এত আদর যত্ন করলেন। স্যার উইলিয়াম ম্যুর ও তার রচিত নবী চরিতে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এ নিবন্ধে বদর-যুদ্ধবন্দীদের সাথে রাসূল (সা) এরআচরণ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

মুক্তিপণ নির্ধারণেও রাসূল (সা) কম সহায়তা দেখাননি। বন্দীদের অবস্থানুসারে তিনি মুক্তিপণ নির্ধারণ করেছিলেন। সঙ্গতিপন্ন লোকদের জন্য উর্ধ্বে ছয় হাজার দিরহাম এবং সাধারণ পরিমাণ চার হাজার দিরহাম নির্ধারিত হল। কিন্তু যারা এ পরিমাণ পণ আদায় করতে অক্ষম এমন দরিদ্রেরকে শুধু চারশত দিরহাম নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ১০ আর যারা লেখাপড়া জানত তাদেরকে প্রত্যককে মদীনায় দশটি বালককে লেখা-পড়া শিখিয়ে দিতে বলা হয়েছিল এবং এটাই তাদের মুক্তিপণ রূপে গণ্য হয়েছিল। ১১ এ উপায়ে মদীনার বহুলোক শিক্ষিত হয়েছিল। শিক্ষার প্রতি রাসূল (সাঃ) এর এই অনুরাগ সত্যই অত্যন্ত প্রশংসনীয়। হযরত যায়েদ বিন সাবিত বন্দীদের নিকট শিক্ষা লাভ করই শিক্ষিত হয়েছিলেন।

রাসূল (সা) এর কন্যা হযরত যয়নবের স্বামী আবুল আস ছিলেন বন্দীদের অন্যতম। তিনি হযরত যয়নবের সাথে অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করতেন। রাসূল (সা) এর সাথে কুরাইশদের শত্রুতা যখন চরমে

---

২৫৩. মুহাম্মদ মুসা, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জিহাদে মানবিকতা ও মানবতা', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৮৬-৯১।

Dhaka University Institutional Repository

পৌঁছেছিল, তখন কুরাইশ সরদারগণ রাসূল (সা)-এর কন্যাদেরকে তালাক দিয়ে দেয়ার জন্য জামাতাদের উপর বল প্রয়োগ করে। সুতরাং পোড়া কপালে আবূ লাহাবের পুত্রদ্বয় রাসূল (সা)-এর দু'কন্যাকে তালাক দিয়ে দেয়, কিন্তু আবূল আস হযরত যয়নবকে তারাক দিতে সম্মত হননি। তিনি বলেছেন, আমি কিছুতে এ স্ত্রীকে তালাক দিবনা। তোমাদের যা করতে হয় কর। তিনি যখন কয়েদী হয়ে আসেন তখন মুক্তিপণ আদায় করার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। অগত্যা তাঁর স্ত্রী হযরত যয়নব তাঁকে মুক্ত করার জন্য নিজের গলার হার পাঠিয়ে দেন। এই হার বিবাহের সময় তাঁকে তাঁর আম্মা হযরত খাদীজা (রাঃ) উপহার দিয়েছিলেন। জান্নাতবাসিনী সহধর্মিনী হযরত খাদীজার (রা) গলার হার দেখে রসূল (সা)-এর প্রাণ গলে উঠল। তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা যদি সম্মত হও, তবে যয়নবের হারখানা যয়নবকে ফেরত দিয়ে দিতে পার, আর দরিদ্র আবূল আসকে বিনা পণে ছেড়ে দিতে পার। সাহাবীগণ সকলেই এতে সম্মত হলেন। রাসূল (সা) আবূল 'আসকে বললেন; তুমি আমার কন্যা যয়নবকে মদীনায় আমার নিকট আসার অনুমতি দিবে, এই শর্তে তোমাকে মুক্তি দেয়া হল। যয়নবকে আসার জন্য আবূল 'আসের সাথে লোক পাঠিয়ে দেয়া হল। আবুল'আস মক্কা গিয়ে শর্তানুসারে হযরত যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। কিছু দিন পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বন্দীদের মধ্যে সুহায়ল বিন আমর নামক একটি লোক ছিল। সে অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করতে পারত। দীর্ঘকাল যাবত যে রাসূল (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে লোকদেরকে ইসলাম হতে ফিরাত। হযরত উমর (রা) রাসূল (সা)-কে বললেন, 'হুজুর, এ পাষন্ডের নিচের দাঁত দু'টি ভেঙ্গে দিন, মধুর বক্তৃতা দ্বারা যেন সে আর লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে।' রাসূল (সা) বললেন আমি তাঁর অঙ্গ বিকৃত করলে আল্লাহ তা'আলা আমার অঙ্গ বিকৃত করতে পারেন যদিও আমি নবী। আর সে হয়ত একদিন এমন বক্তৃতাও করতে পারে যা শুনে তুমি প্রশংসা কর। রাসূল (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালের পর মক্কার অনেক লোক ইসলাম পরিত্যাগ করে মুর্তাদ হওয়ার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু হযরত সুহায়ল তখন এক প্রাণ মাতানো বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন যে, তাঁর বক্তৃতায় সকলেই এই সংকল্প পরিত্যাগ করেছিল।[২৫৪]

সৈয়দ আলী আহসান *ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় ও তার কারণ* প্রবন্ধে বলেন :

বদরের যুদ্ধের পর মদীনায় শান্তি ফিরে এল বটে কিন্তু মক্কার কুরাইশগণের উত্তেজনা ও ক্ষোভ প্রশমিত হল না। কুরাইশগণের নেতা আবূ সুফিয়ান বদরের যুদ্ধের পরাজয়কে মেনে নিতে পারে নি। কুরাইশদের এই উম্মা এবং প্রতিরেশাধ স্পৃহা থেকে ওহুদের যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

এই যুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষে বাইশ জন নিহত হয়েছিল মোট তিন হাজারের মধ্যে এবং মুসলমানদের মধ্যে নিহত হয়েছিল পঁয়ষট্টি জন। নিহত মুসলমানদের শবদেহ নিয়ে কুরাইশ রমণীরা বীভৎস

---

২৫৪. ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, 'বদর যুদ্ধ বন্দীদের সাথে রাসূল (সা.)-এর আচরণ', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২০ হি/১৯৯৯, পৃ ২১৭-২২২।

Dhaka University Institutional Repository

অনাচার করেছিল, যা তাদের জন্য একটি কলঙ্কের পরিচয় বহন করে। তারা মৃতদেহের নাসিকা এবং কর্ণ কর্তন করেছিল এবং আরও নানাভাবে শরীরগুলোকে বিকৃত করেছিল।

এই ভয়াবহ ঘটনা ইসলামের ইতিহাসের একটি মহাবেদনার স্বাক্ষর রেখে গেছে। যাঁরা নিহত হয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন জ্ঞানী, আদর্শবাদী এবং ত্যাগী পুরুষ। তাঁরা আল্লাহর পথে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। জীবনে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর আদর্শ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বপ্রকার অহমিকা বিসর্জন দিয়ে শান্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে সকল মানুষকে একত্রিত করা।

ওহুদের যুদ্ধের বিপর্যয়ের কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর অনেকে অনেকভাবে দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রথমে একটি কথা বলে নেয়া ভাল যে, বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের যে ধরনের পরাজয় ঘটেছিল ওহুদের যুদ্ধে সে ধরনের পরাজয় ঘটেনি। কুরাইশগণ যুদ্ধে জয়লাভ করেও মুসলমানগণকে বিতাড়িত করতে পারেনি। শুধুমত্র তাই নয়, বিপর্যয়ের পরেও মুসলমানগণ কুরাইশগণের মদীনাভিমুখে যাত্রা সম্পূর্ণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল। সুতরাং এটা ছিল কুরাইশদের জন্য এক প্রকার অনিশ্চিত বিজয়। তবে কুরাইশগণ যে বদরের যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়েছিল এটা সত্য। তবুও মুসলমানরা যে যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ বিপর্যয়ের কারণ কয়েকটি। প্রথমত মুসলমানদের মধ্যে কিছু মুনাফিকও ছিল যারা যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিল। দ্বিতীয়ত যুদ্ধরত মুসলমানদের মধ্যে তীরন্দাজ বাহিনী রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে স্থান ত্যাগ করেছিলেন। তৃতীয়ত সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের কিছু অংশ লুণ্ঠনের কাজে ব্যাপৃত হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে যে শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতা একান্ত প্রয়োজন এবং যার নির্দশ রাসূল বারবার দিয়েছিলেন সে শৃঙ্খলার অভাবই মুসলমানদের পরাজয়র প্রধান কারণ।

ওহুদের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য একটি বিরাট পরীক্ষা ক্ষেত্র। এই পরীক্ষায় সম্পূর্ণ বিজয় অর্জিত না হলেও ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষণীয় অনেক কিছু ছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বাসীদের জন্য এই আশ্বাসেরও প্রয়োজন ছিল যে আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলে ধারণা করতে নেই, কেননা তারা যথার্থই জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে রিযিক বা অভয় ও সান্ত ্না পাচ্ছেন।[২৫৫]

ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন ও আবু তাহের মুহাম্মদ মান্‌জুর *ওহুদ যুদ্ধ ঃ ফলাফল ও নৈতিক শিক্ষা* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন :

ওহুদ যুদ্ধ ইলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মহানবী (স)-এর ঘটনাবহুল জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই ওহুদ যুদ্ধ। বদর যুদ্ধের মাত্র দেড় বছর ব্যবধানে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাফিরদের উদ্দেশ্য ছিল মুহাম্মদ (স) প্রবর্তিত নতুন ধর্মকে অঙ্কুরেই বিলীন করে দেওয়া।

---

২৫৫. সৈয়দ আলী আহসান, দওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় ও তার কারণ্ব, *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৮ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ১৩-২৮।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের ক্রমোন্নতি এবং মদীনা রাষ্ট্রের ভিত মজবুত হওয়াই ছিল তাদের আক্রোশের মূল কারণ। এজন্য তারা বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র শুরু করে, যার বাস্তব রূপ বদর যুদ্ধ। এ যুদ্ধে তাদের শীর্ষস্থানীয় অধিকাংশ নেতাসহ মোট ৭০ জন নিহত হয় এবং সমসংখ্যক মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। এতে মদীনা রাষ্ট্র এবং মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি তাদের আক্রোশ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

বদর যুদ্ধই আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে ইসলামের প্রথম পদক্ষেপ। তখন হতেই এর অগ্রগতি ও জয়যাত্রা আরম্ভ হয়। আর মক্কা বিজয় হল এর শেষ মনযিল। এখানে এসেই ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ওহুদ যুদ্ধ এই সুদীর্ঘ যুদ্ধ-শৃঙ্খলের একটি কড়ি মাত্র। সাময়িক বিপর্যয়কে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনানা করে সমষ্টির মধ্য দিয়ে এর বিচার করাই আমরা সমীচীন বলে মনে করি।

বদর-বিজয়ের পর হতে অনেক মুসলমানের মনেই একটা বেপরোয়া ভাব জেগে উঠেছিল। অনেক মুনাফিকও মুসলমানদের ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। আবার খাঁটি মুসলমানদের মধ্যেও এমন কতকগুলো ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গিয়েছিল যার আশু সংশোধনের নিত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। এঁরাই পরবর্তীকালে সত্যের বিজয় অভিযান চালনা করবেন, দুদিন পর দিগ্বিজয়ী বেশে সিরিয়া, পারস্য, মিসর, স্পেন প্রভৃতি দেশ জয় করবেন। সুতরাং সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র করে সুষ্ঠুভাবে তাঁদেরকে গড়ে তোলার খুবই প্রয়োজন ছিল। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা যুবকদের মনে মদীনার বাইরে ওহুদ প্রান্তরে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণা দিয়েছিলেন।

শত্রুজয়ের রিবর্তে তাঁরা আত্মজয় করতে পারেন কিনা, বিপদে ধৈর্য ধারণ করে স্বীয় কর্তব্য পালনে অটল থাকতে সক্ষম হন কিনা, জয়ের স্থলে সাময়িক বিপর্যয়কে তাঁরা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে জানেন কিনা, তাঁরা প্রাণের সাথে কামনা করেন কিনা, এটাই ছিল এ যুদ্ধের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।[২৫৬]

আবদুল ওয়াহিদ *রণাঙ্গনে সমরনায়ক মহানবী (সা)* প্রবন্ধে লেখেন :

রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো কখনো নিজে অভিযান পরিচালনা করেছেন। এটাকে বলা হয় 'গাযওয়া'। আবার কখনো কখনো তিনি কাউকে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছেন; এটাকে বলা হয় 'সারিয়া'। 'গাযওয়া' থেকেই 'গাযী' শব্দের উদ্ভব ঘটে। নবী জীবনের ২৯টি গাযওয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

উল্লেখ্য, নবী করীম (সা) অনেকগুলো গাযওয়ায় নেতৃত্ব দেন এবং অনেকগুলো সারিয়া প্রেরণ করেন। এতগুলো অভিযান সত্ত্বেও পক্ষে-বিপক্ষে নিহতের সংখ্যা মাত্র ১০১৮ জন। নবী করীম (সা) স্বহস্তে কাউকেই হত্যা করেননি। শান্তি প্রতিষ্ঠাই ছিলো তাঁর অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। আর তিনি তাঁর মিশর নিয়ে ইসলামের প্রচার-প্রতিষ্ঠায় সাফল্যের উচ্চ সোপনে আরোহন করতে সমর্থ হন।[২৫৭]

---

২৫৬. ড. এ এইচ এম মুজতবা হোসাইন ও আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর, 'ওহুদ যুদ্ধ : ফলাফল ও নৈতিক শিক্ষা', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ৪৭-৫৪।

২৫৭. আবদুল ওয়াহিদ, 'রণাঙ্গনে সমর নায়ক মহানবী (সা.)', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ২১৩-২১৬।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ সিরাজুল হক *মক্কা বিজয় ও মহানবী (সা)-এর অপূর্ব ক্ষমা* শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন :

পৃথিবীর ইতিহাসে বহু চমকপ্রদ বিজয়কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। বহু বীর সেনাপতি বহু দেশ জয় করে অমর হয়েছেন। আবার এ সমস্ত বিজয়ের পিছনে বহু রক্তপাত সংঘটিত হয়েছে, হয়েছে অনেক মানুষ হতাহত। কিন্তু মক্কা বিজয়ের ইতিহাস এক অনন্য ইতিহাস। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ রক্তপাতহীন বিজয় কাহিনী আর দ্বিতীয়টি নেই।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ৬১০ খৃষ্টাব্দ মুতাবিক ৮ই রবিউল আউয়াল সর্বপ্রথম ওহীর মাধ্যমে নবুওয়ত লাভ করেন। আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন মুতাবিক ৮ই রবিউল আউয়াল প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন মুতাবিক ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দুপুর বেলায় মদীনার কুবা পল্লীতে পৌঁছেন।

অবশেষে ৮ম হিজরীতে মক্কার কুরাইশগণ হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে এক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় মহানবী (সা) মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। অতি সংগোপনে প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। অতঃপর ৮ম হিজরীর ১০ রমযান মুতাবিক ৬৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ১০ হাজার অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সাহাবীকে নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং মক্কার অদূরে মারুজজাহবান নামক স্থানে গিয়ে তাঁবু স্থাপন করেন। কিন্তু মক্কাবাসীগণ কিছুতেই এ ভয়াবহ অবস্থা জানতে পারেনি। তাই তথ্য সংগ্রহের জন্য কুরাইশগণ আবূ সুফিয়ান, হাকীম ইবন হাযাম এবং বোদায়েল ইবন ওয়ারাকাকে প্রেরণ করে। পথে আবূ সুফিয়ানের সাথে হযরত আব্বাস (রা)-এর সাক্ষাৎ হলো। হযরত আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেই আবূ সুফিয়ান জানতে পারেন যে, মুসলিম বাহিনী মক্কা আক্রমণ করার জন্যই আগমন করেছে। এ কথা শুনেই আবূ সুফিয়ানের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে হযরত আব্বা (রা)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল।

এই সেই কুরাইশ সরদার আবূ সুফিয়ান যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করা। আজীবন সে ইসলামের বিরুদ্ধে কত ষড়যন্ত্র করেছে, কত নিষ্ঠুরও নির্দয়ভাবে মুসলমানদের নির্যাতন করেছে, তার নেতৃত্বে কত ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু আজকে সে মুসলমানদের ভয়ে অস্থির। ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত জীবন রক্ষার তো আর কোন উপায় নেই। হযরত আব্বাস (রা) তাকে বললেন, তুমি চুপ করে আমার পিছনে খচ্চর পৃষ্ঠে বসে থাক, আমি তোমাকে নবী করীম (সা)-এর নিকট নিয়ে যাব এবং আত্মসমর্পণপূর্বক তোমার জন্য তাঁর খেদমতে নিরাপত্তা প্রদানের আবেদন করব। সকলের চক্ষু এড়িয়ে তাঁরা অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাকে চিনতে পেরে বললেন, এই যে আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলের শত্রু আবূ সুফিয়ান। আজ তোমাকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করব। তিনি দ্রুত রাসূল পাক (সা)-এর নিকট গিয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। ইসলামের চিরশত্রু আবূ সুফিয়ানকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করুন। এদিকে হযরত আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আবূ সুফিয়ানকে নিরাপত্তা দান করলাম।

ইসলামের ঘোর দুশমন আবূ সুফিয়ানকে হাতে পেয়েও রাহমাতুললিল আলামীন না তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন, না বন্দী করলেন, না কোন শাস্তি দানের নির্দেশ দিলেন, বরং তার অতীত পাপের জন্য মর্মবেদনা অনুভব করলেন। তিনি কোমর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ সুফিয়ান! এখনো কি তোমার ভুল ভাঙ্গেনি যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। সে অবনত মস্তকে আরয করল, সত্যিই এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই। আলো-আঁধারের মাঝে দোল খেতে খেতে আবূ

Dhaka University Institutional Repository

সুফিয়ান ঘোষণা করল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ এবং ইসলামের সুশীতল ছায়ায় তিনি আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

মহানবী (সা) তার মনের অস্থিরতা লক্ষ্য করে বললেন, হে আবূ সুফিয়ান! তুমি নিশ্চিত থাক, ভয়ের কারণ নেই। তুমি আমার পক্ষ হতে মক্কায় এ কথা ঘোষণা করে দাও যে, "যে কেউ অস্ত্র পরিত্যাগ করে মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করবে, যে আবূ সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, যে কাবা গৃহে প্রবেশ করবে, যে আপন গৃহে দরজা বন্ধ করে থাকবে তাকে নিরাপত্তা দান করা হলো। আবূ সুফিয়ান কাল বিলম্ব না করে মক্কায় গিয়ে উচ্চস্বরে এ কথা ঘোষণা করে দিলেন। মক্কাবাসী আজ ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের নেতা আবূ সুফিয়ানের আশ্বাসবাণীতে তারা কেউ কা'বা ঘরে, কেউ আপন ঘরে, আবার কেউ আবূ সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করল। এদিকে চারটি দলে বিভক্ত হয়ে মুসলিম বাহিনী মক্কায় প্রবেশ করতে লাগল।

মহানী (সা) হাজুন নামক শিবিরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাঁর কাসওয়া নামক উটে আরোহণ করে হাযার হাযার সাহাবা কর্তৃক পরিবেষ্টিত অবস্থায় পবিত্র কা'বা প্রান্তরে উপস্থিত হন। কা'বা প্রাঙ্গণে সর্বপ্রথম তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। অতঃপর ভক্তি সহকারে পবিত্র কা'বা শরীফের চতুর্দিকে সাতবার তওয়াফ করেন। তখন কা'বা ঘরে তিনশ' ষাটটি মূর্তি রক্ষিত ছিল। তিনি হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলো উল্টিয়ে ফেলেন এবং আল্লাহর বাণী তিলাওয়াত করতে থাকেন - "জাআল হাক্কু ওয়া জাহাকাল বাতিলু, ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা।" সত্য সমাগত, অসত্য তিরোহিত, নিশ্চয়ই অসত্য বিলুপ্ত হবেই। (১৭ : ৮১)

অবশেষে রসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে কা'বাঘরও আশপাশ থেকে মূর্তিগুলো অপসারণ করা হলো এবং কা'বাঘরকে এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য পবিত্র করা হলো।

মক্কার অধিবাসিগণ ভয়ে, অভিমানে এবং অনুতাপে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তারা দলে দলে কা'বা প্রাঙ্গণে সমবেত হলো। নবী করীম (সা) কি বলেন বা কি করেন তা জানানার জন্য ব্যাকুল চিত্তে কা'বা গৃহের দিকে তাকিয়ে আছে। এ সমস্ত তিনি কা'বা গৃহ হতে বের হয়ে আসলেন এবং কা'বা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, "এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকেউ ইবাদতের যোগ্য নেই। তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন। অতঃপর পবিত্র কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করেন - "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক খোদাভীরু। (৪৯ : ১৩)

পুনরায় তিনি মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে কুরাইশগণ! তোমরা কি জান আমি তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করবো? তারা ভীত কণ্ঠে বলল, আমরা আপনার নিকট সদ্ব্যবহার আশা করি। মহানবী (সা) বললেন, যাও তোমরা মুক্ত। এ কথা বলে তিনি চিরশত্রু কুরাইশ ও মক্কার অন্যান্য সমস্ত অধিবাসীকে সাধারণ ক্ষমতা ঘোষণা করে এক কালজয়ী আদর্শ ও দৃষ্টান্ত করেন।[২৫৮]

---

২৫৮. মুহাম্মদ সিরাজুল হক, 'মক্কা বিজয় ও মহানবী (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) স্মরণিকা ১৪২০ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ১৯৯৯, পৃ ৯৪-৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল মুকীত চৌধুরী *মক্কা বিজয় : বহুমাত্রিক তাৎপর্য ও সাফল্য* প্রবন্ধে লিখেছেন :

> রসূল (সা)-এর মহাজীবনের অন্যতম দিক 'সশস্ত্র জিহাদ' এবং এরই এক গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যবহ ঘটনা ফতহ মক্কা বা মক্কা বিজয় এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সাধারণভাবে বহুল ব্যবহৃতদ ও উচ্চারিত 'যুদ্ধ' শব্দটি যথাসম্ভব পরিহারযোগ্য। কারণ, 'যুদ্ধ' ও রসূল (সা)-এর নেতৃত্বে 'সশস্ত্র জিহাদ' তথা 'যুদ্ধ' এক নয়। এ জন্য বদর থেকে শুরু করে মক্কা ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহকে আমরা সশস্ত্র জিহাদই বলবো।
>
> মক্কা বিজয় মানব জাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বিজয়। ইতিহাসের সম্পূর্ণ পট পরিবর্তনকালী ও অনুপম সভ্যতা-সংস্কৃতির স্রষ্টা এ বিজয় সম্পন্ন হয়েছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নেতৃত্বে। প্রতিশোধের উন্মত্ততা যেখানে যে কোন যুদ্ধ জয়ের দর্শন, সেখানে আল্লাহর কালাম কুরআন ও সুন্নাহের বিজয়ে আল্লাহর ইপ্সিত মানবিকতার সর্বোচ্চ সম্মানিত পতাকাবাহী বিশ্বনবী (সা)-এর অনুপম ক্ষমা ও উদারতা তথা সর্বজনীন মানবিকতাই বিকশিত ও উদ্ভাসিত হয়েছে। মক্কা বিজয় সে জন্য চিরন্তন বিজয় আর বহুমাত্রিক সাফল্যে এর মাহাত্ম্য চরিকালোত্তীর্ণ।[২৫৯]

সৈয়দ আলী আহসান *খন্দকের যুদ্ধ ও ইসলামের বিজয়* প্রবন্ধে লেখেন :

> খন্দকের যুদ্ধের সময় মুসলমানদের মধ্যে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। এক রাত্রিতে মুসলমানদের দুটি দল অন্ধকারে পরস্পরের সম্মুখীন হয় এবং একদল অপরদলকে শত্রু মনে করে আক্রমণ করে। এর ফলে কিছু হতাহত হয়। তারপর একদল অপরদলকে পরিচয়ের সাংকেতিক শব্দ দিয়ে আহবান জানালে ভুল ধরা পড়ে এবং অযাতিত সংঘর্ষ থেমে যায়। রসূল (সা.) নিহত মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমাদের জখমগুলো আল্লাহর পথেই হয়েছে। তাই তোমরা শহীদ"।
>
> আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরাইশদের উপর যে ধ্বংস নেমে এসেছিল তার ফলে কুরাইশরা চিরকালের জন্য অথর্ব হয়ে গেল। যে কলংক তাদের স্পর্শ করেছিল, সে কলংক তারা আর কখনো মুছতে পারেনি। কিন্তু আবূ সূফিয়ান পরাজয় স্বীকার করতে রাজী ছিল না। মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে সে একটি চিঠি রসূলের নিকট প্রেরণ করল। সেখানে সে লিখল, "আমি আমার দেবতাদের নামে হলফ করে বলছি, আমি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসেছিলাম চিরকালের জন্য তোমাদের শেষ করে যাব বলে কিন্তু তোমরা যুদ্ধ করনি। পরিখা খনন করে আত্মরক্ষা করেছ। এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা আরবদের রীতিবিরুদ্ধ। আরবরা শুধু জানে বর্শার তীক্ষ্ম ফলা নিক্ষেপ এবং তরবারির আঘাতের শব্দ। আমি আবার আসব, উহুদের মত আরেক দিবসের প্রতিজ্ঞা রইল।"
>
> এ চিঠির উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা.) লিখলেন, "আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু। আল্লাহর রসূল মুহম্মদের পক্ষ থেকে এ পত্র সাখার ইবন হারবের নিকট প্রেরিত হচ্ছে। অতীতে শয়তানের চক্রান্তে পড়ে তুমি আল্লাহর সঙ্গে প্রতারণা করেছ। তুমি লিখেছ, আমাদেরকে পর্যুদস্ত করবার জন্য তুমি সৈন্যসামন্তসহ অভিযানে এসেছিলে। এ সম্পর্কে আমার

---

২৫৯. আবদুল মুকীত চৌধুরী, 'মক্কা বিজয় : বহুমাত্রিক তাৎপর্য ও সাফল্য', *ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) স্মরণিকা ১৪২১ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০০, পৃ ১০১-১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

> একমাত্র বক্তব্য এই শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাদেরকেই সফলতা দান করবেন। হে বনী গালিবের নির্বোধ ব্যক্তি! তোমার জীবনে এমন একদিন আসবে, যখন তুমি স্বচক্ষে দেখবে যে আমি স্বহস্তে লাভ, উজ্জা, আসফ, নায়লা ও হোবলকে ধ্বংস করছি।"[২৬০]

এ ধারার সমৃদ্ধ কয়েটি প্রবন্ধ হচ্ছে : খন্দকের যুদ্ধ[২৬১], রণাঙ্গনে সমর নায়ক মহানবী (সা.)[২৬২], বদর যুদ্ধ বন্দীদের সাথে রাসূল (সা.)-এর আচরণ[২৬৩], মহানবী (সা)-র জীবনাদর্শে যুদ্ধ ও শান্তি[২৬৪], খন্দকের যুদ্ধ ও ইসলামের বিজয়[২৬৫], সমরাঙ্গণে রসূলুল্লাহ (সা.)[২৬৬], হুদায়বিয়ার সন্ধি : একটি প্রকাশ্য বিজয়[২৬৭], ওহুদ যুদ্ধ : ফলাফল ও নৈতিক শিক্ষা[২৬৮], মক্কা বিজয় ও মহানবী (সা)[২৬৯], মক্কা বিজয়[২৭০], হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বায়য়াতুর রিদওয়ান[২৭১], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জিহাদে মানবিকতা ও মানবতা[২৭২], মহানবী (সা)-এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা[২৭৩]।

---

২৬০. সৈয়দ আলী আহসান, 'খন্দকের যুদ্ধ ও ইসলামের বিজয়', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ৯-১৯।

২৬১. জাহিদ হোসেন, 'খন্দকের যুদ্ধ', *মাসিক মদীনা*, ৩৮ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, জুন ২০০২, পৃ ৭৯-৮২।

২৬২. আবদুল ওয়াহিদ, 'রণাঙ্গনে সমর নায়ক মহানবী (সা.)', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ২১৩-২১৬।

২৬৩. ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, 'বদর যুদ্ধ বন্দীদের সাথে রাসূল (সা.)-এর আচরণ', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২০ হি/১৯৯৯, পৃ ২১৭-২২২।

২৬৪. মাওলানা কাজী আবু হোরায়রা, 'মহানবী (সা)-র জীবনাদর্শে যুদ্ধ ও শান্তি', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ২০৩-২০৬।

২৬৫. সৈয়দ আলী আহসান, 'খন্দকের যুদ্ধ ও ইসলামের বিজয়', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ৯-১৯।

২৬৬. মুহাম্মদ সিরাজুল হক, 'সমরাঙ্গণে রসূলুল্লাহ (সা.)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ৭১-৭৬।

২৬৭. ড. এ. বি. এম শামসুদ্দীন আহমদ, 'হুদায়বিয়ার সন্ধি : একটি প্রকাশ্য বিজয়', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ১১১-১১৬।

২৬৮. ড. এ এইচ এম মুজতবা হোসাইন ও আবু তাহের মুহাম্মদ মান্‌জুর, 'ওহুদ যুদ্ধ : ফলাফল ও নৈতিক শিক্ষা', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ৪৭-৫৪।

২৬৯. মুহাম্মদ সিরাজুল হক, 'মক্কা বিজয় ও মহানবী (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) স্মরণিকা ১৪২০ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ১৯৯৯, পৃ ৯৪-৯৮।

২৭০. নুরুল ইসলাম মানিক, 'মক্কা বিজয়', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩১ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১১৩-১২৫।

২৭১. প্রফেসর ড. এ. কে. এম ইয়াকুব হোসাইন, 'হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বায়য়াতুর রিদওয়ান', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৪৪-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরত ও মাদানী জীবন

ইসলামের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার পেছনে রাসূল (সা)-এর হিজরত ও মাদানী জীবনের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হিজরত করে তিনি মদীনায় চলে যান এবং সেখানে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা নবপ্রতিষ্ঠিত এ রাষ্ট্রকে শুধু নিরাপদই রাখেনি; বরং ইসলামের প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে লিখিত আলোচিত কয়েকটি প্রবন্ধের শিরোনাম এখানে উপস্থাপন করা হলো। যথা– মদীনা সনদের বহুমাত্রিক তাৎপর্য[২৭৪], মদীনার নগরজীবনে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)[২৭৫], মহানবী (সা)-এর হিজরত[২৭৬], মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র[২৭৭], হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নেতৃত্বে মদীনা রাষ্ট্র[২৭৮], মহানবী (সা)-এর হিজরতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য[২৭৯], মদীনা সনদের বহুমাত্রিক তাৎপর্য।[২৮০]

---

২৭২. মুহাম্মদ মুসা, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জিহাদে মানবিকতা ও মানবতা', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৮৬-৯১।

২৭৩. ড. হামিদুল্লাহ, মুহাম্মদ লুতফুল হক অনূদিত, 'মহানবী (সা)-এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃ ৬৭-৮৬।

২৭৪. ড. এ. বি. এম শামসুদ্দীন আহমদ, 'মদীনা সনদের বহুমাত্রিক তাৎপর্য', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ৭৮-৮২।

২৭৫. মাওলানা শাহ আবদুস সাত্তার, 'মদীনার নগরজীবনে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মীলাদুন্নবী (সা) ১৪২০, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৯, পৃ ৪৪-৪৬।

২৭৬. মনিরউদ্দীন ইউসুফ, 'মহানবী (সা)-এর হিজরত', *ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) স্মরণিকা ১৪২০ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ১৯৯৯, পৃ ২৯-৪৩।

২৭৭. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, 'মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, পৃ ৯৫-৯৯।

২৭৮. প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, 'হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নেতৃত্বে মদীনা রাষ্ট্র', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ২৩-২৭।

২৭৯. মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, 'মহানবী (সা)-এর হিজরতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১১৮-১২৪।

২৮০. ড. এ. বি. এম শামসুদ্দীন আহমদ, 'মদীনা সনদের বহুমাত্রিক তাৎপর্য', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃ ৯১-৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ ব্যবস্থা

আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ্ কর্তৃক ঘোষিত নিষিদ্ধ কাজ বর্জন ও পরিত্যাগ না করাই হলো সামাজিক অপরাধ। মানুষের নৈতিক জগতের অপরাধ হচ্ছে চরিত্রহীনতা, মিথ্যাচার, পরনিন্দা, বিদ্বেষ, চোগলখুরি, ক্রোধ, প্রতিহিংসা, প্রতারণা, ভণ্ডামি, মুনাফেকি ইত্যাদি অপরাধ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চুরি, রাহাজানি, লুণ্ঠন, দস্যুবৃত্তি, ছিনতাই, ভেজাল মিশ্রণ, ওজনে কম দেয়া, মজুদদারী, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি।

মানবিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও মানুষের সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে অপরাধ হলো – জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার কিংবা ইজ্জতের নিরাপত্তা, অধিকার হরণ, যথা – হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, ব্যভিচার, খুন-খারাবি, দস্যুবৃত্তি ইত্যাদি। মানব রচিত ব্যবস্থাই মানব সমাজের সকল অপরাধের মূল কারণ মানব জীবনের সকল অপরাধ, অন্যায়-আশান্তি, দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণই মানুষের মনগড়া আইন একটি সুবিচারপূর্ণ অপরাধমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধিশালী কল্যাণকর সমাজ কায়েম হতে পারে একমাত্র কুল মাখলুকের মহান স্রষ্টা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের মাধ্যমেই। আল্লাহর আইন সকল কল্যাণের একমাত্র উৎস। মানুষের আইনে ধ্বংস নিশ্চিত। মানুষের সৃষ্টির সূচনালগ্ন মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আ) এর যুগ থেকে মহানবী এর যুগ পর্যন্ত যুগে যুগে, সত্য, ন্যায়, সুবিচারপূর্ণ অপরাধমুক্ত সমাজ একমাত্র আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের মাধ্যমে আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূলগণই প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবনবিধান 'ইসলাম' কায়েম করা ছাড়া কখনও বিশ্বের কোনো দেশে কোনো কালে অন্যায়, অসভ্য ও অপরাধমুক্ত সুসভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজের বর্ণনা সম্বলিত কয়েকটি প্রবন্ধের পর্যালোচনা করা হলো।

প্রফেসর ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন *অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে মহানবী (সা)-এর আদর্শ ও কর্মপন্থা* এ সংক্রান্ত পরিষ্কার ধারণা উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> মহানবী (সা) মক্কায় ১৩ বছর ও মদীনায় ১০ বছর মোট ২৩ বছরের দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে সকল অন্যায়, অসত্য ও বাতিলকে পরাজিত করে এক সুখী-সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ সুসভ্য, অপরাধমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন।
>
> ১. তিনি সর্বপ্রথম শিরক ও কুফরমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন, আল্লাহর সার্বভৌম, শিরকমুক্ত খালিস তাওহীদের বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে কুরআন মজীদের আয়াত আবৃত্তি করেছেন। ইসলামের আকীদার জ্ঞান, ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে চিন্তা-আকীদা বিশ্বাস, চেতনা, অনুভূতি ও প্রত্যয়ের জগৎকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করেছেন। মানুষের মধ্যে প্রত্যয়দীপ্ত একদল মর্দে মুমিন ও মুজাহিদ সৃষ্টি করেছন?
>
> ২. চিন্তা-চেতনা, আকীদা-বিশ্বাসে পরিশুদ্ধ মার্জিত জনশক্তির অন্তরে আখিরাতের জবাবদিহিতার দৃঢ়প্রত্যয় সৃষ্টি করেছে। নিষ্ঠা, দায়িত্বানুভূতি, তাকওয়া ও তাযকিয়ার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নরদীক্ষিত ব্যক্তিদের মার্জিত, উৎকৃষ্ট ও উত্তম পবিত্র চরিত্রের অধিকারী এক শক্তিশালী জামা'আতরূপে গড়ে তুলেছেন।
>
> ৩. সুসংগঠিত জনশক্তিকে একটি উত্তম চরিত্রবান জনশক্তিতে পরিণত করে তাদের মাধ্যমে মক্কী জিন্দেগীকেই অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের কার্য শুরু করেছেন। মৌলিক মানবাধিকার শিক্ষা দিয়েছেন। ব্যক্তি চরিত্রকে সকল নৈতিক ও সামাজিক অপরাধ-প্রবণতা থেকে মুক্ত করেছেন।
>
> ৪. বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আকীদার ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও বুনিয়াদে বলিষ্ঠ প্রত্যয়শীল ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধিত জনশক্তি সৃষ্টি করেন। এ জনশক্তি নিয়ে আল্লাহর নির্দেশে মদীনায় হিজরত করে

Dhaka University Institutional Repository

মদীনা-সনদের ভিত্তিতে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর কোনো রাজনীতিমুক্ত বৈরাগ্যবাদী চিন্তা-চেতনা নয়; বরং আল-কুরআনের পূর্ণাঙ্গ জীববিধানরূপেই তিনি সকল অন্যায়, অসত্য, আল্লাহদ্রোহী বিধানকে অপসারিত করেছেন। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দীন কায়েম করে অপরাধমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে ১৩ বছর তিনি মক্কায় ইসলামের দাওয়াত তাবলীগ ও প্রচারের কার্য করেছেন, কিন্তু তাওহীদের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র কা'বাগৃহের৩৬০টি মূর্তি অপসারিত করা সম্ভব হয়নি। একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া ও মক্কা বিজিত না হওয়ার কারণেই তা হয়েছে। তাঁর মদীনার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাবাঘর থেকে মূর্তি সমূলে উৎপাটন করতে পেরেছে।

৫. অনন্ত আখিরাতের জবাবদিহিতার দৃঢ়প্রত্যয় জীবনের প্রতিটি কথা, পদক্ষেপ, তৎপরতা, অর্থসম্পদ, জ্ঞান, চরিত্র, যোগ্যতা, প্রতিভা, শক্তি-সামর্থ্য চালচলন, আয়-ব্যয় সকল ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। এ দৃঢ় বিশ্বাস, চেতনা ও প্রত্যহের আলোকে জীবন পরিচালনার দায়িত্বের অনুভূতির ভিত্তিতেই মহানবী (সা) একটি অপরাধমুক্ত সমাজ গঠন করার বিপ্লবকে সফল করেছিলেন।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আদর্শ ও স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থার বিকল্প নেই। রাসূল (সা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাপ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধ হলো : পরিবেশ সংরক্ষণে বিশ্বনবী (সা.)-এর আদর্শ[২৮১], অধ:পতিত সমাজের উন্নয়নে মহানবী (সা)-এর যুগান্তকারী সমাজ দর্শন[২৮২], সমাজের সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)[২৮৩], সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)[২৮৪], মানুষের আর্থ সামাজিক ও আত্মিক উৎকর্ষ বিধানে রাসূল (সা)-এর আদর্শ[২৮৫], পরিবেশ সংরক্ষণে মহানবী (সা)[২৮৬], বিশ্বমানব সমাজ ও মহানবী (সা)[২৮৭], সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে মহানবী (সা)-এর আদর্শ এবং ইসলামী সমাজে তার প্রতিলফন[২৮৮], আদর্শ সমাজ গঠনে মহানবী (সা)[২৮৯], পরিবেশ সংরক্ষণে মহানবী (সা)[২৯০]।

---

২৮১. এ কে এম আশরাফুল হক, 'পরিবেশ সংরক্ষণে বিশ্বনবী (সা.)-এর আদর্শ', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২০ হি/১৯৯৯, পৃ ১৯৮-২০০।

২৮২. মুহাম্মদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান, 'অধ:পতিত সমাজের উন্নয়নে মহানবী (সা)-এর যুগান্তকারী সমাজ দর্শন', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ২৯২-২৯৮।

২৮৩. আহমদ আলী, 'সমাজের সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মীলাদুন্নবী (সা) ১৪২০, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৯, পৃ ৭৫-৯৫।

২৮৪. মাওলানা জাকির হুসাইন, 'সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) ১৪২২, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ৩৬-৪৬।

২৮৫. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, 'মানুষের আর্থ সামাজিক ও আত্মিক উৎকর্ষ বিধানে রাসূল (সা)-এর আদর্শ', *ঈদে মিলাদুন্নবী সা. স্মরণিকা ১৪২১ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০০, পৃ ৩৫-৪৭।

২৮৬. প্রফেসর মো: ইউনুছ শিকদার, 'পরিবেশ সংরক্ষণে মহানবী (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী সা. স্মরণিকা ১৪২১ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০০, পৃ ৫৪-৫৬।

২৮৭. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, 'বিশ্বমানব সমাজ ও মহানবী (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ২২-২৬।

২৮৮. মাওলানা রহুল আমীন খান, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে মহানবী (সা)-এর আদর্শ এবং ইসলামী সমাজে তার প্রতিলফন', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৫৪-৬১।

২৮৯. শেখ তোফাজ্জল হোসেন, 'আদর্শ সমাজ গঠনে মহানবী (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১১২-১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ব্যবস্থা

'পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।[২৯১] এটাই ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নাযিলকৃত প্রথম ওহী। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সীরাত অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর সচেতনতা ও অবদান। মহানবী (সা)-এর যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা[২৯২], নবীযুগে শিক্ষাব্যবস্থা[২৯৩], হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সা) প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা[২৯৪], শিক্ষার প্রসার ও বিস্তারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম[২৯৫], হযরত রসূল করীম (সা)-এর শিক্ষা ব্যবস্থা অবারিত জ্ঞানধারা[২৯৬], অজ্ঞতার যুগে শিক্ষা[২৯৭], শিক্ষাক্ষেত্রে মহানবী (সা)-এর অবদান[২৯৮] এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) : শিক্ষা বিস্তার[২৯৯], রাসূল (সা)-এর সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা[৩০০] প্রবন্ধসমূহ অধ্যয়নে নবীযুগে শিক্ষা ব্যবস্থা, হিজরত-পূর্ব যুগে শিক্ষার প্রসারে মহানবী (সা)-এর বাস্তব পদক্ষেপসমূহ, মক্কী জীবনে ব্যবহারিক শিক্ষা, হিজরত-পূর্ব রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর ছাত্র, শিক্ষা, হিজরত পরবর্তী যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা, সুফ্ফার আবাসিক বিদ্যালয়, শিশু ও নারীদের শিক্ষা, কুর'আন ও হাদীস সংকলন, সংস্কৃতি ও কাব্যচর্চা, লেখা শিক্ষাদান

---

২৯০. মোঃ হালিম হোসেন খান, 'পরিবেশ সংরক্ষণে মহানবী (সা)', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩১ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৪৪-১৪৬।

২৯১. আল কুর'আন, ৯৬ : ১-৫।

২৯২. কাজী আবু হোরায়রা, 'মহানবী (সা)-এর যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, পৃ ৭৭-৮৭।

২৯৩. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, 'নবী যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা', মুহাম্মদ লুৎফুল হক অনূ., *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৪৮-১৫৯।

২৯৪. আ. ফ. ম. আবদুল কাদের, 'হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা) প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৩৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃ ২৩-৩২।

২৯৫. মোঃ আবদুল মান্নান, 'শিক্ষার প্রসার ও বিস্তারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৪ হি*, পৃ ৩৮-৪১।

২৯৬. প্রফেসর ড. আহমদ আনিসুর রহমান, 'হযরত রসূল করিম (সা)-এর শিক্ষা ব্যবস্থা : অবারিত জ্ঞানধারা', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, পৃ ৮১-৮৬।

২৯৭. নাসির উদ্দীন মিঝি, মোঃ ইকবাল হোসাইন, 'অজ্ঞতার যুগে শিক্ষা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা* ৪০ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ ৫৭-৬৪।

২৯৮. মুহাম্মদ আবদুর রব আল-বাগদাদী, 'শিক্ষা ক্ষেত্রে মহানবী (সা)-এর অবদান', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা* ১৪২০ হি, পৃ ১৩৮-১৪০।

২৯৯. মোঃ ইসমাঈল মিয়া, 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) : শিক্ষা বিস্তার', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪০ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ ১০৩-১২১।

৩০০ ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, ইলিয়াস আমিনী অনূদিত, 'রাসূল (সা)-এর সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা', *মাসিক মুসলিম জাহান*, বর্ষ ৯ সংখ্যা ১২, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ১৪২০ হিজরী/২৩-২৯ জুন ১৯৯৯, পৃ ৯-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতি, নও-মুসলিমদের শিক্ষা ব্যবস্থা, সরকারী ব্যবস্থাপনায় শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা পরিদর্শক, কারিগরী ও অন্যান্য শিক্ষা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কে সবিস্তার জানা যায়।

কাজী আবু হোরায়র *মহানবী (সা.)-এর যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা* শীর্ষক প্রবন্ধে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শিক্ষা ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন :

হিজরত-পূর্ব মহানবী (সা.) ইসলামের দাওয়াত ও শিক্ষা বিস্তারে যুগপৎ কাজ করেছেন। যে সকল লোক ইসলাম কবুল করতো তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার দরস্‌গাহে পাঠিয়ে দেয়া হতো। কোন কোন সময় তাদের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা হতো। যেমন আল-আকাবার দ্বিথীয় শপথের সময় মদীনার কিছু সংখ্যক ইসলাম ধর্মে বায়'আত হয়। তাদের আবেদনক্রমে মহানবী (সা.) তাদের সঙ্গে মুস'আব ইবন উমায়র নামক প্রশিক্ষক সাহাবী প্রেরণ করেন যাতে তিনি তাদেরকে কুরআন শিক্ষা ও ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতে পারেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ ছিল কয়েকটি জিনিসের মধ্যে। যেমন কুরআনুল করীম শিক্ষা দেয়া, ইসলামের বুনিয়াদী জ্ঞান ও ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া ইত্যাদি। হযরত মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা.) মদীনায় মাত্র বার জন মুসলমানের শিক্ষক ছিলেন।

হিজরত পূর্বযুগে মহানবী (সা.) নিজের জন্য কাতিব নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর একাধিক কাতিব বা সচিব ছিলেন যাঁদের কাজ ছিল ওহী নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা লিপিবদ্ধ করা এবং এগুলোর অনুলিপি প্রস্তুত করে মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণকালে পবিত্র কুরআনের কমপক্ষে তিনটি সুরা তাঁর বোন ফাতেমার গৃহে লিখিতাবস্থায় পেয়েছিলেন। সেখানে তখন খাববাব ইব্‌নু'ল-আরাত নামক জনৈক শিক্ষককেও পেয়েছিলেন। তাঁর বোন ফাতেমাও লেখাপড়া জানতেন।

মহানবী (সা.) পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রসারকল্পে এমন কৌশল অবলম্বন করেন যাতে কুরআনের বাণী প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই যাতে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করে তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে এবং সে মর্মে আমল করতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিলেন। এরই ফলে ইসলাম সার্বজনীনতা লাভ করেছিল। মানুষ ইসলামকে অন্যান্য বাতিল ধর্মের সাথে তুলনা করে ইসলামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হওয়ার সুযাগ পেয়েছিল।

পবিত্র কুরআনে নামাযের মত ফরয ইবাদতের নির্দেশ এসেছে বিরাশি বার। আর বিদ্যা শিক্ষা তথা জ্ঞান-চর্চা সম্বন্ধে অনুপ্রেরণা এসেছে ৯২ বার। তাই মহান প্রভু ও তাঁর রসূল (সা) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য জ্ঞান অর্জন ফরয করে দিয়েছেন। এজন্যই মহানবীর (সা) বিক্ষিপ্তভাবে শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের পাশাপাশি সাফা পর্বতের পাদদেশে যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর বাড়ীতে আল্লাহর প্রথম আদেশ বাস্তবায়নে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন এবং যিনিই ইসলাম গ্রহণ করতেন তাঁকেই ঐ

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। মদীনায় হিজরত করার পূর্ব পর্যন্ত মক্কার যায়দ ইব্ন আরকাম (রা)-এর বাসস্থানই ছিল ইসলামী ইতিহাসের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

সাফা পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এই বাড়ীটি দারুল-আরকাম নামে প্রসিদ্ধ। মহানবী (সা) ছিলেন মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। হযরত আবূ বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা), যায়দ, খাববাব, বেলার (রা)-এর মত মহান সাহাবীগণ ছিলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। এ নির্জন বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে উমর ফারুক (রা), জাফর ইব্নে আবূ তালেব, আম্মার ইব্নে ইয়াসির, খাববার ইব্নে হারিস, হামযা ইব্নে আবদুল মুত্তালিব এবং বারজা আসলামী (রা.) প্রমুখ সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আরকাম (রা)-এর ইন্তিকালের পরও এই বাড়ীটি বহুকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

হিজরতের পর রসূল (সা)-কে মেহমান হিসেবে পাওয়ার জন্য সাহাবাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলো। রসূল (সা.) কারো মনে কষ্ট না দেয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি উটের পিঠে আরোহণ করলেন এবং বললেন, এই উট যেখানে গিয়ে বসবে যেখানেই আমার আপতত অবস্থান হবে। রসূল (সা)-এর উটটি কুবা থেকে কয়েক মাইল উত্তরে যাওয়ার পর এক জায়গায় গিয়ে উটটি বসে পড়ল। রসূল (সা) পাদুকা দ্বারা পুনরায় উপটি চলার ইঙ্গিত দিলে উটটি উঠে দাঁড়াল এবং কয়েক কদম হেঁটে পুনরায় ঐ স্থানে এসে বসে পড়ল। স্থানটি ছিল উন্মুক্ত ময়দান। ছিল নাজ্জার গোত্রের আয়ত্তাধীন। হযরতের পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের মা ছিলেন সেই গোত্রের। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তিনি আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গেই অবস্থান করার সুযোগ পেলেন। এ ময়দানের পাশেই ছিল হযরত আবূ আইয়ূব আনসারীর বাড়ী। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়িহি ওয়া সাল্লাম সাময়িকভাবে তাঁর গৃহে অবস্থান করলেন। পরে তিনি সেই ময়দানটি ক্রয় করে নেন এবং সেখানে মসজিদে নব্বী, সুফফা ও পরিবার-পরিজনদের অবস্থানের জন্য কয়েকটি কক্ষ নির্মাণ করেন। সুফফার এই স্থানটি ইল্ম অর্জনকারী ছাত্রদের আবাসিক বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতো। জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রগণ এখানে জ্ঞান অর্জনের জন্য রসূল (সা)-এর সান্নিধ্যে সর্বদা পড়ে থাকতেন। এই আবাসিক বিদ্যালয়ের কাবার-দাবারও শিক্ষা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান রসূল (সা) নিজেই করতেন।[৩০১]

রাসূল (সা)-এর শিক্ষাধারার বর্ণনা করে অগণিত প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে। এ ধারার কয়েকটি প্রবন্ধ হচ্ছে : নবী করীমের (সা) যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা[৩০২], বিজ্ঞানের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-

---

৩০১. কাজী আবু হোরায়রা, 'মহানবী (সা.) এর যুগে শিক্ষাব্যবস্থা', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ৭৭-৮৭।

৩০২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, 'নবী করীমের (সা) যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা', *মাসিক মদীনা*, ৪২ বর্ষ ১ম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৬, পৃ ৯-১২।

Dhaka University Institutional Repository

এর শিক্ষা[৩০৩], নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশ্বনবী (সা)[৩০৪], শিক্ষার প্রসার ও বিস্তারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম[৩০৫], মহানবী (সা.) এর যুগে শিক্ষাব্যবস্থা[৩০৬], শিক্ষাক্ষেত্রে মহানবী (সা)-এর অবদান[৩০৭], মহানবী (সা)-এর যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা[৩০৮], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা[৩০৯], জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী (সা)[৩১০] ।

---

৩০৩. ড. এম শমশের আলী, 'বিজ্ঞানের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২১হি/২০০০, পৃ ৪৮-৫১ ।

৩০৪. মাওলানা খন্দকার মুশতাক আহমদ শরীয়তপুরী, 'নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশ্বনবী (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মীলাদুন্নবী (সা) ১৪২০, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৯, পৃ ১২৬-১৪৭ ।

৩০৫. মোঃ আবদুল মান্নান, 'শিক্ষার প্রসার ও বিস্তারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৩, পৃ ৩৮-৪১ ।

৩০৬. কাজী আবু হোরায়রা, 'মহানবী (সা.) এর যুগে শিক্ষাব্যবস্থা', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ৭৭-৮৭ ।

৩০৭. মুহাম্মদ আবদুর রব আল-বাগদাদী, 'শিক্ষাক্ষেত্রে মহানবী (সা)-এর অবদান', *ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) স্মরণিকা ১৪২০ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ১৯৯৯, পৃ ১৩৮-১৪১ ।

৩০৮. প্রফেসর ড. এ. কে. এম ইয়াকুব হোসাইন, 'মহানবী (সা)-এর যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩১ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৪৯-৫৪ ।

৩০৯. এ. এম. এম সিরাজুল ইসলাম, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৬৩-৬৬ ।

৩১০. মাওলানা আবদুল লতিফ, 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী (সা)', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৭০-৭৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থব্যবস্থা

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসন ছিল সবচাইতে সুসংহত এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সক্রিয় অংশীদার। মদীনা রাষ্ট্রের আয়, ব্যয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিদর্শন, বাস্তবায়ন এ সবই ছিল অর্থ-প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ। মহানবী (সা) বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে অর্থ-প্রশাসনকে নাগরিকদের দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সংস্থাপন, শিক্ষা ও সভ্যতার সম্প্রসারণ এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্তাপনার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠিত প্রশাসন ও এর সাথে জড়িত সুযোগ্য সাহাবীগণ দক্ষতা, সততা, দুরদর্শিতা, কতর্ব্যনিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে শৃংখলা ও কঠোরতার মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যে বিস্ময়কর প্রতিভার স্পষ্ট ও স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছেন মানব সভ্যতার ইতিহাসে এবং প্রশাসনিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে তা অনন্য অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে চিরদিন অম্লান থাকবে।

প্রিয় নবী (সা)-এর অর্থনৈতিক দর্শন প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক অর্থনৈতিক দর্শন প্রদান করেন তা সকল অসমতা দূরীভূত করে দিয়ে ইনসাফভিত্তিক এক অনন্য সমতার সমাজ কায়েমের পথ নির্দেশ করে। এই দর্শনে ব্যক্তি বা সমাজের ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ন করবার এবং কারো স্বার্থ বিনষ্ট করার সুযোগ নেই। এই দর্শন সৎপথে এবং পরিশ্রম করে সুখী সুন্দর জীবন গড়বার সুযোগ করে দেয় প্রতিটি মানুষকে আর এরি মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পথ খুঁজে পায়।'[৩১১]

মহানবী (সা)-এর অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষিত হওয়া প্রবন্ধসমূহ হল : মহানবী (সা)-এর অর্থনৈতিক দর্শন[৩১২], দারিদ্র বিমোচনে মহানবী (সা)[৩১৩], সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)[৩১৪], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে অর্থব্যবস্থা এবং বর্তমান প্রেক্ষিত[৩১৫], রহমতুল্লিল

---

৩১১. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, 'প্রিয় নবী (সা)-এর অর্থনৈতিক দর্শন', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২০ হি*, পৃ ৬৮।

৩১২. অধ্যাপক আ. ত. ম. মুছলেহউদ্দীন, 'মহানবী (সা)-এর অর্থনৈতিক দর্শন', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, ২০০৩, পৃ ২৭-৩০।

৩১৩. অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের, 'দারিদ্র বিমোচনে মহানবী (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, ২০০৩, পৃ ৭৭-৮২।

৩১৪. মাওলানা আব্দুল হান্নান তরুকখলী, 'সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২৬ হি*, ঢাকা : জা সী ক বা, মে ২০০৫, পৃ ৮৫-৯১।

৩১৫. শাহ আবদুল হান্নান, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে অর্থব্যবস্থা এবং বর্তমান প্রেক্ষিত', *ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, মে ২০০২, পৃ ৪৯-৫২।

Dhaka University Institutional Repository

আ'লামীন (সা)-এর অর্থ-দর্শনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য[৩১৬], মহানবী (সা)-এর দৃষ্টিতে উপার্জন[৩১৭], শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ হযরত মুহাম্মদ (সা)[৩১৮], মহানবী (সা)-র অর্থ প্রশাসন[৩১৯], অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)-এর অবদান[৩২০], মহানবী (সা) প্রবর্তিত অর্থনীতিতে আয় ও সম্পদ বণ্টন[৩২১], দারিদ্র বিমোচনে মহানবী (সা)-এর আদর্শ[৩২২], দারিদ্র্য বিমোচনে মহানবী (সা)-এর শিক্ষা ও আদর্শ[৩২৩] এবং অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)[৩২৪] ।

মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী *জীবিকা অর্জনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ* প্রবন্ধে লিখেছেন :

সম্পদ উপার্জনের ব্যাপারে অন্যান্য মতাদর্শে হালাল-হারামের বিধি-বিধান কিংবা কঠোরতা না থাকলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শে এর বিশদ দিকনির্দেশনা রয়েছে। ইসলামের হালাল-হারামের বিধানের আলোকেই মুসলিম উম্মাহ্র জীবন পরিচালনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

একবার মদীনা শরীফে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। খাদ্যশস্যের ভীষণ অনটন। সে সময় স্বাভাবিকভাবেই খাদ্য শস্যের সংবাদ পেলে নিশ্চয়ই সবার ধাবিত হওয়ার কথা। এ অবস্থা বিরাজকালে এক জুমুআয় রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন খাদ্যশস্য আমদানীকারক একটি ব্যবসায়ী দল মদীনা শরীফে আগমন করল। মুসল্লীগণের অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই খাদ্যশস্যের সংবাদ পেয়ে

---

৩১৬. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, 'রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা)-এর অর্থ দর্শনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, পৃ ৯৩-৯৯।

৩১৭. এম. আবদুর রব, 'মহানবী (সা)-এর দৃষ্টিতে উপার্জন', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪০৭ হি*, পৃ ২৯-৩১।

৩১৮. শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, 'শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১১৪-১২২।

৩১৯. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, 'মহানবী (সা)-র অর্থ প্রশাসন', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হিজরী সংখ্যা, পৃ ২২৭-২৪২।

৩২০. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, 'অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)-এর অবদান', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৯৩-২০০।

৩২১. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, 'মহানবী (সা) প্রবর্তিত অর্থনীতিতে আয় ও সম্পদ বণ্টন', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ১৪২১ হিজরী সংখ্যা, পৃ ৯৯-১০৮।

৩২২. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, 'দারিদ্র বিমোচনে মহানবী (সা)-এর আদর্শ', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৩৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই- সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃ ৬৭-৭৯।

৩২৩. এ. কে. এম. ফজলুল হক, 'দারিদ্র বিমোচনে মহানবী (সা)-এর শিক্ষা ও আদর্শ', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ১৪২১ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৩৪-১৫৬।

৩২৪. ড. এ. এইচ. এম. মোস্তাইন বিল্লাহ, 'অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২১ হি*, জা সী ক বা, পৃ ২৩১-২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রয়ের উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। অবশ্য তখনও খুতবা শোনা ওয়াজিব হয়নি। এদিকে রাসূল (সা) একা দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল করে সতর্ক করে দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভাষণ শোনা বাদ দিয়ে রিযিকের পেছনে ছোটা ঠিক হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ রিযকিদাতা। সুতরাং আল্লাহ্ ও রাসূলকে বাদ দিয়ে রিযিকের চিন্তা করো না। ইরশাদ হয়েছে ঃ

যখন তারা ব্যবসায় ও কৌতুক দেখল, তখন তারা আপনাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে তার দিকে ছুঁটে গেল। বলুন, 'আল্লাহর কাছে যা আছে তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। (সুরা জুমুআ : ১১)।

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, রিযিক সব সময়ই আল্লাহর কাছে কামনা করতে হবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহেই সন্ধান করতে হবে। এটাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ। কেননা জীবিকার সন্ধান করা এবং সৎ পথে উপার্জন করাও ইবাদত। এই ইবাদত যথাযথভাবে আদায় করার প্রয়োজন আল্লাহর উপর নির্ভরতা বা তাওয়াক্কূল। আবার কোন প্রচেষ্টা ছাড়া তাওয়াক্কূল করে বসে থাকাও বোকামি। প্রচেষ্টা থাকতেই হবে। এ বিশ্বকে জীবিকার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বের সবকিছু মানুষের জীবিকার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। যত নিয়ামত আছে তা মানুষের জন্য। চাষবাস থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প স্থাপন প্রভৃতি নির্ধারিত পেশা অবলম্বন করে রিযিকের ব্যবস্থা করা যায় আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

সেই আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের জন্য বিশ্বকে নম্র-মসৃণ বানিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তার স্কন্ধসমূহে (দিগ-দিগন্তে) বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে রিযিক গ্রহণ কর, পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট অবধারিত। (সূরা মূলক :১৫) [৩২৫]

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম *মহানবী (সা)-র অর্থ প্রশাসন* সম্পর্কে লিখেছেন :

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসনের যে দর্শন ছিল তার মৌলিক দিক হল, এ জগতের যাবতীয় সম্পদের পূর্ণ মালিকানা হল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের। মানুষ সেসব সম্পদের আমানতদার - তত্ত্বাবধায়ক। মানুষ আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে এ সম্পদের উপার্জন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের দায়-দায়িত্ব পালন করে। সম্পদের উপর শর্ত সাপেক্ষে মানুষের মালিকানার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সম্পদের ব্যবহার ও ভোগ শুধুমাত্র ইহজাগতিক সুখের জন্য নয়। এর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পরকালীন কল্যাণও নিশ্চিত করতে হবে।

---

৩২৫. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, **জীবিকা অর্জনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ,** অগ্রপথিক ১৪২২ হিজরী

Dhaka University Institutional Repository

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থ প্রশাসনের উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের কল্যাণ সাধন করা। মদীনা রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যে কোন প্রকার জুলুম ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ সংখ্যালঘুরা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের আমানত।[৩২৬]

শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম *শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ হযরত মুহাম্মদ (সা)* সম্পর্কে লিখেছেন :

রাসূল (সা.) প্রবর্তিত অর্থনীতির মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, অস্পষ্টতা নেই। অপরদিকে মানুষ নিজ খেয়ালে যে অর্থনীতি সৃষ্টি করতে চেয়েছে তার কোনটিই নির্ভুল নয়। বিতর্কের উর্ধ্বেও যেতে পারেনি। ফলে সেগুলো কোন স্থিতিশীলতাও পায় না। এর ফলে মানবজাতি তার অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে সমাজে সমাজে, মানুষে মানুষে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি, প্রতারণা, কার্যত দ্বন্দ্ব-সংঘাত।

আমরা রাসূল (সা.)-এর অর্থনৈতিক সীরাতের বিষয়গুলোকে প্রথমত দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত, তিনি কিছু কিছু কাজ নিজে করেছেন এবং করতে বলেছেন, সেসবা কাজ করার তাগিদ সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ মত করতে হয়েছে। এগুলোর মধ্যে যাকাত, সুদহীন ব্যবস্থা, ফিতরা প্রদান, ইত্যাদি। এগুলো অবশ্য পালনীয়। যাকাত ও ফিতরা যথাক্রমে ফরয ও ওয়াযিব। সুদ সরাসরি হারাম। উত্তরাধিকার আইন দ্বারা মৃত বা জীবিত ব্যক্তির সম্পদ তার ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করা একটা বাধ্যতামূলক বিধান। ইসলামী রাষ্ট্রভূক্ত হলে উসর ও খারাজ প্রভৃতি অবশ্যই দেয়। এভাবে ন্যায্য বা বৈধ সম্পদে বায়তুল মাল গড়ে উঠতে পারে। বায়তুর মাল রাষ্ট্রীয় তহবিল - যার মধ্যে সকল মানুষের হক সমান থাকবে। এই সমান অধিকারটি হবে কুরআন নির্দেশিত নিয়মে। রাসূল (সা.) তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রে এসব বিধান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বায়তুলমালের কোন সম্পদ স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.) ও হিসাবের বেশি নিতেন না। যে উদ্দেশ্যে যে অর্থ বায়তুল মালে আসবে - ঠিক সেই উদ্দেশ্যে সে মাল বা অর্থ ব্যয় করতে হবে। আর বাদ্যতামূলক বিধান মেনে চলতেন বলেই দো-জাহানের বাদশা খোদ রাসূল (সা.) পূর্ণ কুটিরে বাস করেছিলেন। অতি সাধারণ জীবন-যাপন করেছিলেন। যা এ যুগের কোন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষেই শুধু নয় - সাধারণ মানুষের পক্ষেও কল্পনা করা অসম্ভব ব্যাপার।

দ্বিতীয় ভাগ হলো দান-খয়রাত বা সাদকা। আজকালকার দুনিয়ার সমগ্র দরিদ্র মুসলিমের মধ্যে অমুসলিমদের বেসরকারি স্বেচ্ছাসংস্থাও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে, ত্রাণ কার্য করে। দেখেশুনে মনে করা স্বাভাবিক যে, মুসলমানরা এসব জানেই না বা ইসলামে এ ধরনের কোন কর্মসূচীই নেই। বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্প, যুদ্ধবিধ্বস্ত বা অন্য কোন কারণে কোথাও কোন ছিন্নমূল উদ্বাস্তু বা শরণার্থীর জন্যে অমুসলিম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ছুটে যায়। মনে হয়, মুসলমানরা যেন কোনো স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করা জানেই না।

---

৩২৬. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, 'মহানবী (সা)-এর অর্থ প্রশাসন, অগ্রপথিক সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হিজরী।

Dhaka University Institutional Repository

অথচ দীনের নবী, নূরের ছবি হযরত মুহম্মদ (সা.) নিজে মসজিদে নববীতে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করেছেন - নিজ হাতে বিতরণও করেছেন। তিনি নিজে যুদ্ধাহত ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যে ত্রাণ বরাদ্দ করেছেন। পৌঁছেও দিয়েছেন। তাঁর জীবনে এবং খলীফাদের জীবনে এমন হাজার হাজার দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেগুলো এ সময়ের মুসলমানদের সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানিয়ে দেয়া উচিত। সেই মদীনার নবীর ত্রাণ ও সাহায্য করার দৃষ্টান্ত সৃষ্টির জন্যে সকল মালদার মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। তাদের বোঝানে উচিত যে, একাজ আল্লাহর রাসূল, সাহাবীগণ এবং খলীফারাও করেছেন। এটা বিধর্মীদের কর্মসূচী নয়। এটা মুসলমানদের কম

এম. আবদুর রব *মহানবী (সা)-এর দৃষ্টিতে উপার্জন* প্রবন্ধে লিখেছেন :

উৎপাদনের প্রতিটি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা ইসলামে ইবাদত এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ না করা হারাম বা গুনাহের কাজ। তবে সব ধরনের দ্রব্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করা ইসলাম ইবাদত নয়। কোন কোন দ্রব্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করা ইবাদত তো নয়ই; বরং হারাম ও গুনাহের কাজ। যেমন মদ, গাঁজা, আফিম ও এই ধরনের অন্যান্য নেশার দ্রব্য। কেননা এটা মানব জাতির জন্য ক্ষতিকর। শুধু মাদক দ্রব্যই নয়। যে দ্রব্যই মানুষের জন্য ক্ষতিকর, সে দ্রব্য উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করা ইসলামে হারাম। এখানে এসেই পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সাথে ইসলামী উৎপাদনের তফাৎ।[৩২৭]

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ *রহমতুল্লিল আ'লামীন (সা.)-এর অর্থ-দর্শনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য* প্রবন্ধে লেখেন :

রাহমাতুল্লিল আলামীনের র্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল, সমাজে সুষম ভারসাম্যপূর্ণ কার্যকরী অর্থব্যবস্থার প্রচলন। পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি মানবরচিত অর্থব্যবস্থার সব ধরনের প্রান্তিকতা ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত পুঁজিপতি ও পুঁজিহীন, ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীন, শাসক-শাসিত, শিল্পমালিক ও শ্রমিক সর্বত্রই ইসলাম এক সুষম ও সম্প্রীতির সম্পর্ক কায়েম করে। রহমতুল্লিল আলামীনের অনুসৃত জীবনব্যবস্থায় আল্লাহ তা'আলায় বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও নবী-প্রদর্শিত রাহনুমায়ীর আশ্রয়ে এমন এক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়- যেখানে শোষণ নেই, নিপীড়ন নেই, নেই দুর্বলকে পিষে খতম করার জঘন্য প্রবণতা। আকাশ এখানে ভারাক্রান্ত হয় না মজলুমানর কাতর আর্তনাদে। অনাবিল আনন্দে বয়ে চলে জীবনপ্রবাহ। চোখ প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে এক নতুন সূর্যের ইংগিতে।[৩২৮]

---

৩২৭. এম. আবদুর রব, **মহানবী (সঃ)-এর দৃষ্টিতে উপার্জন,** সীরাতুন্নবী (সঃ) স্মরণিকা ১৪০৭ হিজরী

৩২৮. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, **রহমতুল্লিল আ'লামীন (সা.)-এর অর্থ-দর্শনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য,** সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হিজরী

Dhaka University Institutional Repository

এ ধারার আরো কয়েকটি প্রবন্ধ হচ্ছে : দারিদ্র বিমোচনে মহানবী (সা)[৩২৯], মহানবীর (সা) অর্থনৈতিক আদর্শ[৩৩০], মহানবী (সা.)-এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ[৩৩১], অর্থনীতিবিদ মহানবী (সা.)[৩৩২], মহানবী (সা)-এর অথনৈতিক সাম্য ও বর্তমান বিশ্ব[৩৩৩], মহানবী (সা)-র অর্থ প্রশাসন[৩৩৪], অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)-এর অবদান[৩৩৫], মহানবী (সা) প্রবর্তিত অর্থনীতিতে আয় ও সম্পদ বন্টন[৩৩৬], মহানবী (সা)-এর দৃষ্টিতে উপার্জন[৩৩৭], সম্পদ উপার্জন ও বন্টনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা[৩৩৮], মহানবী (সা) এর অর্থব্যবস্থার স্বরূপ[৩৩৯], প্রিয়নবী (সা)-এর অর্থনৈতিক দর্শন[৩৪০], মহানবী (সা)-এর অর্থনৈতিক দর্শন[৩৪১] ।

---

৩২৯. অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান পীর, 'দারিদ্র বিমোচনে মহানবী (সা)', *মাসিক মদীনা*, ৪১ বর্ষ ১ম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৫, পৃ ৯৯-১০৩ ।

৩৩০. কাজী মু. মোর্তজা আলী, 'মহানবীর (সা) অর্থনৈতিক আদর্শ', *মাসিক মদীনা*, ৪২ বর্ষ ১ম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৬, পৃ ৩১-৩২ ।

৩৩১. এম. আযীযুল হক, 'মহানবী (সা.)-এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ১৫৭-১৬১ ।

৩৩২. মোছাম্মত কবিতা সুলতানা, 'অর্থনীতিবিদ মহানবী (সা.)', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২০ হি/১৯৯৯, পৃ ২৩৫-২৩৯ ।

৩৩৩. অধ্যাপক হাওলাদার আব্দুর রাজ্জাক, 'মহানবী (সা)-এর অথনৈতিক সাম্য ও বর্তমান বিশ্ব', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ২১৫-২২০ ।

৩৩৪. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, 'মহানবী (সা)-র অর্থ প্রশাসন', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ২২৭-২৪২ ।

৩৩৫. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, 'অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)-এর অবদান', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ১৯৩-২০০ ।

৩৩৬. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, 'মহানবী (সা) প্রবর্তিত অর্থনীতিতে আয় ও সম্পদ বন্টন', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) সংখ্যা ১৪২১, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০০, পৃ ৯৯-১০৮ ।

৩৩৭. এম. আবদুর রব, 'মহানবী (সা)-এর দৃষ্টিতে উপার্জন', *সীরাতুন্নবী স. স্মরণিকা ১৪০৭ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, ১৪ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ ২৯-৩১ ।

৩৩৮. অধ্যাপক আবদুল গফুর, 'সম্পদ উপার্জন ও বন্টনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৩, পৃ ৪৮-৫১ ।

৩৩৯. এম. আযীযুল হক, 'মহানবী (সা) এর অর্থব্যবস্থার স্বরূপ', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ ৪৬-৫০ ।

৩৪০. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, 'প্রিয়নবী (সা)-এর অর্থনৈতিক দর্শন', *ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) স্মরণিকা ১৪২০ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ১৯৯৯, পৃ ৬৮-৭৪ ।

৩৪১. অধ্যাপক আ. ত. ম মুছলেহউদ্দীন, 'মহানবী (সা)-এর অর্থনৈতিক দর্শন', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ২৭-৩২ ।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্র, প্রশাসন, পররাষ্ট্র ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা

১২ রবিউল আউয়াল। খৃষ্টীয় ৬২২ অব্দের ২২ অথবা ২৪ সেপ্টেম্বর। একটি লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে (মদিনা চার্টার) বিশ্বের এই অংশে প্রতিষ্ঠিত হলো জনগণের সম্মতিভিত্তিক, কল্যাণমুখী, গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সৃষ্টি হলো অনবদ্য এক দৃষ্টান্ত। সকল প্রকার স্বৈরাচারমুক্ত। ব্যক্তি প্রভাবের উর্ধ্বে। প্রভূত্ববাদকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণরূপে জনগণের সম্মতিভিত্তিক, চুক্তির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মদিনা রাষ্ট্রের জন্ম হলো। এ রাষ্ট্রের প্রশাসন, পররাষ্ট্র ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা ছিল বিশ্বমানের। রাসূল (সা)-এর প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা সদ্যজাত ইসলামী রাষ্ট্রকে ভবিষ্যত বিশ্ব নেতৃত্বের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া প্রেরণা যোগায়। বিভিন্ন প্রবন্দে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে কতিপয় প্রবন্ধের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো।

ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন *রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদকেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম* প্রবন্ধে লিখেছেন :

> বভিন্ন ধর্মের উপাসনালয়ের মত ইসলামের দৃষ্টিতে মসজিদ শুধু আনুষ্ঠানিক ইবাদতের স্থান নয়। মহানবী (সা) স্বীয় প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নব্বীকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। সে সকল কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কয়েকটি দিক আলোচনা করা হলো ঃ
>
> সালাতের ব্যবস্থা; সরকারী প্রশাসনিক কর্মতৎপরতার কেন্দ্র; মসজিদে নব্বীকে সংসদ ও পরামর্শ ভবন হিসেবে ব্যবহার; শিক্ষালয় ও প্রশিক্ষণ; সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; রাষ্ট্রীয় মেহমানদের সাক্ষাত ও মেহমানদারী; বন্দীদেরকে রাখার ব্যবস্থা; বিচারালয়। মোটকথা মসজিদে নব্বী রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের বহুমুখী প্রয়োজন ও কল্যাণকর কাজে তথা ইসলামী খিলাফতের প্রশাসনিক কার্যালয়রূপেও আবর্তিত হতো।[৩৪২]

প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ *রাষ্ট্রনায়ক রূপে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)* প্রবন্ধে লিখেছেন :

সাধের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে মক্কা থেকে যখন হযরত মুহাম্মদ (সা) ইয়াসরিবে পা রাখলেন, ইয়াসরিবের জনসমষ্টি তাঁকে অভূতপূর্ব পরিবেশে অত্যন্ত আবেগঘন আবহে স্বাগত জানালেন। ইয়াসরিব নগরীর চাবি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে শুধু প্রিয়তম ব্যক্তিত্বরূপে আপন করে নিলেন তাই নয়; এই নগরীর পরিচালনার সকল দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তাঁর নেতৃত্ব অবনত মস্তকে স্বীকার করে নিলেন। এই স্বীকৃতির প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ইয়াসরিবের জনগণ তাদের প্রিয় নগরীর নামকরণ করলেন "মদিনাতুন্নবী' অথবা 'মদিনাতুর রাসূল'।

---

৩৪২. ড. এ. কে. এম ইয়াকুব হোসাইন, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদকেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৩৪-১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনের খ্যাতনামা দার্শনিক জন লক (John Lock) যে তত্ত্বের ভিত্তিতে বলেছিলেন- "সেই রাষ্ট্রই সর্বশ্রেষ্ঠ যা শাসিতদের সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" [The government is the best one which is based on the consent of the government] সেই তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ঘটে মদিনায় ৬২২ খৃষ্টাব্দে এবং এই অনবদ্য সৃষ্টির মূলে ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মনীষী হযরত মোহাম্মদ (সা)। এই নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয় মহানবীর নেতৃত্বে মসজিদে নব্বী। এই মসজিদই ছিল গণতান্ত্রিক মদিনা রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রাণকেন্দ্র। আইন প্রণয়নের কেন্দ্রবিন্দু এবং ন্যায়নীতির শীর্ষস্থান, বিচার বিভাগের শীর্ষস্থান।

মদিনা রাষ্ট্র শুধু মুসলমানদের রাষ্ট্র নয়; নয় কোরাইশদের অথবা মুহাজির বা আনসারদের। এই রাষ্ট্র সকলের ধর্ম এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের। মুসলমান ও ইহুদীর। আদি পৌত্তলিক ও অমুসলিমদের। যে যার ধর্ম অনুসরণ করবে, কিন্তু জাতি হিসেবে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এর প্রতিরক্ষায় সকলেই কৃতসংকল্প। জাতীয়তার প্রকৃতি বিশ্লেষণকারী হাজারে তাত্ত্বিক আজ পর্যন্ত যে সব জটিল ক্ষেত্রে কোন সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হন নি, বিভ্রান্তির চোরাবালিতে পথ হারিয়েছেন, সেক্ষেত্রে মদিনা সনদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রনায়কের নেতৃত্বে কিভাবে সহজ এবং সরল পথে পথপরিক্রমা শুরু করেছিল তা আজও সকলে বিস্ময়াতিভূত হয়ে পর্যালোচনা করে থাকেন।[৩৪৩]

ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া *সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)* প্রবন্ধে লিখেছেন :

> মহানবী (সা) আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদের বাণী প্রচারের মাধ্যমে মানুষের চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং তাকে বাস্তবে রুপ দেয়ার জন্য একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। তিনি বিশৃঙ্খল ও সংক্ষুব্ধ সমাজকে একটি অভিন্ন বিশ্বাস ও একক নেতৃত্বের অধীনে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেন। কিন্তু মক্কার কতিপয় শাসকের বিরোধিতার দরুন প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর নিজ শহরে নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো বিনির্মানে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হন। তখন মক্কাবাসীর কাছে ইসলামের দাওয়াত সেখানকার মুশরিকদের কাছে শুধুমাত্র তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্যই চ্যালেঞ্জ ছিল না, বরং তাদের সামাজিক ও শাসন কাঠামোর জন্যও ছিল হুমকি স্বরুপ। তাই তারা সর্বশক্তি নিয়ে নবীজীর আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্যমরিয়া হয়ে ওঠে। এরুপ প্রতিকুল পরিবেশেও তিনি ইসলামী আদর্শের মদ্যে এমন এক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আবেদন প্রচার করেন যার ফলশ্রুতিতে প্রবল আধ্যাত্মিক অনুরাগ ও প্রেরণায় উজ্জীবিত এবং তাওহীদ প্রচারে নিবেদিত একটি সত্যনিষ্ঠ ও আত্মত্যাগী জনগোষ্ঠী গঠনে সমর্থ হন।

---

৩৪৩. প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, 'রাষ্ট্রনায়করূপে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৫-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সা) তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবেই একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মক্কা শরীফে থাকা অবস্থায়ই বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মদীনায় হিজরত করে মহানবী (সা) ইসলামী বিধি-বিধানের উপর ভিত্তি করে একটি জনকল্যাণময় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বুনিয়াদ। আর রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন এ রাষ্ট্রের প্রধান। রাষ্ট্র প্রধান তিনি মদীনায় বসবাসকারী সকলের সাথে চুক্তি করেন এবং তাতে ধর্ম ও জ্ঞান-মালের উপর তাদের অধিকার স্বীকার করে নেন। এ চুক্তি 'মদীনা চার্টার' নামে পরিচিত। যাকে সামাজিক বিজ্ঞানীরা বিশ্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংবিধান বলে গণ্য করেন।

আধুনিককালে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে 'সুশাসন' (Good Governance) কথাটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আর সুশাসনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে যেসবের কথা বলা হয় তা হচ্ছে ঃ জাতীয় ঐক্য, সাংবিধানিকতা, গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, মানব উন্নয়ন, সামাজিক কল্যাণ ও সুবিচার, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব, নারীর মর্যাদা, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি। সুশাসনের ধারণা ইদানীং কালের হলেও মহানবী (সা) প্রায় সেড় হাজার বছর পূর্বে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সুশাসনের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তা আজকের বহু আধুনিক রাষ্ট্রেও তা খুঁজে পাওয়া যায় না।[৩৪৪]

ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন *সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ (সা)-এর অবদান* প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সাম্প্রদায়িকতা ও রসূলুল্লাহ (সা)-র নীতি; বদর যুদ্ধোত্তর উদারতা; মক্কা বিজয়োত্তর সম্প্রীতি ও সংহতির দৃষ্টান্ত; গণতন্ত্র; জাতীয় ঐক্য; জাতীয় ঐক্যের বিভিন্ন দিক; সমকালীন বিশ্বে সম্প্রীতি ও ঐক্য গঠন – এসব শিরোনামে তিনি আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।[৩৪৫]

আলফাজ আনাম মাসুম *মহানবীর (সা) প্রশাসন ব্যবস্থা* প্রবন্ধে লেখেন :

> মহানবী (সা) একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নেতৃত্ব প্রদান করেন। এই রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল মদীনা। মদীনায় মসজিদ ছিল সকল কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র বা সচিবালয়। সর্বোচ্চ শাসক হিসাবে মহানবী (সা) ছিলেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। মহানবী (সা) কুরআনের আলোকে দেশ পরিচালনা করতেন। যেখানে কুরআন নীরব, সেখানে তার ফয়সালাই ছিল চূড়ান্ত। দেশ পরিচালনায় সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন কুরআনের আলোকে আইন প্রণেতা, প্রশাসক, প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারক এবং প্রশাসন যন্ত্রের প্রধান। মাসজিদ-উন-নববীতে বসে তিনি রাষ্ট্র পরিচারনা করতেন। বিদেশী দূতদের সাথে সাক্ষাত প্রদান করতেন। পত্র বিনিময়ও সন্ধি স্বাক্ষর করতেন। গভর্ণর ও কর

---

৩৪৪. ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, 'সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৮৩-৮৬।

৩৪৫. ড. এ. কে. এম ইয়াকুব হোসাইন, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্য গঠনে মুহাম্মদ (সা)-এর অবদান', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ৮৭-১০১।

Dhaka University Institutional Repository

আদায়কারীদের নির্দেশ পত্র জারী করতেন। মহানবী (সা) রাষ্ট্র পরিচালনার প্রাথমিক স্তর হিসাবে একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। প্রাথমিক আমলের এই কাঠামোকে কেন্দ্র করে একটি সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

মোহাম্মদ সামাউন মোল্লা *মহানবী (সা)-এর পররাষ্ট্র নীতি এবং বর্তমান প্রেক্ষিত* প্রবন্ধে লিখেছেন :

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শুধুমাত্র একজন ধর্ম প্রচারকই ছিলেন না, বরং একাধারে তিনি ছিলেন একজন সফল রাজনীতিবিদ, একজন খ্যাতিমান সমাজ সংস্কারক, অর্থনীতিবিদ এবং একজন আদর্শ শিক্ষক। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন সফল ও ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনায়ক। রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে তিনি শুধু নিজের সীমানার মধ্যেই তাঁর রাষ্ট্রীয় কাজকর্মকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর রাষ্ট্রীয় কাজকর্মকে প্রসারিত করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে নিজ রাষ্ট্রের সদ্ভাব এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনেও তিনি ছিলেন উদার। যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন সফল কূটনীতিবিদ। মদীনা রাষ্ট্র গঠনের পরপরই মহানবী (সা) একটি সুস্পষ্ট পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন। মদীনা রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় তিনি নিম্নোক্ত নীতি অনুসরণ করত। প্রথমত ঃ চুক্তিনামার প্রতি সম্মান প্রদর্শন; দ্বিতীয়ত ঃ আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার ও নিয়ম-নীতি মানিয়া চলা; তৃতীয়ত ঃ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সীমানার প্রতি সম্মান প্রদর্শন; দীনের সার্বিক বিজয়ের প্রচেষ্টা।[৩৪৬]

মুহাম্মদ নূরুল আমীন *মুহম্মদ (সা) কূটনীতিবিদদের আদর্শ* প্রবন্ধে লিখেছেন :

কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণে ও সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে কূটনীতির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কূটনৈতিক বিজয় ও পরাজয়ে অভিজ্ঞ মহল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। বর্তমানে কূটনীতি বলতে আমরা যা বুঝি তা হল ছলে বলে কৌশলে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করা। বর্তমানে এ ধরনের সফলতাকে কূটনৈতিক বিজয় বলা হয়, কিন্তু ঘৃণাক্ষরেও ইসলাম এই ধাঁচের কূটনীতিকে সমর্থন করে না। মহানবীর (সা)-এর আশ্চর্য জীবনী শক্তির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে তিনি যেভাবে সহজ-সরল ও মানবিক মূল্যবোধ উদ্বুদ্ধ হয়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা কারো পক্ষে কখনো সম্ভব হতে পারে না। এ সকল দূরদর্শী ও কূটনৈতিক পদক্ষেপে তিনি ১০০% সফল হয়েছেন।

কুরাইশরা যখন দেখতে পেলো মুহাম্মদ (সা)-এর কাজের প্রতি আবু তালিবের প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে। তখন তারা মুহাম্মদ (সা) সমীপে এক কূটনৈতিক মিশন পাঠানোর পরিকল্পনা করলো। কথামতো ওতবা নিরব রীয়াকে পাঠানো হলো। রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে এসে সে প্রস্তাব করলো, মুহাম্মদ 'সত্যি করে বলোতো', তুমি কি চাও? মক্কার শাসনক্ষমতা কিংবা কোনসুন্দরী মেয়ে অথবা ধন-সম্পত্তি? আমরা এসব তোমাকে দিতে রাজি আছি। তার বিনিময়ে হলেও তুমি ওসব বকাবকি করো না।' খুব গম্ভীর ও দৈর্ঘ্যসহকারে প্রিয় নবী (সা) ওতবার প্রস্তাব শুনলেন। এতবড় জঘন্য প্রস্তাবে তিনি

---

৩৪৬. মোহাম্মদ সামাউন মোল্লা, 'মহানবী (সা.)-এর পরারাষ্ট্র নীতি ও বর্তমান প্রেক্ষিত', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২০ হি/১৯৯৯, পৃ ২৪-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তেজিত হননি, বরং সহজ-সরল ভাষায় স্বীয় লক্ষ্য সম্পর্কীয় কতিপয় কালামুল্লাহর আয়াত পাঠ করে শুনালেন। রাসূলুল্লাহের (সাঃ) মুখনিঃসৃত মনমোহনী আয়াত শুনে ওতবা মুগ্ধ হল। কোরেশদের কাছে ফিরে গিয়ে সে তাঁর কূটনৈতিক মিশনের ফলাফল প্রকাশ করতে গিয়ে বলল। মুহাম্মদ আমাকে যে কথাগুলো শুনিয়েছে যা না কবিতা ছিল, না অন্য কিছু। আমার মতে তাঁকে তাঁর নিজের উপরই ছেড়ে দেয়া উচিত। যদি সে বিজয়ী হয় তাহলে সমগ্র আরব পদানত করবে, এতে তোমাদেরও সম্মান বাড়বে। আর যদি তা না হয় আরবরা নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে।" কেউ তার এ মত সমর্থন করলো না।

মক্কা বিজয়ের দিন তার কূটনৈতিক নীতি আজো বিশ্ববাসীকে অবাক করে। দীর্ঘ একযুগ ধরে তারা অমানুষিক অত্যাচার করেছে, তাদের নিগৃহীত করেছে, হত্যা করেছে নিরীহ মুসলমানদের। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন তিনি খোঁদ শত্রু আবূ সুফিয়ানকে বললেন যাও, আজ তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। অন্যদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। রোষের পরিবর্তে প্রেমপ্রীতি ও মহত্ত্ব দিয়ে তিনি সেদিন জয় করলেন। এভাবেই তিনি মানবীয় কূটনীতির মাধ্যমে দেশ জয়ের চেয়ে দেশবাসীদের মনের উপর মনস্তাত্ত্বিকভাবেই আধিপত্য কায়েম করেছেন স্থায়ীভাবে।[৩৪৭]

অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ *রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কূটনৈতিক দূরদর্শিতা* প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক মহানবী (সা)-র প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, কৃশল ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর বিচক্ষণতা ও নিপুণতার কতিপয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।[৩৪৮]

মুহাম্মদ নূরুল আমীন হাবিলদার *আমর ইবনে হাযমকে প্রেরিত প্রিয়নবী (সা)-এর শেষ নির্দেশনামা* লিখেছেন :

মহানবী (সা) তাঁর নবুয়তের শেষ দশ বছর বিভিন্ন শহর এবং প্রদেশে বেশ কয়েকটি ফরমান বা নির্দেশনামা প্রেরণ করেছিলেন। প্রধানত সংশ্লিষ্ট শহরে ইসলামী রাষ্ট্রের গভর্ণর নিয়োগের সময় তিনি এটা দিতেন। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রতিবেশী প্রদেশের প্রশাসকের কাছে তিনি দূত মারফত ইসলাম গ্রহণের আহবান সম্বলিত চিঠিপত্রাদি প্রেরণ করেছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের বিজিত অঞ্চলসমূহে তিনি যে গভর্ণর নিয়োগ করতেন তাদের উদ্দেশ্যে কিছু না কিছু আদে-নির্দেশ প্রদান করতেন। রাষ্ট্রের বুনিয়াদ নির্মাণ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার আদর্শ হিসেবে এই সকল নির্দেশের বিশেষ

---

৩৪৭. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, 'মুহাম্মদ (সা) কূটনীতিবিদদের আদর্শ', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২০ হি*, জা সী ক বা, পৃ ১৭৪-১৭৬।

৩৪৮. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কূটনৈতিক দূরদর্শিতা', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৭০-১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

মূল্য রয়েছে। মহানবী (সা) তাঁর ইন্তেকালের কয়েক মাস পূর্বে শেষ নির্দেশনামা প্রণয়ন করেন। আমর বিন হাযম (রা)-কে ইয়ামেনে প্রেরণের সময় এটি তার হাতে দেন।[৩৪৯]

সমাজ, সভ্যতা ও রাষ্ট্র পরিচালনার বিকাশে এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বনবী হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর অবদানের মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। এ বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ হল : মহানবী (সা)-এর ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা[৩৫০], রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মদ (সা)[৩৫১], রাষ্ট্রনায়করূপে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)[৩৫২], মহানবী (সা)-এর প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা[৩৫৩], প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদেশ নীতি[৩৫৪], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশাসনিক ও পররাষ্ট্রনীতি[৩৫৫], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুটনৈতিক দূরদর্শিতা[৩৫৬], আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্বনবী (সা)[৩৫৭], প্রিয়নবী (সা)-এর পররাষ্ট্রনীতি[৩৫৮], মহানবী (সা)-এর পররাষ্ট্রনীতি এবং বর্তমান প্রেক্ষিত[৩৫৯], মুহাম্মদ (সা) কূটনীতিবিদদের আদর্শ[৩৬০], যতটা ধর্মীয় নেতা ততোধিক রাজনৈতিক নেতারূপে মহানবী (সা)[৩৬১] এবং

---

৩৪৯. মুহাম্মদ নূরুল আমীন হাবিলদার, 'আমর ইবনে হাযমকে প্রেরিত প্রিয়নবী (সা)-এর শেষ নির্দেশনামা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হি, পৃ ২৭৬-২৮০।

৩৫০. মাওলানা ইমদাদুল হক, 'মহানবী (সা)-এর ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮ হি, পৃ ৮৯-৯৯।

৩৫১. চৌধুরী শামসুর রহমান, 'রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মদ (সা)', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২১ হি*, পৃ ৩২-৩৭।

৩৫২. প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, 'রাষ্ট্রনায়করূপে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, ২০০৩, পৃ ১৫-১৭।

৩৫৩. অধ্যাপক মোঃ আলী এরশাদ হোসেন আজাদ, 'মহানবীর (সা) প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২০ হি*, পৃ ১৭০-১৭৩।

৩৫৪. নূরুল আমিন জাওহার, 'প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদেশ নীতি', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৪ হি*, পৃ ৭৪-৭৯।

৩৫৫. অধ্যাপক মোঃ আবদুল মান্নান, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশাসনিক ও পররাষ্ট্রনীতি', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৭৭-১৮১।

৩৫৬. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুটনৈতিক দূরদর্শিতা', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৭০-১৮৩।

৩৫৭. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্বনবী (সা)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭*, পৃ ১১৫-১১৮।

৩৫৮. মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম, 'প্রিয়নবী (সা)-এর পররাষ্ট্রনীতি', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২০ হি*, পৃ ১৭-২৩।

৩৫৯. মোহাম্মদ আশউন মোল্লা, 'মহানবী (সা)-এর পররাষ্ট্রনীতি এবং বর্তমান প্রেক্ষিত', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২০ হি*, জা সী ক বা পৃ ২৪-২৭।

৩৬০. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, 'মুহাম্মদ (সা) কূটনীতিবিদদের আদর্শ', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২০ হি*, জা সী ক বা, পৃ ১৭৪-১৭৬।

৩৬১. অধ্যাপক স. ম. আবদুল মজিদ কাজিপুরী, 'যতটা ধর্মীয় নেতা ততোধিক রাজনৈতিক নেতারূপে মহানবী (সা)', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২১ হি*, জা সী ক বা, পৃ ৬৬-৮২।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি ও মহানবী (সা)-এর আদর্শ[৩৬২], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা[৩৬৩], মহানবীর (সা) জীবনে রাজনীতি[৩৬৪], আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার পথিকৃত হযরত মুহাম্মদ (সা)[৩৬৫], হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর রাষ্ট্রীয় জীবন[৩৬৬], রাসূলুল্লাহর আদর্শ ও কল্যাণ রাষ্ট্র[৩৬৭], বিদায় হজ্জের ভাষণ ও আধুনিক বিশ্ব[৩৬৮], মদীনা সনদ : বিশ্ব মানচিত্রের প্রথম সংবিধান[৩৬৯], মহানবীর (সা.) প্রশাসন ব্যবস্থা[৩৭০], মহানবী (সা.)-এর পরারাষ্ট্র নীতি ও বর্তমান প্রেক্ষিত[৩৭১], বিশ্বনবীর (সা.) রাষ্ট্রীয় পত্রাবলী[৩৭২], মহানবীর (সা.) প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা[৩৭৩], মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ : আজকের প্রেক্ষিত[৩৭৪], রাষ্ট্রনায়ক মুহম্মদ (সা.)[৩৭৫], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুটনৈতিক দূরদর্শিতা[৩৭৬], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর

---

৩৬২. মাওলানা মোঃ নজরুল ইসলাম, 'রাজনীতি ও মহানবীর (সা) আদর্শ', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২১ হি*, জা সী ক বা, পৃ ১৫০-১৫৭।

৩৬৩ মাওলানা মহিউদ্দিন খান, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা', *মাসিক মুসলিম জাহান*, বর্ষ ৯ সংখ্যা ১২, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ১৪২০ হিজরী/২৩-২৯ জুন ১৯৯৯, পৃ ৪-৫।

৩৬৪ শফিকুল ইসলাম উজ্জ্বল, 'মহানবীর (সা) জীবনে রাজনীতি', *মাসিক মুসলিম জাহান*, বর্ষ ৯ সংখ্যা ১২, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ১৪২০ হিজরী/২৩-২৯ জুন ১৯৯৯, পৃ ৭১।

৩৬৫. মুহাম্মদ নাসের উদ্দিন, 'আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার পথিকৃত হযরত মুহাম্মদ (সা)', *মাসিক মুসলিম জাহান*, বর্ষ ৯ সংখ্যা ১২, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ১৪২০ হিজরী/২৩-২৯ জুন ১৯৯৯, পৃ ২২-২৬।

৩৬৬. মাওলানা আবদুল কাদির আল-হাসান, 'হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর রাষ্ট্রীয় জীবন', *মাসিক মদীনা*, ৩৭ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, জুন ২০০১, পৃ -৭৬-৮০।

৩৬৭. মুহিউদ্দীন খান, 'রাসূলুল্লাহর আদর্শ ও কল্যাণ রাষ্ট্র', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ৯২-৯৫।

৩৬৮. বিচারপতি মোস্তাফা কামাল, 'বিদায় হজ্জের ভাষণ ও আধুনিক বিশ্ব', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ১১৮-১২১।

৩৬৯. মুহাম্মদ আনিসুর রহমান, 'মদীনা সনদ : বিশ্ব মানচিত্রের প্রথম সংবিধান', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ১৯৬-১৯৯।

৩৭০. আলফাজ আনাম মাসুম, 'মহানবীর (সা.) প্রশাসন ব্যবস্থা', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ২০৯-২১২।

৩৭১. মোহাম্মদ সামাউন মোল্লা, 'মহানবী (সা.)-এর পরারাষ্ট্র নীতি ও বর্তমান প্রেক্ষিত', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২০ হি/১৯৯৯, পৃ ২৪-২৭।

৩৭২. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, 'বিশ্বনবীর (সা.) রাষ্ট্রীয় পত্রাবলী', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২০ হি/১৯৯৯, পৃ ১০৬-১১৭।

৩৭৩. অধ্যাপক মোঃ আলী এরশাদ হোসেন আজাদ, 'মহানবীর (সা.) প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২০ হি/১৯৯৯, পৃ ১৭০-১৭৩।

৩৭৪. আহমদ আবদুল কাদের, 'মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ : আজকের প্রেক্ষিত', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২০ হি/১৯৯৯, পৃ ১৮৭-১৯৩।

৩৭৫. চৌধুরী শামসুর রহমান, 'রাষ্ট্রনায়ক মুহম্মদ (সা.)', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২১হি/২০০০, পৃ ৩২-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক ও পররাষ্ট্র নীতি[৩৭৭], আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক হযরত মুহাম্মদ (সা)[৩৭৮], সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্য গঠনে মুহাম্মদ (সা)-এর অবদান[৩৭৯], বিচারক হিসাবে নবী করীম (সা)-এর ভূমিকা[৩৮০], প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিদেশনীতি[৩৮১], আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্বনবী (সা.)[৩৮২], রাষ্ট্রনায়করূপে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)[৩৮৩], সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)[৩৮৪], মহানবী (সা)-এর পররাষ্ট্রনীতি বিভিন্ন রাজন্যের কাছে তাঁর পত্রাবলী[৩৮৫], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদকেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম[৩৮৬], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কর্মসূচী : এক অনন্য বিপ্লব[৩৮৭], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিকল্পনা ও কর্ম-কৌশল[৩৮৮]।

---

৩৭৬. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুটনৈতিক দূরদর্শিতা', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ১৭০-১৭৫।

৩৭৭. অধ্যাপক মোঃ আবদুল মান্নান, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশাসনিক ও পররাষ্ট্র নীতি', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ১৭৭-১৮৮।

৩৭৮. আ. ন. ম আবদুর রাজ্জাক, 'আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক হযরত মুহাম্মদ (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ২৯৯-৩০৩।

৩৭৯. ড. এ. কে. এম ইয়াকুব হোসাইন, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্য গঠনে মুহাম্মদ (সা)-এর অবদান', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ৮৭-১০১।

৩৮০. মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান, 'বিচারক হিসাবে নবী করীম (সা)-এর ভূমিকা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) সংখ্যা ১৪২১, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০০, পৃ ৫৪-৫৭।

৩৮১. নূরুল আমিন জাওহার, 'প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিদেশনীতি', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৩, পৃ ৭৪-৮২।

৩৮২. শেখ আবদুর রহীম, 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্বনবী (সা.)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ১১৫-১১৮।

৩৮৩. প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, 'রাষ্ট্রনায়করূপে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৫-১৭।

৩৮৪. ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, 'সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৮৩-৮৬।

৩৮৫. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, 'মহানবী (সা)-এর পররাষ্ট্রনীতি বিভিন্ন রাজন্যের কাছে তাঁর পত্রাবলী', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৮৪-৯২।

৩৮৬. ড. এ. কে. এম ইয়াকুব হোসাইন, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদকেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৩৪-১৩৮।

৩৮৭. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কর্মসূচী : এক অনন্য বিপ্লব', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ৯০-৯২।

৩৮৮. উবায়দুর রহমান খান নদভী, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিকল্পনা ও কর্ম-কৌশল', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ১৪০-১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কারক

রাসূলুল্লাহ (সা) বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক। তিনি নতুন একটা জাতি গঠন করেছিলেন, জাতীয় চরিত্রের সংস্কার এবং সংশোধন করে পতনোন্মুখ জাতিকে নব জীবনের স্পন্দন এনে দিয়েছিলেন; পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত, আদর্শচ্যুত, দিশেহারা জাতিকে সত্যের সন্ধান দিয়েছিলেন। মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক হযরত রাসূলে করীম (সা)[৩৮৯] এবং মুহাম্মদ এবাদুল্লাহ'র মহান সমাজ সংস্কারক মহানবী (সা)[৩৯০] প্রবন্ধে বিষয়টির সারগর্ভ আলোচনা রয়েছে। সমাজ সংস্কারক হিসেবে মহানবী (সা)[৩৯১] প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমাজ সংস্কারের চিত্র ফুটে উঠেছে। এ ধারার আরো কয়েকটি প্রবন্ধ হচ্ছে : মূর্তি সংস্কৃতি অপসারণে রাসূল (সা)[৩৯২], সমাজ সংস্কারক হিসাবে মহানবী (সা)[৩৯৩], সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক হযরত রসূলে করীম (সা)[৩৯৪], মহান সমাজ সংস্কারক মহানবী (সা)[৩৯৫]।

---

৩৮৯. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক হযরত রসূলে করীম (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ৭-১৩।

৩৯০. মুহাম্মদ এবাদুল্লাহ, 'মহান সমাজ সংস্কারক মহানবী (সা)', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল ২০০৭, পৃ ১৪৫-১৪৮।

৩৯১. মোঃ জিল্লুর রহমান, 'সমাজ সংস্কারক হিসাবে মহানবী (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮ হিজরী সংখ্যা, পৃ ২৫৫-২৬০।

৩৯২. ড. আ. ছ. ম তরিকুল ইসলাম, 'মূর্তি সংস্কৃতি অপসারণে রাসূল (সা)', *মাসিক মদীনা*, ৩৭ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, জুন ২০০১, পৃ ৬২-৬৩।

৩৯৩. মো: জিল্লুর রহমান, 'সমাজ সংস্কারক হিসাবে মহানবী (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ২৫৫-২৬০।

৩৯৪. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক হযরত রসূলে করীম (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ৭-১৩।

৩৯৫. মুহাম্মদ এবাদুল্লাহ, 'মহান সমাজ সংস্কারক মহানবী (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৪৫-১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

উম্মাহ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়তী জীবনের সার্থকতা হল তাঁর হাতে গড়ে ওঠা উম্মত। সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য সবচেয়ে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ হিসেবে একটা জামাআত গড়ে তোলার জন্যই তিনি তাঁর শক্তি, সামর্থ্য, শ্রম, প্রজ্ঞা ও মেধা ব্যয় করেছিলেন। যে উম্মাহ গড়ে গেলেন মহানবী (সা)[৩৯৬] এবং নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ (সা)[৩৯৭] প্রবন্ধ দুটিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মাহ গঠন প্রসঙ্গে এখানে এ বিষয়ক প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা হলো।

মিয়া মুহাম্মদ আইয়ূব *বর্তমান বিশ্ব ও মুসলিম উম্মাহ্‌র সংহতি* প্রবন্ধে লিখেছেন :

ইসলামের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানব প্রেম ও মানব ঐক্যের পয়গাম নিয়ে পড়ে তুলেছিলেন একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ। তাওহীদের চেতনার উদ্দীপ্ত তাঁর অনুসারীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল মুসলিম উম্মাহ। তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

> 'এমনিভাবেই হে মুসলিমগণ, তোমাদেরকে এক সুসংবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ, উত্তম, উন্নত জনগোষ্ঠিরূপে, গড়ে তুলেছি যেন তোমরা বিশ্ববাসীর কল্যাণ ও মুক্তির পথ দেখাতে পারো এবং রসূল কার্যতঃ হতে পারেন তোমাদের আদর্শ।' (আল-বাকারা : ১৪৩)

আল্লাহর এই বাণীর ভিত্তিতে সেদিন একটি সুসংহত মুসলিম উম্মাহ সংগঠিত হয়েছিল এবং গোত্রীয় কৌলিন্য, বর্ণবাদ বা অন্য কোন প্রকার বৈষম্য বা ভেদাভেদ স্থান পায়নি। জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত আরববাসী শান্তি ও সম্প্রীতির এক মহান সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার এক বিরাট অনুগ্রহ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

> 'তোমরা স্মরণ কর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা যা তিনি তোমাদের উপর বর্ষণ করেছেন। তোমরা তো পরস্পরের জানের দুশমন ছিলে; পরে তিনিই তোমাদের দীলে পারস্পরিক পরম হৃদ্যতা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তোমরা আল্লাহরই অনুগ্রহক্রমে পরস্পর ভাই হয়ে গেলে; অথচ তোমরা এক অগ্নি-গহবরের মুখে অবস্থান করছিলে; তিনি তোমাদেরকে তা থেকে নিস্কৃতিদিয়েছেন।' (আল ইমরান : ১০৩)

ইসলাম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি যাতে চির অটুট থাকে সে জন্য আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন :

> 'তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'

মুসলিম উম্মাহর অনৈক্য ও পারস্পরিক বিভেদের পরিণতি সম্পর্কে আল কুরআনে আরো বলা হয়েছে :

---

৩৯৬. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, 'যে উম্মা গড়ে গেলেন মহানবী (সা)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি*, পৃ ৩৫-৩৭।

৩৯৭. মুহম্মদ বরকতুল্লাহ্‌, 'নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ (সা)', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২১ হি*, জা সী ক বা, পৃ ৩৮-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

> 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না; তা করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করো, আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সংগে আছেন।' (আনফাল : ৪৬)

মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই-আল কুরআনের এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে মহানবী (সা) বললেন, 'যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ নয়, সে মু'মিন নয়।'

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ফলে সেদিন সীসা-ঢালা প্রাচীরের ন্যায় যে সুসংবদ্ধ সমাজ গড়ে উঠেছিল তাই ছিল মানব ইতিহাসের সর্বোত্তম সমাজ ও রাষ্ট্র। রসূলের (সা.) গড়া সেই ইসলামী রাষ্ট্র খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল ও তৎপরবর্তীকালে সুদূর আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করে। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদান করে। মুসলমানদের এই অগ্রাভিযান প্রক্রিয়ায় ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠে। তৎকালীন দুই বৃহৎ শক্তি বাইজান্টাইন ও সাসানীয় সাম্রাজ্য মুসলমানদের কাছে পরাভূত হবার পর থেকে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের চক্রান্ত জোরদার হতে থাকে।

বিশ্বব্যাপী মুসলিম ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার পথে যেমন বিরাট অন্তরায় পরিলক্ষিত হচ্ছে, তেমনিভাবে মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও একাত্মতারও বিরাট অভাব রয়েছে। তার প্রধান কারণ হলো-পরাধীন আমলে বিদেশী শাসকদের প্রবর্তিত বস্তুবাদী শিক্ষা ও মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যকার অসংগতি। একদল পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করে সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে সংস্কার করতে চায়, অপর পক্ষ ইসলামী আদর্শের আলোকে অন্ধ অনুকরণ করে সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে সংস্কার করতে চায়, অপর পক্ষ ইসলামী আদর্শের আলোকে সমাজ পরিবর্তন করতে চায়। দৃষ্টিভংগি ও মূল্যবোধগত এই বৈপরীত্য যতদিন থাকবে, মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ ঐক্য ততদিন আসবে বলে মনে হয় না।[৩৯৮]

---

৩৯৮. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ূব *বর্তমান বিশ্ব ও মুসলিম উম্মাহ্‌র সংহতি*।

Dhaka University Institutional Repository

জীন

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়াতী জীবনের সাথে জীনেরা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। তাঁর নিকট থেকে সরাসরি কুর'আন-হাদীসের জ্ঞান লাভ এবং প্রতিনিধি হিসেবে অন্যান্য জীনের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোসহ জিহাদেও অংশগ্রহণ করেছেন। *রাসূলুল্লাহ (সা) ও জীন সম্প্রদায়* প্রবন্ধে জীন জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ, ইতিহাস, সৃষ্টির মৌলিক উপাদান, কুর'আন-হাদীসে জীন প্রসঙ্গ এবং সাহাবী জীনদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

প্রাবন্ধিক আহমদ বদরুদ্দীন খান লিখেছেন :

> রাসূলুল্লাহ (সা) সকাশে জীনদের আগমন, ইসলাম গ্রহণ ও তাঁর কাছ থেকে কোরআন, হাদীসসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জীনদের প্রত্যক্ষ শিক্ষা লাভের বহু ঘটনা পবিত্র কোরআন, হাদীস শরীফ ও আরবী ভাষায় রচিত সীরাত গ্রন্থসমূহে নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় লিপিবদ্ধ আছে।
>
> পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, 'হে রাসূল (সা)! আপনার সকাশে জীনদের আগমন, কোরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনাসমূহ আপনি মানব জাতিকে জানিয়ে দিন।' অতএব, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও জীন সম্প্রদায়ের মাঝে সংঘটিত ঘটনাসমূহ জানা ও অনুধাবন করার মধ্যেও আমাদের কোন না কোন কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জীন সম্প্রদায়ের সংঘটিত সেই সব ঘটনাসমূহের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করছি।[৩৯৯]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আগত এক বৃদ্ধ জীনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তিহামা অঞ্চলের একটি পাহাড়ের উপর বসা ছিলাম। এমন সময় একজন অশীতিপর বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে দাঁড়াল এবং তাঁকে সালাম দিল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, কে আপনি? উত্তরে বৃদ্ধ বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা), আমি হামা ইবনে আহীম ইবনে আকীস ইবনে ইবলীস। বৃদ্ধের এই উত্তর শুনে তিনি বললেন, তাহলে তো তোমার বয়স কয়েক হাজার বছর। কারণ তোমার ও ইবলীসের মাঝে শুধুমাত্র দুই পুরুষের ব্যবধান। উত্তরে বৃদ্ধ বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! ইবলীস তো বটেই, এমনকি পৃথিবীর বয়স এবং আমার জন্মের মাঝেও সময়ের ব্যবধান খুব বেশী নয়। কারণ যখন হযরত আদম (আ)-এর পুত্র কাবীল যখন তার ভাই হাবীলকে হত্যা করেছিল, তখন আমি কিশোর এবং সেই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ও ষড়যন্ত্রকারীদের একজন ছিলাম। এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বৃদ্ধকে বললেন, তাহলে তো তোমার অতীত খুবই জঘন্য। বৃদ্ধ

---

৩৯৯. আহমদ বদরুদ্দীন খান, 'রাসূলুল্লাহ (সা) ও জীন সম্প্রদায়', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২১ হি*, জা সী ক বা, পৃ ১০০-১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

বলল, আমার জঘন্য অতীতের যাবতীয় গুনাহ হতে আল্লাহর কাছে তওবা করতেই আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। যেমনিভাবে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম আল্লাহর নবী হযরত নূহ (আ)-এর দরবারে এবং তাঁকে এই বলে অনুরোধ করেছিলাম যে, হে আল্লাহর নবী নূহ, আমি সেই জঘন্য পাপীদের একজন-যারা হযরত আদম (আ)-এর পুত্র কাবীলকে প্ররোচিত করেছিল তার ভাই হাবীলকে হত্যা করতে।

অতএব, হে নূহ! আপনার আল্লাহর দরবারে কি আমার সেই জঘন্য অপরাধের কোন ক্ষমা আছে? উত্তরে হযরত নূহ বললেন, ওহে হামা, নিরাশ হয়ো না; কারণ আমি আল্লাহর পক্ষ হতে এই মর্মে ওহীপ্রাপ্ত হয়েছি যে, বান্দার অপরাধ যত জঘন্যই হোক, যখন সে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চায়, তখন আমার আল্লাহ তওবাকারীর গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এই অভয়বাণী শোনাবার পর হযরত নূহ আমাকে আদেশ করলেন, হে হামা! অযু করে পাক-পবিত্র হয়ে এসে আল্লাহর দরবারে দুইটি সেজদা কর। আমি তাঁর আদেশমত অযু করে এসে দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রথম সেজদা আদায় করলাম। দ্বিতীয় সেজদাতে আমি যখন দীর্ঘক্ষণ সেজদারত, এমন সময় হযরত নূহ (আ)-এর কণ্ঠ শুনতে পেলাম। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, হে হামা! মাথা উত্তোলন কর। আকাশ থেকে তোমার ক্ষমার সুসংবাদ এসে গেছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে এই সুসংবাদ হযরত নূহের মুখে শোনামাত্র আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পুনরায় তাঁর দরবারে সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম এবং পূর্ণ একশত বৎসর সেই সেজদায় কাটিয়ে দিলাম। এমনিভাবে আমি আল্লাহর নবী হযরত হুদ (আ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তিনি তাঁর উম্মতের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইছেন। তাঁর কান্না দেখে আমিও কেঁদে ফেললাম এবং নিজের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইলাম।

এমনিভাবে আমি আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকুব (আ)-এর সাথেও সাক্ষাত করেছি। অতঃপর আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আ) আগমন করলে পর তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে, তাঁর কাছ থেকে তাওরাতের শিক্ষা লাভ করেছি। দীর্ঘ দিন তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়ে আমি যখন তাঁর নিকট বিদায় চাইতে গেলাম, তখন তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে আমাকে বললেন, হে হামা, আমার পর যদি তুমি আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আ)-এর সাক্ষাত পাও, তাহলে তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। অতঃপর দীর্ঘকাল কেটে গেল, এক সময় আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করলেন এবং নবুওয়ত প্রাপ্ত হলেন। আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে হযরত মূসার সালাম তাকে পৌঁছে দিলাম। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার মুহূর্তে তিনি আমার দু'হাত চেপে ধরে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, ওহে হামা, আমার পর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমন ঘটবে। যদি তুমি তাঁর দেখা পাও, তবে আমার সালাম তাঁকে পৌঁছে দিও। হামার মুখে ঈসা (আ)-এর এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) আবেগে কেঁদে ফেললেন এবং কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, "ঈসা (আ)-এর প্রতিও

Dhaka University Institutional Repository

আমার সালাম যখন পুনরায় তিনি আগমন করবেন। আর ঈসা (আ)-এর দেয়া এই আমানত আমার নিকট যথাযথ পৌঁছে দেওয়ার জন্য হে হামা, তুমিও আমার সালাম গ্রহণ কর।

অতঃপর হামা বিনীত কণ্ঠে আবেদন পেশ করল, হে আল্লাহর রাসূল (সা), আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আ) আমাকে তাওরাত শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি নিজেকে তাওরাতের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছি। আজ আপনি আমাকে কোরআন শিক্ষা দিন, যাতে করে জীবনের বাকী দিনগুলোতে নিজেকে কোরআনের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারি। হামার এই আবেদনের প্রতি সাড়া দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সূরা ওয়াকেয়া, সূরা মুরসালাত, সূরা নাবা, সূরা তাকবীর, সূরা ফালাক, সূরা নাস ও সূরা এখলাস শিক্ষা দিলেন। অতঃপর হামা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বিদায়ের অনুমতি চাইলো, তখন তিনি বললেন, হে হামা! তোমার যে কোন প্রয়োজনে তুমি আমার নিকট চলে আসবে। আর প্রয়োজন ছাড়াও মাঝে মাঝে এসে আমার সাথে দেখা করে যাবে।

হযরত ওমর (রা) বললেন, এই ঘটনার কয়েক বছর পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর আমরা আর কখনো হামার সাক্ষাত পাইনি। জানি না, আজও সে বেঁচে আছে, না মরে গেছে। (বায়হাকী, দালায়েলুন নবুওয়ত)

রাসূলুল্লাহ (সা) ও ইবলীসের প্রপৌত্র হামার ঘটনা জানতে পেরে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা), চিরস্থায়ী জাহান্নামী ইবলীসের বংশধর হামার মৃত্যুর পর শেষ পরিণাম কি হবে?

সাপের আকৃতি ধারণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জনৈক জীন সাহাবীর আগমন

ইমাম মালেক সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে কালো এক বিশালদেহী সাপ এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে দাঁড়িয়ে গেল, অতঃপর সেই সাপ মাথা উঁচু করে তাঁর কানের কাছে মুখ লাগিয়ে কিছু বলার পর রাসূলুল্লাহ (সা) মাথা মোবারক সামান্য কাত করে সাপের কানে কানে কি যেন বললেন, তখন সাপটি সজোরে মাটিতে আছড়ে পড়ল এবং চারদিক কাঁপিয়ে দ্রুত আমাদের সামনে থেকে চলে গলে। আমরা ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের আশঙ্কা ছিল সে আপনাকে দংশন করবে। শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) স্মিত হেসে বললেন, ভয় পেয়ো না, এটা সাপ নয়, বরং জীন ছিল। একদল জীনকে কিছু দিন পূর্বে আমি কোরআনের কয়েকটি সূরা শিক্ষা দিয়েছিলাম, সেখান থেকে একটি সূরা ভুলে গিয়েছিল। তাই একে তাদের প্রতিনিধিরূপে আমার কাছে প্রেরণ করেছে, সেই সূরাটি পুনরায় শিখে নিতে। আমি তাকে সূরাটি পুনরায় তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলাম। (মুয়াত্তা, তারিখে বাগদাদ)

Dhaka University Institutional Repository

ভাষণ

মহানবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ সর্বকালের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় বিভূষিত। বিশ্ব মানবতার মুক্তির প্রতিটি দিকের কথাই রয়েছে এই অমূল্য ভাষণে। তাবুকের যুদ্ধক্ষেত্রের ঐতিহাসিক ভাষণ, বিদায় হজ্জের অবিস্মরণীয় ভাষণ এবং মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্তিম ভাষণ বিশ্লেষণ করে সাধারণত প্রবন্ধ-নিবন্ধ বেশী রচিত হয়েছে। এরকম কয়েকটি প্রবন্ধ হল : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর তিনটি অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ভাষণ[৪০০], প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের ভাষণ ও আধুনিক বিশ্ব[৪০১], বিদায় হজ্জের ভাষণ : একটি সমীক্ষা[৪০২], মহানবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ : আজকের প্রেক্ষিত, বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ : বিশ্ব মানবতার মুক্তি সনদ[৪০৩], মহানবীর (সা) মহাপ্রয়ান ও অন্তিম ভাষণ[৪০৪], রাসূলে আকরাম (সা)-এর ভাষণ[৪০৫], বিদায় হজ্জের ভাষণ : গুরুত্ব ও তাৎপর্য[৪০৬] এবং মহানবী (সা)-এর শেষ ভাষণ : উম্মাহর জাতীয় জীবনে এক কালজয়ী দিক নির্দেশনা[৪০৭]।

আহমদ আবদুল কাদের *মহানবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ : আজকের প্রেক্ষিত* প্রবন্ধে লিখেছেন :

> বিদায় হজ্জের সময়ে মহানবী (সা) প্রদত্ত ভাষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্ব ভাষণের প্রেক্ষিতে বিবেচনায়। এ গুরুত্ব বিষয়বস্তুর কারণে। এ ভাষণ এমন এক হজ্জের ভাষণ, যা ছিলো মহানবীর (সা) জীবনের শেষ হজ্জ। এ হজ্জ ছিলো তাঁর জীবনের পূর্ণাঙ্গ হজ্জ। এ হজ্জের মাধ্যমেই মহানবী

---

৪০০. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর তিনটি অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ভাষণ', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ১৪২১ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৫-৩৮।

৪০১. বিচারপতি মোস্তফা কামাল, 'প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের ভাষণ ও আধুনিক বিশ্ব', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৪ হি*, পৃ ৩৩-৩৭।

৪০২. মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান, 'বিদায় হজ্জের ভাষণ : একটি সমীক্ষা', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৮৯-১৯৬।

৪০৩. মোঃ শরিফুল ইসলাম, 'বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ : বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ২৩৪-২৪১।

৪০৪. ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী, 'মহানবীর (সা) মহাপ্রয়াণ ও অন্তিম ভাষণ', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২০ হি*, পৃ ১৭৭-১৭১।

৪০৫. হাসান জাহাঙ্গীর আলম, 'রাসূলে আকরাম (সা)-এর ভাষণ', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল ২০০৭, পৃ ১০৩-১০৯।

৪০৬. মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান, 'বিদায় হজ্জের ভাষণ : গুরুত্ব ও তাৎপর্য', *ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, মে ২০০২, পৃ ৬২-৬৪।

৪০৭. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম, 'মহানবী (সা)-এর শেষ ভাষণ : উম্মাহর জাতীয় জীবনে এক কালজয়ী দিকনির্দেশনা', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৯ হি*, পৃ ১৩৩-১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

(সা)-এর মিশনের পূর্ণতা আসে। সে হজ্জেই তাঁর আনীত দ্বীনকে পূর্ণ করে দেয়া হয়। এ হজ্জের মাধ্যমেই মহানবী (সা) তাঁর উম্মাত থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় গ্রহণ করেন। তাই উক্ত হজ্জ এক অর্থে তাঁর বিদায় অনুষ্ঠানও বটে। এ জন্যই এ হজ্জকে হুজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ্জ বলা হয়। কাজেই বিদায় অনুষ্ঠানের যে অভিভাষণ তা যে চূড়ান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ভাষণে ছিলো তাঁর জীবনের সর্বশেষ জনভাষণ। এ ভাষণ ছিলো তাঁর জীবনের সর্ববৃহৎ সমাবেশের ভাষণ। এ ভাষণ ছিলো তাঁর মিশনের পূর্ণতা অর্জনের কুরআনী ঘোষণার ঠিক পূর্বকালীন ভাষণ।

মহানবীর (সা) বিদায় হজ্জের অভিভাষণে বিধৃত হয়েছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, ধর্মতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে মৌল নির্দেশনা। তিনি এ ভাষণে পেশ করেছেন মানবজাতির অখন্ডত্বের ধারণা। তুলে ধরেছেন মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ। এ ভাষণে মহানবী (সাঃ) নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও তাদের পারস্পারিক অধিকার, দাসদাসী তথা অধীনস্থ মানুষের প্রতি দয়িত্ববোধ, সামাজিক নিরাপত্তা, আইনের শাসন, সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসান, সামাজিক অনাচার দূরীকরণ, নেতৃত্বের আনুগত্য এবং কুরআন সুন্নাহত চূড়ান্ত প্রাধিকার ইত্যাদি বিষয় তিনি আলোকপাত করেছেন, দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। বিশ্বনবীর বিদায় হজ্জে ভাষণের যথার্থ অনুশীলনেই মানবতার মুক্তি। এ হচ্ছে আমাদের অস্তিত্ব, গৌরব সমৃদ্ধি উন্নতি, প্রগতির জিয়নকাঠি, সোনালী পরশ।[৪০৮]

বিচারপতি মোস্তফা কামাল *বিদায় হজ্জের ভাষণ ও আধুনিক বিশ্ব* প্রবন্ধে লিখেছেন :

আমাদের সমাজে যারা ভৃতা, পূর্ববর্তী সমাজে যাদের পরিচয় ছিলো গোলাম হিসাবে, তাদের প্রতি কি ব্যবহার করা কর্তব্য, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেদিকেও আলোকপাত করে বললেন :

> 'গোলাম সম্পর্কে সতর্ক হও। তোমরা যা খাও তদেরকেও তাই খেতে দিও তোমরা যা পরিধান করো তাদেরকেও তা-ই পরিধান করতে দিও।'

আমেরিকায় দাসপ্রথা প্রবর্তন ও বাতিল এই ভাষণের বহুশত বছর পরে। আমেরিকা যখন আবিষ্কার হয়নি, তখনই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আয়ায়হি ওয়া সাল্লাম গোলামদের সম্বন্ধে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নেবার আহ্বান জানিয়ে গেছেন। জাতিতে জাতিতে হানাহানি হয় জাত্যাভিমান থেকে। এক জাতি আর এক জাতি থেকে উন্নত, এই বোধ থেকে নিপীড়ন ও যুদ্ধবিগ্রহের সূত্রপাত হয়।[৪০৯] রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরবদের এই স্বজাত্যাভিমান সম্বন্ধে সতর্ক করে দিলেন এভাবে :

---

৪০৮. আহমদ আবদুল কাদের, 'মহানবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ : আজকের প্রেক্ষিত', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২০ হি*, জা সী ক বা, পৃ ১৮৭-১৯৩।

৪০৯. বিচারপতি মোস্তফা কামাল, 'প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের ভাষণ ও আধুনিক বিশ্ব', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৩, পৃ ৩৩-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

'আরবের উপর অনারবের এবং অনারবের উপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তোমরা সবাই আদমের সন্তান এবং আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।'

ড. কাজী দীন মুহম্মদ *মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা)-এর তিনটি অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ভাষণ* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন :

মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তেকে যা কিছু বলেছেন এবং যা কিছু করেছেন তার হুবহু দলীল রয়েছে। কোথাও বিকৃতি ঘটেনি। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা)-এর তিনটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। ভাষণ তিনটি হল :

১. তাবুকের যুদ্ধক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভাষণ
২. আরাফার ময়দানে বিদায় হজ্জের অবিস্মরণীয় ভাষণ, এবং
৩. মদীনায় জীবন সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্তিম ভাষণ।

বিশ্বের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ এ অবিস্মরণীয় ভাষণসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষণগুলির প্রতিটি শব্দ গভীর অর্থবহ। এর অনুসরণে আইন প্রণীত হলে মানব ইতিহাসে বিপ্লব সাধিত হবে। মানুষে মানুষে বিভেদ থাকবে না। থাকবে না পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ প্রতিহিংসাপরায়ণতা। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা) জীবনে যত কথা বলেছেন, যত উপদেশ দিয়েছেন ও যত বাণী লোকসমক্ষে প্রকাশ করেছেন, মনে হয় এ ভাষণগুলো তার সার সংক্ষেপ।

বিশ্বের সভ্যতার ইতিহাসে যত মহামনীষীর স্মরণীয় মানব কল্যাণমূলক ভাষণ রয়েছে, এসব কোন ভাষণের সাথেই এ তিনটি ভাষণের তুলনা হয় না। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে হযরত (সা)-এর এ উপদেশ বাণী স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। তিনটি ভাষণের শতাধিক উপদেশ বাণী অনুসরণে আইন প্রণীত হলে মানুষে মানুষে বিভেদ ঘুচে গিয়ে সাম্যমৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।[৪১০]

৪১০. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, 'মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা)-এর তিনটি অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ভাষণ', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) সংখ্যা ১৪২১, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০০, পৃ ১৫-৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্ন

নবীগণের স্বপ্নও এক প্রকারের প্রত্যাদেশ। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও স্বপ্ন দেখতেন। মহানবী (সা)-এর স্বপ্ন প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্বপ্ন সম্বন্ধে সামান্য ধারণা দেওয়ার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে :

> হাদীসের গ্রন্থাবলীতে নবীগণের স্বপ্নকে এক রকমের প্রত্যাদেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। নবীগণের স্বপ্ন এক প্রকারের মুজিযা। সুতরাং তাতে কিছুমাত্রও ভ্রান্তির অবকাশ নেই। হযরত রাসূলে করীম (সা)-ও স্বপ্ন দেখতেন। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- 'নবূয়ত প্রাপ্তির কিছুকাল পূর্বে হযরত (সা) স্বপ্ন দেখতেন এবং তিনি যেমনটি দেখতেন পরবর্তীতে তেমনটিই ঘটতো। নবূয়ত প্রাপ্তির পর হুযূর (সা)-এর প্রতিদিনকার নিয়ম ছিল এই যে, ফজরের নামায আদায় করার পর তিনি সাহাবা-ই-কিরামগণের দিকে ফিরে বসতেন এবং তাঁদের কেউ-স্বপ্ন দেখেছেন কি-না জিজ্ঞেস করতেন, সাহাবাদের কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে তা উপস্থাপন করতেন। হযরত (সা) তার তাবীর করে দিতেন। আর নিজেও কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে তা সকলকে বলতেন। (বুখারী)
>
> অন্য এক বর্ণনায় হযরত রাসূলে কারীম (সা) বলেন, এক রাত্রে আমি খাবে দেখলাম, একটি তলোয়ার হাতে নিয়েছি। তারপর সেটির অগ্রভাগ সঞ্চালন মাত্রই ভেঙ্গে গেল। এর অর্থ হলো উহুদের যুদ্ধে আমাদের বিপর্যয় ঘটবে। অতঃপর সেই তরবারী আমি পুনরায় সঞ্চালন করি। মুহূর্তেই তা তীক্ষ্ম ও ধারালো হয়ে গেল। এর তাবীর হলো, উহুদ পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা সকল মুসলমানদের প্রভূত তরক্কী দান করেন। এর পর একটি গাভী যবেহ হতে দেখি। যার ফল হলো উহুদের যুদ্ধে বহু সংখ্যক সাহাবার শাহাদতবরণ।
>
> বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে-হুযূর (সা) বলেন, 'একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার সম্মুখে কিছু লোক উপস্থিত হয়েছে, তাদের সবার পরনেই রয়েছে পিরহান বা জামা। কারো বসন সীনা পর্যন্ত , কারো তদপেক্ষা বড়। (হযরত ওমরের বসন (কুর্তা) এতই দীর্ঘ যে তার নিম্নভাগ মাটি ছুঁইছিলো।" হযরত নবী করীম (সা) এই স্বপ্নের তাবীর প্রসঙ্গে বলেন ইসলামের ব্যাপক বিস্তার ও প্রসার হবে, তথা ইসলামের বিস্তৃতি হবে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী। তবে তা উমরের দ্বারাই সর্বাপেক্ষা বেশি হবে।' ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় এইটি অবশ্যই প্রতীত হবে যে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের শৌর্য-বীর্য আর চেষ্টার ফলেই ইসলাম পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে। বলা হয়-অর্ধ পৃথিবীকে শাসন করার বিরল কৃতিত্ব শুধুমাত্র হযরত ওমরেরই। কারণ তাঁর শাসনামলেই প্রায় অর্ধেক পৃথিবী ব্যাপিয়া ইসলামী সাম্রাজ্য গড়ে উঠে।
>
> মূলতঃ নবী-রাসূলগণের স্বপ্ন বা খাব সাধারণ মানুষের স্বপ্নের মত নয়। নবীদের পূতঃ পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবনের কোন একটি দিকই সত্য ছাড়া নয়, সত্যের উপরই বস্তুত নবুয়তীর ভিত রচিত হয়, সুতরাং জাগরণে যেমন নবীগণ আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রাপ্ত হন, তেমনিভাবে নিদ্রিতাবস্থায়ও অনুরূপ নির্দেশ প্রাপ্ত হন, যা খাব বা স্বপ্নের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।[৪১১]

---

৪১১. আবদুল কাইয়ূম সোবহানী, 'মহানবী (সা)-এর স্বপ্ন', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ২৫৭-২৬০।

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যদ্বাণী

মহানবী (সা)-এর কিছু ভবিষ্যদ্বাণী[৪১২] প্রবন্ধে বদর যুদ্ধে নিহতদের সংবাদ, পৃথিবীতে পাশ্চাত্য খ্রিষ্টানদের প্রতিপত্তি প্রবল হওয়া, মুসলমানদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সকল জাতির রুখে দাঁড়ানো, খায়বারের বিজয়, আবূ সাফওয়ানের হত্যার সংবাদ, বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের সংবাদ, মিসর বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী, হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা)-এর খিলাফতের সংবাদসহ ইত্যাকার অনেক বিষয় সম্বন্ধে রাসূল (সা) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা বিধৃত হয়েছে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে :

> একদিন মহানবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আরব উপত্যকায় যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন। তার পর পারস্যের সাথে যুদ্ধ করবে। সেটি জয় করবে। তারপর যুদ্ধ করবে রোমের বিরুদ্ধে। তাতেও তোমরাই বিজয়ী হবে। ইতিহাস সাক্ষী, কয়েক বছরের ভেতরেই এসব যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মহানবী (সা)-র ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়ে যায়। (বুখারী)

মুসলমানদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত জাতি রুখে দাঁড়াবে

মহানবী (সা) বলেছেন, 'এমন সময় আসছে, যখন পৃথিবীর জাতি সম্প্রদায় তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য একে অপরকে আহ্বান জানাবে যেমন করে বুভুক্ষু খাদকরা খাবারের পাত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।' সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে একজন নিবেদন করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্, তাহলে তখন কি আমরা মুসলমানরা সংখ্যায় কমে যাব?' হুযূর বললেন, 'না, তা নয়। তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে, কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে এমন যেমন বন্যার পানির উপরে ফেনা ও খড়কুটা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ শত্রুদের স্তর থেকে তোমাদের ভয় তুলে নেবেন এবং তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা এনে দেবেন।' এক সাহাবী জানতে চাইলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, সে দুর্বলতা কি ধরনের হবে?' হুযূর (সা) বললেন, 'দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা আর মৃত্যুর প্রতি অনীহা।' (মুসনাদে আহমদ)

নৈতিক অবক্ষয়ের সংবাদ

মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, 'সর্বোত্তম আমল (যুগ বা শতক) হল সেটি যাতে আমি বর্তমান। তারপর সে আমলের মানুষ যারা আমার পরে রয়েছে। তারপর সে আমলের মানুষ যারা তাদের পরে আসবে। তারপর এমন আমল আসবে, যখন মানুষকে সাক্ষী দেয়ার জন্য ডাকতে হবে না, বরং নিজেরা গিয়েই সাক্ষী দেবে। আমানতদার থাকবে না, খেয়ানতকারী থাকবে। মানত মানবে কিন্তু পূরণ করবে না।' (মুসলিম)

---

৪১২. সৈয়দ মোহাম্মদ জহীরুল হক, 'মহানবী (সা)-র কিছু ভবিষ্যদ্বাণী', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১০২-১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ হাদীসে মহানবী (সা) যে চারটি আমল বা যুগের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা হল স্বয়ং মহানবী (সা)-এর আমল, সাহাবায়ে কিরামের আমল, তাবেঈনের আমল এবং তাবে তাবেঈনের আমল। এরপর তিনি যে আমলের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা হল বর্তমান আমল। বস্তুত এর নৈতিক অবক্ষয় সম্পর্কে সবাই অবগত।

মাওলানা ইমদাদুল হক তাঁর প্রবন্ধ *মহানবী (সা)-র ভবিষ্যদ্বাণী : ইমাম মাহদী প্রসংগে* বলেছেন :

রাসূলুল্লাহ (সা) ভবিষ্যত ঘটনাবলীর সংবাদ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু প্রদান করেছেন। ঘটনাবলীর পূর্ণ বিবরণ ও অংশসমূহের পুরাপুরি ধারাবাহিকতা প্রকাশ করা তাঁর কর্তব্য নয়। বলা বাহুল্য, এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন মজলিসে বিভিন্ন অংশ বর্ণনা দিয়েছেন। তখন যে সকল সাহাবী উপস্থিত ছিলেন তাঁরা তা শ্রবণ করেছেন কিন্তু তারা যে সব বিষয় সবাই জানবেন তা নয়। এক মজলিসে যিনি কিছু শুনেছেন অন্য মজলিসে তিনি হয়ত অনুপস্থিত ছিলেন। তাই অপর অংশ অন্য সাহাবী শুনেছেন। এজন্য ধারাবাহিকতা এক সাথে পাওয়া দূরূহ ব্যাপার। সুতরাং রিওয়াতকারীদের বর্ণনায় শাব্দিক পার্থক্য, অসংলগ্নতা ও বর্ণনার পূর্বাপর হওয়া বিচিত্র নয়। এসব কিছুর পরও মূল বিষয়টি সত্য বলে প্রকাশ হতে থাকবে। ইমাম মাহদী সম্পর্কেও তাই হয়েছে। এ সম্পর্কে বর্ণিত রিওয়ায়াতের আলোকে ধারাবাহিকভাবে ঘটনা বর্ণনা করলে তা হবে ভাষ্যকারের সাজানো ও তার চিন্তার ফল। এই ধারাবাহিকতার মধ্যে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে বা সংশয় সৃষ্টি হলে তা হবে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা। এতে মূল বিষয়ের উপর প্রশ্ন ঠিক হবে না।[৪১৩]

---

৪১৩. মাওলানা ইমদাদুল হক, *মহানবী (সা)-র ভবিষ্যদ্বাণী : ইমাম মাহদী প্রসংগে*, সীরাত স্মরণিকা ১৪১৮ হিজরী।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত পাক থেকে যথার্থ শিক্ষা গ্রহণের জন্যে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, মহানবী (সা)-এর বিপ্লবের ক্ষেত্র কতটুকু বিস্তৃত ছিল। সামাজিক ব্যবস্থায় তিনি কি দিক-বিশেষের সংস্কার চেয়েছিলেন, না সামগ্রিক বিপ্লব তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর দাওয়াত কি ধর্মীয় বা নৈতিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিল, না এর আর্থ-সামাজিক আবেদনও ছিল, অন্য কথায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রেও মহানবী (সা)-এর অবদান কি ছিল? মানবজাতিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জীবনকে ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। আর সাংস্কৃতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা। এখানে সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ *রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টিতে সংস্কৃতির রূপরেখা* প্রবন্ধে লিখেছেন :

'সংস্কৃতি' শব্দটি সংস্কৃত শব্দেরই বিশেষ্য (noun) তাতে প্রকাশ করা হয় - অসংস্কৃত বা অপরিচ্ছন্ন শব্দেরই পরিচ্ছন্ন বা বিশুদ্ধ রূপ। জীবনের বিভিন্ন দিককে সুঠাম, শোভন ও সুন্দররূপে প্রকাশ করাকে সংস্কৃতি না বলে কালচার বলাই শ্রেয়।

আল্লাহর রাসূল (সা)-এর জীবনে এ কালচারকে কিভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল তাঁর বর্ণনাই এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। তবে বাংলা ভাষায় কালচার এবং সংস্কৃতিকে সমার্থবাচক মনে করা হয় বরে তাঁর জীবনে সংস্কৃতি বলতে তিনি জীবনের প্রতি পর্যায়ে ও প্রত্যেক ক্ষেত্রে মানব জীবনের সুপরিচালিত ও সুন্দর প্রকাশ মনে করতেন। আহারে, বিহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে, আলাপ-আলোচনায় এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি নিজেও তাঁর সঙ্গীয় সাহাবীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, সুঠাম ও সুন্দর-অবস্থান পালনের জন্য নির্দেশ দিতেন। এজন্য তাকে এ দুনিয়ার সংস্কৃতি জগতের শ্রেষ্ঠতম পথনির্দেশক বলা যেতে পারে। তিনি মানুষের নবী ছিলেন বলেই তাঁর দৃষ্টিতে মানুষের সংস্কৃতি ছিল উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আদর্শের ক্রিয়াশীলতা। মানুষের জীবনের সকল পর্যায়েই তাকে এ তিনটি বিষয় কার্যকরী।

যে সকল বিষয়কে আমরা সুন্দর বলে অভিহিত করি, তাদের মধ্যে নানাদিক দিয়ে সে সমতা বর্তমান। এজন্য মানুষের জীবনে প্রকৃত সংস্কৃতির সৃষ্টি করতে হলে তাঁর কাজকর্মে, আহারে-বিহারে তাঁর সৃষ্টিতে সে সমতার রয়েছে প্রয়োজন। বর্তমানকালে মানব সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় তাতে রয়েছে সমতার একান্ত অভাব। এ সমতার অভাবের ফলেই মানব জীবনে দেখা দিয়েছে নানাবিধ দুঃখ-সৈন্য ও কলুষতা। মানব জীবনে এ সমতার অভাবেই দেখা দিয়েছে জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়তাবান। কারণ মানুষের জীবনে দেখা দিয়েছে অসম হিংসা ও বিদ্বেষ। সে হিংসা ও বিদ্বেষের ফলে এক জাতি অপর জাতিকে ধ্বংস করতে সর্বদাই তৎপর।[৪১৪]

---

৪১৪. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৃষ্টিতে সংস্কৃতির রূপরেখা', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ৭-৯।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী দীন মুহম্মদ তাঁর *বর্তমান সংস্কৃতি ও বিশ্বশান্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম* প্রবন্ধে লিখেছেন :

হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন আরব অঞ্চলের অবস্থা কি ছিল? তৎকালীন আরব সমাজ অনাচার, অবিচার, ব্যভিচার, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, খুন-খারাবি, ডাকাতি, মদ্যপান, জুয়া, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি অসামাজিক, অমানবিক ও কলুষ-কালিমায় লিপ্ত ছিল। মানুষ অর্থের জন্য চুরি, ডাকাতি, শঠতা, সুদ, ঘুষ ও খুন-খারাবির আশ্রয় নিত। যৌন সংযম বলতে কিছুই ছিল না। যৌন লালসা চরিতার্থ করতে দিয়ে পরনারী হরণ, ব্যভিচার, বলাৎকার ও নারী নির্যাতন চরমে পৌঁছেছিল। নামমাত্র মূল্যে নরনারী হাটে বাজারে বিক্রি হতো। কেউ কারো কর্তৃত্ব স্বীকার করতো না। অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা পৌঁছেছিল চরমে। বিচার বলতে কিছুই ছিল না। জোর যার মুল্লুক তার ছিল প্রচলিত নীতি। নির্বিচারে নরনারী হত্যা, দাস দাসীদের প্রতি কুকুর বিড়ালের মত ব্যবহার ইত্যাদি দূর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। নিপীড়িত মানবতা অধীর আগ্রহে একজন ত্রাণকর্তার আগমনের অপেক্ষায় দিন গুণছিলো। আরবের সেই তমসাচ্ছন্ন রজনীর ঘোর অন্ধকার কাটিয়ে আল্লাহর অসীম রহমতে সকল সমস্যার সমাধানকারী অসম সাহসী বীর, চরিত্রবান হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব সমগ্র বিশ্বে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং ঘোষণা করলেন; ওয়াল্লামী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়াদীনিল হাক্কি লি ইউযহিরাহু আলাদ্দীনি কুল্লিহি-তিনি যে সত্ত্বা যিনি স্বীয় রাসূলকে সঠিক পথ ও সত্য ধর্ম সহ পাঠিয়েছেন, যাতে অপর সকল মতবাদের উপর এ ধর্ম বিজয়ী হতে পারে। তিনি ঘোর অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব সমাজে ইসলামের সুবিমল জ্যোতি বিকীরণ করেন। তাঁর আবির্ভাবে সমগ্র আরব দুনিয়ায় রেনেসাঁর সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি তৎকালীন আরবের ঘূণেধরা সমাজের নানা জলিট সমস্যা সমাধানের জন্য যে অবদান রেখেছিলেন তার তুলনা হয় না।[৪১৫]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ *বিশ্ব সভ্যতায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অবদান* প্রবন্ধে লিখেছেন :

সভ্যতা বলতে সাধারণভাবে প্রকৃতির ওপর প্রাধান্য বিস্তার এবং প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে মানব জীবনে নানাবিধ প্রয়োজনে ব্যবহার করাই বোঝায়। আল্লাহর রাসূল (সা.) ভাষা, বর্ণ, রক্ত ভৌগোলিকসহ অবস্থান প্রভৃতি কারণের ওপর কোন স্বাজাতিকতার ভিত্তি স্থাপন করেন নি। তার পরিবর্তে আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতির ভিত্তির ওপর সে একত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এজন্য অত্যন্ত দুঃখের সাথে শেষ্ লতাফ হোসেন হালী বলেছেন যে, দীন এসেছিল বিভিন্ন কওমের হৃদয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য। সে দীনের মধ্যে এখন ভাই থেকে ভাই পৃথক হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ তাদের মধ্যে কোন আদর্শিক ঐক্য নেই। তারা নানা পার্থক্য সৃষ্টিকারী মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেছে। এ জন্য আজ দুনিয়ার মানুষ হযরত

---

৪১৫. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, 'বর্তমান সংস্কৃতি ও বিশ্বশান্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৪ হি*, পৃ ৪২-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে মানব জীবনে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জনক বলে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। নারী জীবনে বা দাস ও পতিতদের জীবনে প্রকৃত স্বাধীনতা ও সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি।[৪১৬]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত আরো ক'টি প্রবন্ধ হচ্ছে : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৃষ্টিতে সংস্কৃতির রূপরেখা[৪১৭], বিশ্ব সাহিত্যে বিশ্বনবী (সা.)[৪১৮], সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক মহানবী (সা)[৪১৯], সভ্যতা সংস্কৃতি সংস্থাপনে প্রিয়নবী (সা[৪২০], বিশ্বসভ্যতায় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অবদান[৪২১], সংস্কৃতির উজ্জীবনের ক্ষেত্রে মহানবী[৪২২], সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে রাসূলুল্লাহ (সা)[৪২৩], বর্তমান সংস্কৃতি ও বিশ্বশান্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সংস্কৃতি ও আইনের বিকাশে হযরত মুহাম্মদ (সা)[৪২৪], সাংস্কৃতিক বিপ্লবে মহানবী (সা)[৪২৫], সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে সীরাতুন্নবী (সা)[৪২৬] এবং সীরাতে রাসূল : ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি[৪২৭]।

---

৪১৬. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, 'বিশ্বসভ্যতায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অবদান', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ৭৪-৭৬।

৪১৭. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, 'রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টিতে সংস্কৃতির রূপরেখা', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হিজরী সংখ্যা, পৃ ৭-৯।

৪১৮. মুহাম্মদ নুরুল আমীন, 'বিশ্ব সাহিত্যে বিশ্বনবী (সা.)', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২৬ হি*, ঢাকা : জা সী ক বা, মে ২০০৫, পৃ ১৬১-১৭৫।

৪১৯. মুকুল চৌধুরী, 'সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক মহানবী (সা)', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী সা. বিশেষ সংখ্যা, ৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃ ১৫৩-১৬৫।

৪২০. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, 'সভ্যতা সংস্কৃতি সংস্থাপনে প্রিয়নবী (সা)', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃ ৬০-৬৬।

৪২১. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, 'বিশ্ব সভ্যতায় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অবদান', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, পৃ ১-৩।

৪২২. সৈয়দ আলী আহসান, 'সংস্কৃতির উজ্জীবনের ক্ষেত্রে মহানবী,' *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২০ হি*, পৃ ৪৯-৫৩।

৪২৩. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবদান', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২০ হি*, পৃ ৫৪-৬০।

৪২৪. মাওলানা শাহ আবদুস সাত্তার, 'সংস্কৃতি ও আইনের বিকাশে হযরত মুহাম্মদ (সা)' *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৯ হি*, পৃ ৪৪-৪৬।

৪২৫. অধ্যাপক মোঃ মোশাররফ হোসাইন, 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবে মহানবী (সা)', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪০৭ হি*, পৃ ৩২-৩৫।

৪২৬. মোস্তফা আবূ হেনা, 'সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে সীরাতুন্নবী (সা)', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪০৭ হি*, পৃ ৫৩-৫৫।

৪২৭. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, 'সীরাতে রাসূল : ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২০ হি*, জা সী ক বা, পৃ ১৫২-১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বসভ্যতায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অবদান, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৃষ্টিতে সংস্কৃতির রূপরেখা, বিশ্ব সভ্যতায় হযরত রাসূল করীম (সা)-এর সীরাতের প্রভাব[৪২৮], সাংস্কৃতিক বিপ্লবে মহানবী (সা), বর্তমান সংস্কৃতি ও বিশ্বশান্তির দিশারী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা[৪২৯], সংস্কৃতি ও আইনের বিকাশে হযরত মুহাম্মদ (সা)[৪৩০], সংস্কৃতির উজ্জীবনের ক্ষেত্রে মহানবী[৪৩১], সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক মহানবী (সা)[৪৩২], মহানবী (সা)-এর সাংস্কৃতিক আদর্শ[৪৩৩], সভ্যতা সংস্কৃতি সংস্থাপনে প্রিয়নবী (সা)[৪৩৪] ।

---

৪২৮. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'বিশ্ব সভ্যতায় হযরত রাসূল করীম (সা)-এর সীরাতের প্রভাব', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) সংখ্যা ১৪২১, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০০, পৃ ৯-১৪ ।

৪২৯. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, 'বর্তমান সংস্কৃতি ও বিশ্বশান্তির দিশারী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৩, পৃ ৪২-৪৭ ।

৪৩০. মাওলানা শাহ আবদুস সাত্তার, 'সংস্কৃতি ও আইনের বিকাশে হযরত মুহাম্মদ (সা)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ৪৪-৪৬ ।

৪৩১. সৈয়দ আলী আহসান, 'সংস্কৃতির উজ্জীবনের ক্ষেত্রে মহানবী', *ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) স্মরণিকা ১৪২০ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ১৯৯৯, পৃ ৫৪-৬০ ।

৪৩২. মুকুল চৌধুরী, 'সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক মহানবী (সা)', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃ ১৫৩-১৬৫ ।

৪৩৩. আবু জাফর, 'মহানবী (সা)-এর সাংস্কৃতিক আদর্শ', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৮০-৮৩ ।

৪৩৪. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, 'সভ্যতা সংস্কৃতি সংস্থাপনে প্রিয়নবী (সা)', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃ ৬০-৬৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

পার্থিব শেষ দিনগুলো

দীনের পূর্ণতা লাভ ও ইসলাম সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাসূল (সা)-এর বিদায়ের প্রস্তুতি শুরু হয়। তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে বিদায়ের যে ইঙ্গিত ফুটে উঠেছিল সাহাবীগণ তা অনুধাবন করছিলেন। অনন্তের পথে মহানবী (সা.)[৪৩৫], তিনি যেভাবে চলে গেলেন[৪৩৬], যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) ওফাত পেলেন[৪৩৭] এবং নবীজী (সা)-এর অন্তিম দিনগুলো[৪৩৮] প্রবন্ধসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পার্থিব শেষ দিনগুলোর সুচারুরূপে বর্ণনা বিধৃত হয়েছে।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই *যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওফাত পেলেন* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন :

> দীনের পূর্ণতা লাভ ও ইসলাম সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নবী করীম (সা.)-এর বিদায়ের প্রস্তুতি শুরু হয়। নবী করীম (সা.)-এর কথা ও কাজের মধ্যে তাঁর বিদায়ের যে ইঙ্গিত ফুটে উঠেছিল সাহাবীগণ তা অনুধাবন করছিলেন।
>
> রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হিজরী দশম সালে ২০ দিন রমযানের ই'তিকাফ করেন। ইতিপূর্বে তিনি ১০ দিন করে ই'তিকাফ করতেন। জিবরীল (আ.) সেবার নবী (সা.)-কে দু'বার পূর্ণ কুরআন মজীদ পাঠ করে শোনান।
>
> রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন : আমি জানি না, হয়তো এখানে এবারের পর তোমাদের সাথে আর কখনো মিলব না। আল্লাহ্ আমার ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞেস করলে তোমরা কি জবাব দেবে? আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করেছি? সমবেত জনমণ্ডলী উত্তর দিলেন, আপনি আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন, রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ্! সাক্ষী থাক।' তিনি মীনাতে শয়তানের উপর কংকর নিক্ষেপের স্থানে গেলেন। বললেন, আমার থেকে তোমরা হজ্জের কার্যাবলী শিখে নাও। সম্ভবত এবারের পর আর হজ্জ করব না। ইতিমধ্যে তাশরীকের দিনগুলোর (কুরবানীর পর তিন দিন) মধ্যে তাঁর প্রতি নাযিল হল সূরা নসর। সূরাটিতে তিনি নিজের ওফাতের কথা বুঝে নিলেন।[৪৩৯]

---

৪৩৫. মাওলানা সাঈদুর রহমান জালালাবাদী, 'অনন্তের পথে মহানবী (সা.)', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক ১৪২৬ হি*, ঢাকা : জা সী ক বা, মে ২০০৫, পৃ ১১৯-১৩০।

৪৩৬. সৈয়দ আলী আহসান, 'তিনি যেভাবে চলে গেলেন', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি*, পৃ ৯-২০।

৪৩৭. আবূ সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই, 'যেভাবে রসূলুল্লাহ (সা) ওফাত পেলেন', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, পৃ ১১৯-১২৬।

৪৩৮. নূরুল ইসলাম মানিক, 'নবীজী (সা)-এর অন্তিম দিনগুলো', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২১ হি*, পৃ ১১৯-১২৫।

৪৩৯. আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই, 'যেভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ওফাত পেলেন', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ১১৯-১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আলী আহসান *তিনি যেভাবে চলে গেলেন* প্রবন্ধে লিখেছেন :

> এরপর রাসূলে খোদা (সা.) মসজিদে গমন করে মসজিদের মিম্বারে বসলেন এবং সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আল্লাহ্ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার সকল ঐশ্বর্যের অনন্তকালীন অধিকার এবং আল্লাহর সান্নিধ্য এ দুইয়ের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলেছিলেন এবং সেই বান্দা আল্লাহর সান্নিধ্যকে বেছে নিয়েছে।' রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ কথায় পৃথিবী থেকে তার বিদায়ের ইঙ্গিত অনুভব করে হযরত আবূ বকর (রা) ক্রন্দন করতে লাগলেন। তিনি আবূ বকরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আবূ বকর, শান্ত হও ক্রন্দন করো না। তোমার ধনদৌলত এবং সাহচর্যের জন্য আমি তোমার নিকট সর্বাপেক্ষা ঋণী।' তারপর তিনি সকলের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এমন কোন নবী নেই যাকে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়া ও আখেরাত এ দুইয়ের মধ্যে একটিকে গ্রহণের এখতিয়ার দেওয়া হয় নি। আমার জীবন তোমাদের জন্য কল্যাণময় ছিল এবং আমার মৃত্যুও তোমাদের জন্য কল্যাণময় হবে। মৃত্যুর পর তোমাদের আমলগুলো আমার সামনে পেশ করা হবে। আমি তখন তোমাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করব।' তারপর তিনি মোহাজেরদের লক্ষ্য করে বললেন, 'মোহাজেরগণ, আনসারদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু আনসারদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসবে। তারা আমার বিশ্বাসভাজন। আমি তাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। তোমরা তাদের উপকারের প্রতিদান দিও এবং তাদের ত্রুটি এবং অপবাদ অযাচিতভাবে মার্জনা কর।'
>
> ...হযরত উম্মে আইমান বলেছেন, 'আমি তাঁর জন্য ক্রন্দন করি না। আমি কি জানি না যে তিনি যেখানে গিয়েছেন তার চেয়ে শুদ্ধতম জায়গা আর হতে পারে না! কিন্তু আমি কাঁদছি তার কারণ, আমরা চিরকালের জন্য ঐশীবাণীর স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।' যথার্থই ওহীর দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।[৪৪০]

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ *রেহলাতে রাসূল (সা)* প্রবন্ধে লিখেছেন :

> ...আল্লার রসূল (সা) জীবনকালেই বা ঘরে কি রাখতেন যে, মৃত্যুর পর তা পরিত্যক্ত হবে। পূর্বেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'আমরা নবীগণের কোন উত্তরাধিকারী নেই যা আমরা ছেড়ে যাই, তা সদকা বলে গণ্য।'
>
> আমর ইবনে হুয়াইবেস হতে বর্ণিত আছে, 'হুযুর (সা) মৃত্যুর সময় কোন কিছু ছেড়ে যাননি। স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা, দাস-দাসী ইত্যাদি কিছুই না। কেবলমাত্র তার আরোহণের একটি সাদা খচ্চর, ব্যবহারের অস্ত্র এবং সামান্য ভূমি ছিল, যা সাধারণ মুসলমানগণের মধ্যে দান করে দেওয়া হয়।'
>
> কতগুলো স্মরণীয় বস্তু সাহাবীগণ রক্ষা করেছিলেন। হযরত আবু তালহার (রা)-এর নিকট পবিত্র দাড়ির একগুচ্ছ কেশ ছিল। হযরত আনাস ইবনে মালেকের নিকট পবিত্র দাড়ি ব্যতীত একজোড়া জুতা এবং একটি কাঠের ভাঙ্গা পেয়ালা ছিল। তরবারি 'জুলফিকার' হযরত আলী (রা) নিকট রক্ষিত

---

৪৪০. সৈয়দ আলী আহসান, 'তিনি যেভাবে চলে গেলেন', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ ৯-২০।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। হযরত আয়েশার (রা) নিকট যে কাপড় পরিধানে থাকা অবস্থায় রাসূল খোদা (সা) ইন্তেকাল করেছিলেন তা রক্ষিত ছিল। পবিত্র সীলমোহর ও ষষ্ঠি হযরত সিদ্দিকের হাতে সমর্পণ করা হয়। এ ছাড়া গোটা মানবতার জন্য তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত ছেড়ে গেছেন, তা হচ্ছে আল্লাহ কিতাব কোরআন পাক।

রাসূল (সা)-এর ইন্তেকাল সম্পর্কে আরো কয়েকটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। সেগুলো হলো : মহানবীর সা. পরকালীন জীবনের প্রস্তুতি ও ইন্তেকাল[৪৪১], ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম।[৪৪২]

৪৪১. মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিছবাহ, 'মহানবীর সা. পরকালীন জীবনের প্রস্তুতি ও ইন্তেকাল', *মাসিক মদীনা*, ৪৪ বর্ষ ১২তম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, মার্চ ২০০৯, পৃ ২৩-২৬।

৪৪২. মাওলানা শাহ আবদুস সাত্তার, 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম', *সীরাতুন্নবী স. স্মরণিকা ১৪০৭ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, ১৪ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ ৫৬-৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

হায়াতুন্নবী

পবিত্র কুরআন-সুন্নাতে বিশ্বাসী ও অনুসারী (আহলুস-সুন্নাতে ওয়াল-জামা'আতের) সকল ইমাম, মুজতাহিদ ও 'উলামায়ে কিরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাস যে, হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম (সকল নবী-রসূল) ওফাতের পর নিজ নিজ কবরে জীবিত এবং নামায ও অন্যান্য ইবাদতে রত রয়েছেন। তাঁদের এ বরযখী (ওফাতের পর থেকে হাশরে উত্থান পর্যন্ত) জীবন আমাদের নিকট সহজবোধ্য নয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে এ জীবন দৈহিক অনুভূতিসম্পন্ন, সহজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। *হায়াতুন্নবী (সা) : তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা* প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা উপস্থাপ করা হয়েছে। প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে :

> 'হায়াতুন্-নবী' অর্থ নবীর হায়াত-নবীর জীবন... পবিত্র কুরআন-সুন্নাতে বিশ্বাসী ও অনুসারী (আহলুস-সুন্নাত ওয়া'ল জমা'আতের) সকল ইমাম, মুজতাহিদ ও উলামায়ে কিরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাস যে, হযরত আম্বিয়া আলায়হিমুস্ সালাম (সকল নবী-রসূল) ওফাতের পর নিজ নিজ কবরে জীবিত এবং নামায ও অন্যান্য ইবাদতে রত রয়েছেন। তাঁদের এ বরযখী (ওফাতের পর থেকে হাশরে উত্থান পর্যন্ত) জীবন আমাদের নিকট সহজবোধ্য নয়; কিন্তু নিঃসন্দেহে এ জীবন দৈহিক অনুভূতিসম্পন্ন, সহজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কেননা, আত্মিক ও মৌলিক জীবন তো সাধারণ মু'মিন মুসলমানসহ সকল কাফির মুশরিকেরও রয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট বর্ণনায় রয়েছে যে, "হযরত নবী করীম (সা) বদরের যুদ্ধে নিহতদের সম্বোধন করে কথা বলেছেন।'
>
> মাদারেজু'ন-নবুওয়্যাত ২য় খণ্ডের ৫৭৬ পৃষ্ঠায় শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) হাফিজে হাদীছ ইবনে আবদুল বার (র) ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি আপন মু'মিন ভাইয়ের কবরের কাছে যায়, যার সাথে জীবিত থাকাকালে পরিচয় ছিল, সে সালাম করলে কবরবাসী তাকে চিনতে পারে এবং তার সালামের জওয়াবও দেয়।' আরোও বর্ণিত আছে যে, মৃতকে যারা গোসল করায়, খাটিয়ায় উঠায়, কবরে রাখে, সবাইকে সে চিনতে পারে। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা পুস্তক যরকানীর ৫ম খণ্ডের ৩৩৪ পৃষ্ঠায়ও বর্ণনাটি রয়েছে।
>
> মুসনাদে আবূ ইয়া'লাতে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, 'নবীগণ নিজ নিজ কবরে যিন্দা রয়েছেন। তাঁরা সেখানে নামায ও দোয়া মোনাজাতে মশগুল রয়েছেন।' ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) এ হাদীছকে 'হাসান' বলেছেন।
>
> বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ জামে সগীরের ব্যাখ্যা ফয়যুল কদরের ৩য় খণ্ডের ১৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে, এ হাদীছ খানা 'সহীহ'। আল্লামা সুয়ূতী (র) 'মিরকাতুস-সুউদ হাশিয়ায়ে সুনান আবূ দাউদ'- এ উল্লেখ করেছেন যে, নবীগণের হায়াত সম্বন্ধে হাদীছের বর্ণনাগুলো 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।
>
> শিফাওস-সাকাম কিতাবের ১৪০ পৃষ্ঠায় আল্লামা সুব্কী (র) লিখেন, "একথা কখনো সম্ভব নয় যে, কোন শহীদ ব্যক্তি মহান আল্লাহর পিয়ারা নবী বা রসূলের তুলনায় উচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে! নবী-রসূলগণের মাধ্যমে যে দীন, শরী'আত প্রচারিত হয়েছে, তার হিফাযতের জন্য প্রয়োজনে অকাতরে জীবন দান করেই তাঁরা শাহাদতের দরজা লাভে সমর্থ হয়েছেন। কাজেই, যিনি দীন ও শরীআতের প্রবর্তক তাঁর হায়াত এ সব শহীদানের তুলনায় অনেক বেশী গাম্ভীর্যপূর্ণ। আর আমাদের নবী মুস্তফা (সা) যেহেতু সকল নবীর নবী, সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিয়্যীন, রাহমাতুল-লিল্-আলামীন, শাফীউল্-মুযনিবীন; কাজেই, তাঁর জিসমানী হায়াত কত যে শক্তিশালী মহাসত্য ভাষায় ব্যক্ত করা সুকঠিন।

সম্মানিত নবীগণের বরযখী জীবন শহীদের জীবন অপেক্ষা আরো অধিক শক্তিশালী। ওফাতের পর তাঁদের শরীর তো অটুট থাকেই, সেসঙ্গে যেহেতু তাঁরা আলমে বরযখে অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী জীবন ধারণ করে জীবন্ত রয়েছেন, তাই আলমে দুনিয়ায় এ পার্থিব জগতে ঐ জীবনের প্রমাণস্বরূপ এ নির্দেশ জারি হয় যে, তাঁদের পবিত্র বিবিগণ অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবেন না, তাঁদের ত্যাজ্য সম্পত্তি উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বিলি বন্টন করা যাবে না।[৪৪৩]

৪৪৩ মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার, 'হায়াতুন্নবী (সা) : তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৮ হি*, ই ফা বা, ১৯৯৭, পৃ ৫২-৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

শাফী'উল মুযনিবীন

রাসূলুল্লাহ (সা) গুনাহগার মু'মিনগণের নাজাতের জন্য রোজ হাশরে কঠিন বিচারের দিনে সুপারিশ করবেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) কে শাফী'উল মুযনিবীন (গুনাহগারদের জন্য সুপারিশকারী) বলা হয়। মু'তাযিলী সম্প্রদায় শাফা'আত বিরোধী। এ প্রেক্ষিতে শাফী'উল মুযনিবীন সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধসমূহের অবতারণা। কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে শাফিউল মুযনিবীন বিষয়টি প্রবন্ধ সাহিত্যে ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। এখানে এ ধারার প্রবন্ধসমূহ পর্যালোচনা করা হলো।

মাওলানা ফরিদুদ্দীন আত্তারের শাফিউল মুযনিবীন প্রবন্ধটি খুবই তাৎপর্যবহ সংযোজন। শাফি'উল মুযনিবীন প্রাবন্ধিকের মন্তব্য হচ্ছে :

> 'শাফাআত' অর্থ সুপারিশ করা। ইসলামী শরী আতের পরিভাষায় গুনাহগার মুমিনগণের নাজাতের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ করাকে শাফা'আত বলে।
>
> শেষ বিচারের সে কঠিন দিনে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম পর্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাবেন। মহিমান্বিত গৌরবান্বিত আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরযী পেশ করার মত সাহস হিম্মত কারুরই থাকবে না। ঐ কঠিনতম সংকটময় মুহূর্তে বিশ্বমানবের পক্ষে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর দরবারে শাফা'আত করার অনুমতি লাভ করবেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া সাল্লাম। সেদিন সকলেই তাঁর প্রশংসা করবেন, এমন কি আল্লাহ জাল্লাশানুহু নিজেও তাঁর প্রশংসা করবেন।
>
> মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন নবী করীম (স.) মুবারক দু'হাত উত্তোলন করে কেঁদে কেঁদে উম্মতের জন্য দু'আ করছিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরীল আলাইহিস্-সাল্লামকে হুকুম করলেন ঃ আমার মাহবুবকে জিজ্ঞাসা করে এসো তাঁর কাঁদার কারণ কি? জিবরীল আলাইহিস্ সাল্লাম এসে আরয করলে তিনি ইরশাদ করেন ঃ উম্মতের চিন্তায় আমার কান্না এসে যায়। রাব্বুল-আলামীন ইরশাদ করলেন ঃ জিবরীল! তুমি আমার হাবীবকে বলে দাও - আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে তুষ্ট করবো অর্থাৎ আমি আপনার প্রতি এতো অধিক পরিমাণে অনুগ্রহ করবো যে, আপনি শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।
>
> শাফা'আত সম্বন্ধে অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। ১. তফসীর কবীরে মুসলিম শরীফের বরাতে বর্ণিত হয়েছে - হযরত নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন ঃ সকল নবীকেই আল্লাহ পাক একটি দু'আ চেয়ে নেবার অধিকার দিয়েছেন। সবাই এ জগতে তা চেয়ে নিয়েছেন; কিন্তু আমি যে দু'আ সযত্নে রক্ষা করে চলেছি, শেষ বিচারের দিনে আমি তা কাজে লাগিয়ে আমার উম্মতের জন্য শাফা'আত করবো। আর আমার এ শাফা'আতের হকদার তারাই হবে যারা ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আসবে।[৪৪৪]

---

৪৪৪. মওলানা ফরীদুদ্দীন আত্তার, 'শাফীউল-মুযনিবীন,' *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, ই ফা বা, ১৯৯৫, পৃ ৪৩-৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন সব চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেছেন যা অতুলনীয় ও সীমাহীন। ঐসব বৈশিষ্ট্য আল-কুর'আন ও আল হাদীসে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বোচ্চ মর্যাদা ও অবস্থান এবং সকল নবী-রাসূলের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পরকালীন জীবনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রাপ্য সকল অনন্য ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য 'মাকামে মাহমুদ' হিসেবে বিবেচ্য হবে। 'মাকামে মাহমুদ : অর্থ ও তাৎপর্য' শীর্ষক প্রবন্ধে কিয়ামত দিবসে সকল উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুপারিশ করার বিষয়টি যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।[৪৪৫]

হাশরের ময়দানে ভয়ঙ্কর পরিবেশ বিরাজ করবে। চারিদিকে ভীতিকর পরিস্থিতি মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন কেউ কারো কাজে আসবে না। সবাই নফসী নফসী বলে বাঁচার ন্যূনতম উপায় তালাশে ব্যস্ত থাকবে। পাগলের মত ছোটাছুটি করবে দিশেহারা মানুষেরা। হন্যে হয়ে দৌড়াবে একটু মুক্তির সন্ধানে এখান থেকে সেখানে, এদিক থেকে ওদিক। ...উল্লেখিত ভয়ানক পরিস্থিতির চেয়েও আরো ভয়ানক আরো কঠিন। পবিত্র হাদীসের পরিভাষায় একদিকে এমন কঠিন অবস্থা অপরদিকে রৌদ্রের প্রখর তাপে পুড়ে যাবে আবার শরীর থেকে নির্গত ঘামের সাগরে সাতরাবে। এমন কঠিন দিবসেও যিনি আমাদেরকে তরিয়ে নেয়ার জন্য মুক্তি দেওয়ার জন্য নাজাত দেওয়ার জন্য মহান রবের দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন তিনি দু'জাহানের বাদশাহ্ উম্মতের দরদী মুক্তির কান্ডারী, শান্তির দিশারী নবীকুল শিরোমণী রাহমাতুললিল আলামীন সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আর তখনই সীমাহীন রাগান্বিত অবস্থায় থাকা মহান আল্লাহর দরবারে রহমতের জোয়ার এসে যাবে। গভীর ভালবাসার কণ্ঠে ডাক দেবেন, হে প্রিয় হাবীব!

আপনি মাথা মোবারক উত্তোলন করুন, আপনি আবেদন করুন মঞ্জুর করা হবে, আপনি শাফায়াত করুন কবুল করা হবে। অতঃপর আমি মস্তক উত্তোলন করব আর বলব- ওহে রব! আমার উম্মত আমার উম্মত।

তিনি উম্মতের দরদী, মুক্তির কান্ডারী রাহামতুললিল আলামীন তিনিই শাফিউল মুজনেবীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

হযরত আদম বিন আলী হতে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র কাছে শুনেছি তিনি বলেন - কেয়ামত দিবসে সকল মানুষ হতাশচিত্তে এদিক সেদিক দৌড়াতে থাকবে তারা স্ব-স্ব নবীদের কাছে গিয়ে শাফায়াতের ভিক্ষা করবে কিন্তু সকলে তাদেরকে ফেরত দিয়ে দেবে পরিশেষে সে দায়িত্বটা এসে বর্তাবে আমার উপর। সেদিন আমাকে মাকামে মাহমুদে আসীন করা হবে। অচিরেই আপনার বর আপনাকে মকামে মাহমুদে বসাবেন।

---

৪৪৫. মোঃ ইসমাইল মিঞা, 'মাকামে মাহমুদ : অর্থ ও তাৎপর্য', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৫৩-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুফাসসিরীন বলেন, মাকামে মাহমুদ বলতে বুঝানো হয়েছে শাফায়াতে কুবরা। এটা এমন একটি মর্যাদা যাতে অন্য কেউ আসীন হতে পারবে না, কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। এ মাকামে মাহমুদ দেখে ছোট বড় সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকবেন।

'শাফিউল মুজনেবীন' প্রবন্ধে প্রবন্ধকার বেশ ক'টি হাদীস উপস্থাপন করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শাফায়াত উম্মতের জন্য যে বিশেষ একটি রহমত তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে।[৪৪৬]

'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শাফা'আত' প্রবন্ধটি প্রাসঙ্গিক রচনাসমূহের একটি সমৃদ্ধ সংযোজন। প্রাবন্ধিক তাঁর প্রবন্ধে কুরআন ও হাদীসের আলোকে শাফা'আত বিষয়টি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন :

> মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই অসীম অনন্ত ও অবিনাশী রহমতের ধারা অফুরন্ত। আল্লাহর সৃষ্টিকুল দুনিয়াতে তাঁর এই রহমতের দ্বারা সিক্ত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সিক্ত হতে থাকবে। কিন্তু কিয়ামতের ভয়াবহ বিভীষিকাময় দিবসে এই মহান দ্বারা সিক্ত হবেন এবং উপকৃত হবেন একমাত্র ঈমানদার মুসলিমগণ। নবী করীম (সা)-এর এই রহমত-ধারা হাশর ময়দানে সমবেত অগণিত মানুষের মধ্যেও প্রবহমান থাকবে। তাঁরই দু'আয় মহান আল্লাহ্ হিসাব-নিকাশ শুরু করবেন। তাঁর রহমতের অমীয় স্রোতধারার আরেকটি উজ্জ্বল দিক হবে আল্লাহ্ প্রদত্ত হাউযে কাউসার এবং সর্বশেষ রহমত হবে গুনাহগার উম্মাতের জন্য শাফা'আতের দ্বার উন্মোচন।[৪৪৭]
>
> হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে : 'হাশর ময়দানে যখন সূর্য মানুষের অতি নিকটে চলে আসবে। সূর্যের তাপে মানুষ তার আমল অনুসারে নিজ ঘামে নিমজ্জিত হবে। মানুষ কষ্টে দুশ্চিন্তায় পেরেশানীতে হাবুডুবু খাবে। এমন এক সংকটময় মুহূর্তে দয়াল নবী রাহমাতুল লিল আলামীন মানুষের শাফা'আত তথা মুক্তির জন্য এগিয়ে আসবেন। সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন মহান প্রভুর আরশের নিচে।'
>
> এ মহান শাফা'আত কি, এর পরিধি কতটুকু? সরলভাবে শাফা'আতের সংজ্ঞা এভাবে বলা যেতে পারে যে, কিয়ামতের দিন পাপী ঈমানদারগণের পাপ ও শাস্তি ক্ষমার জন্য আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে সুপারিশ করার নামই হলো 'শাফা'আত'। মু'তাযিলা ও বিদ'আতপন্থীরা ব্যতীত গোটা মুসলিম উম্মাহ শাফা'আতের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন। শাফা'আত বহু প্রকারের হবে। তন্মধ্যে শাফা'আতে উলা বা উযমা-ই হবে প্রধান। এ শাফা'আত একমাত্র আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য খাস হবে। এ শাফা'আতের অধিকারী অন্য কোন আম্বিয়া ও রাসূলগণ লাভ করবেন না।

---

৪৪৬ মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন, 'শাফিউল মুজনেবীন', *মাসিক তরজুমান*, পৃ ৭-৮।

৪৪৭. মাওলানা এ. এম. এম সিরাজুল ইসলাম, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শাফা'আত', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃ ১৪৭-১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য 'শারহে ফিকহে আকবর' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে যে, সকল প্রকারের শাফা'আতই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য 'আম-ব্যাপক হবে এবং কোন কোন শাফা'আত তাঁর জন্য খাস হবে। অন্য কেউ এ খাস শাফা'আতের অধিকারী হবেন না। শাফা'আতের দরজা প্রথমে তিনিই উন্মুক্ত করবেন। যেহেতু তিনিই হবেন 'মাকামে মাহমূদে' উন্নীত, হামদের সূমহান পতাকাবাহী এবং হাউযে কাউসারের মালিক। তাঁর শাফা'আতে তাঁর উম্মাতের সগীরা গুনাহকারী পাপী উম্মাত যারা শাস্তিরযোগ্য এবং কবীরা গুনাহকারী মু'মিন যাদের শাস্তি অবধারিত তারা সকলেই মুক্তি পাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শাফা'আত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : '(হে রাসূল) আপনার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' (সূরা মুহাম্মদ : ১৯)

Dhaka University Institutional Repository

আখলাক

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন : 'নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।'[৪৪৮] আখলাকুন্নবী (সা) বিষয়ক প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং তা আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে কিরূপ সহায়ক মূলত তাই উপস্থাপন করা হয়েছে। এরূপ ক'টি প্রবন্ধ হল : প্রিয় নবী (সা)-এর জীবনের বৈশিষ্ট্য[৪৪৯], সর্বোত্তম আখলাক যাঁর[৪৫০], ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে মহানবী (সা)-এর আদর্শ[৪৫১], আখলাকুন্নবী (সা)[৪৫২], রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ : কথা বলার আদব[৪৫৩], অনুপম চরিত্র মাধুরী[৪৫৪], আখলাকুন্নবী (সা)[৪৫৫], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনন্য চরিত্র বৈশিষ্ট্য[৪৫৬], অমুসলিমদের প্রতি মহানবী (সা)-এর ব্যবহার[৪৫৭] এবং সর্বোত্তম মানবিক আখলাকের রূপায়নে মহানবী (সা)[৪৫৮]। তাঁর অনুপম আদর্শ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক *রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য* প্রবন্ধে লিখেছেন :

---

৪৪৮. আল কুর'আন, ৬৮ : ৪।

৪৪৯. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'প্রিয় নবী (সা)-র জীবনের বৈশিষ্ট্য', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৬-২৩।

৪৫০. মাওলানা মুহম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার, 'সর্বোত্তম আখলাক যাঁর', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১১ হিজরী বিশেষ সংখ্যা, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯০, পৃ ২৫-২৭।

৪৫১. এ. জেড. এম শামসুল আলম, 'ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে মহানবী (সা)-এর আদর্শ', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, পৃ ১৫-২০।

৪৫২. মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান, 'আখলাকুন্নবী (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ৭৪-৭৯।

৪৫৩. মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার, 'রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ : কথা বলার আদব', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা* ১৪২০ হি, পৃ ৭৮-৮০।

৪৫৪. মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন, 'অনুপম চরিত্র মাধুরী', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৬০-১৬৮।

৪৫৫. আবদুল মতীন জালালাবাদী, 'আখলাকুন্নবী (সা)', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল ২০০৭, পৃ ৯৪-৯৭।

৪৫৬. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনন্য চরিত্র বৈশিষ্ট্য', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল ২০০৭, পৃ ৪৩-৪৭।

৪৫৭. মোহাম্মদ আবদুল খালেক, 'অমুসলিমদের প্রতি মহানবী (সা)-এর ব্যবহার', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪২ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ ১৩৩-১৫০।

৪৫৮. মাওলানা খন্দকার মনসুর আহমদ, 'সর্বোত্তম মানবিক আখলাকের রূপায়নে মহানবী (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৮৪-১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) নবুয়ত লাভের পর সব সময় তাঁর সাহাবীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন না, বরং তিনি মক্কায় কুরাইশদের মধ্যে অবস্থান করতেন। তিনি তাঁর নবুয়ত পূর্ব দীর্ঘ চল্লিশটি বছর তাদের মাঝে কাটান। এ সময় তাঁর ব্যবসায়ী জীবন, লেনদেন, ব্যবহারিক ও কারবারী জীবন, যেখানে প্রতি পদে পদে অসদ্ব্যবহার, ওয়াদা খেলাফী ও খিয়ানতের গভীর আবর্ত বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তিনি এমন সতর্কতার সাথে এ পথ অতিক্রম করেন যে, তাঁকে মক্কার জনগণ 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) উপাধি প্রদান করে। আর তাঁর নবুয়ত লাভের পরেও, তাঁর দীন গ্রহণ না করেও লোকেরা তাঁকে আগের মত বিশ্বস্ত মনে করতেন এবং তাদের আমানত তাঁর কাছেই গচ্ছিত রাখতেন। হিজরতের সময় লোকদের আমানত নিজে ফেরত দেওয়ার সময় না পাওয়ায়, তিনি হযরত আলী (রা)-কে লোকদের আমানত ফিরিয়ে দেবার জন্য মক্কায় রেখে যান। আমানতদারীর এ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দুনিয়ার ইতিহাসে আর কোথাও নেই।[৪৫৯]

মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম *হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর সুমহান চরিত্র মাধুর্য* প্রবন্ধে কতিপয় বিষয়ের আলোকপাত করেছেন :

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্যে রহমত। তিনি মানুষকে দয়া-মায়া এবং উত্তম চারিত্রিক গুণ অর্জনের শুধু নির্দেশই দেন নি, বরং দয়া ও উত্তম চরিত্র গঠনের পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর এই পবিত্র শিক্ষা দ্বারা শুধু তাঁর অনুগত লোকেরাই উপকৃত হয়েছে এমন নয়, বরং তাঁর দুশমনরাও সমানভাবে উপকৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর শত্রু-মিত্রে কোন পার্থক্য ছিল না। তাঁর সুমাহান চরিত্র মাধুর্য মানুষের চিত্ত হরণ করে নিল। দিকে দিকে তাঁর প্রশংসা ছড়িয়ে পড়লো এবং তিনি আল-আমীন (বিশ্বস্ত) খেতাবে ভূষিত হলেন। তাঁর ভাষা ছিল সর্বদা সত্য, মার্জিত এবং আন্তরিকতাপূর্ণ। আমানত এবং ওয়াদা তিনি পুরোপুরি রক্ষা করতেন। দাস-দাসী এবং খাদেমদের ভুল-ত্রুটি তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দখতেন। বিরুদ্ধবাসীদের আচরণের প্রতি তিনি ছিলেন সহনশীল। ব্যক্তিগত ব্যাপারে দুশমনের উপর কখনও প্রতিরোধ গ্রহণ করতেন না। তাঁর কথা এবং কাজের মধ্যে চমৎকার সামঞ্জস্য ছিল। বিনয়, আন্তরিকতা এবং সন্তুষ্টি সকল বিষয়েই পরিলক্ষিত হতো। চরার পথে যদি কোন শিশুকে দেখতে পেতেন, তবে তাকে কোলে তুলে আদর করতেন। কারো মাথায় হাত বুলাতেন অথবা পিঠে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিতেন। সামায্য-প্রার্থীকে কখনও ফিরিয়ে দিতেন না। যখন কোন ব্যক্তি কোন কিছু বলতে চাইতো তখন তিনি পূর্ণ মনোযোগের সাথে তার কথা শ্রবণ করতেন এবং প্রশান্ত চিত্তে তার জবাব দিতেন। তিনি মেহমানদেরকে আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করতেন। গরীব ও বিপদগ্রস্তদের দুঃখে তিনি দুঃখিত হতেন এবং সমবেদনা জানাতেন।

---

৪৫৯. ড. আ. ফ. ম আবু বকর সিদ্দীক, 'রাসূলুল্লাহ (সা)- এর অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৬-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আশ্রয়হীন, মজলুমের সাহায্যে তিনি এগিয়ে আসতেন এবং জালিমকে জুলুম থেকে বিরত রাখতেন।[৪৬০]

মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান *আখলাকুন্নবী (সা)* প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন :

'আখলাকুন্নবী' নবী করীম (সা)-এর আখলাক বা চরিত্র পৃথিবীর যাবতীয় আখলাক বা সৎচরিত্রের সমাহার। এটি একটি চারিত্রিক প্রতিষ্ঠান। এক কথায় সৃষ্টিলোকে চরিত্র মাধুর্য বলতে যা বোঝায় তা-ই আমাদের বিশ্বনবীর চরিত্র তথা আখলাকুন্নবী। তাঁর চরিত্রের প্রতিটি দিকই হচ্ছে গোটা মাখলুকাতের জন্য উত্তম আদর্শ।

কঠোরতা এবং নম্রতা, মানব জীবনের বিপরীতধর্মী এই দুটি উপাদান মিলে কত যে সুন্দর চরিত্রের সৃষ্টি হতে পারে তার অপূর্ব এবং অনুপম নমুনা হচ্ছে আখলাকুন্নবী। এ সম্পর্কে সূরায়ে ফাতহের ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল আর তাঁর সাহাবীরা কাফিরদের প্রতি কঠোর, অথচ নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহনশীল, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখতে পারেন। তাদের চেহারায় রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তাদের এ উদাহরণ তাওরাত বা ইঞ্জিলে রয়েছে।' এজন্যই মহান রাব্বুর আলামীন সূরায়ে হাশরের ৭ম আয়াতে ইরশাদ করেন, 'রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর আর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।' এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানব জীবনের চারিত্রিক এমন কোন দিক নেই যার সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর পক্ষ থেকে কোন দিকনির্দেশনা নেই।[৪৬১]

মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান *বিচারক হিসাবে নবী করীম (সা)-এর ভূমিকা* প্রবন্ধে অনুপম একটি বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন :

সাহাবী আবূহাদরাদ সলিমীর নিকট জনৈক ইয়াহুদীর কিছু পাওনা ছিল। ইয়াহুদী তাকে ধরে এনে নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত করল। রায় হল, এ মুহূর্তেই ঋণ পরিশোধ করে দিতে হবে। সালিমী আরয করলেন, "আমি এ মুহূর্তে তা পরিশোধ করতে পারব না। আসন্ন খায়বর যুদ্ধ হতে ফিরে এসে তা পরিশোধ করে দেব।" নবী করীম (সা) কোন ওযর-আপত্তি শুনলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি তার গায়ের কাপড় বিক্রি করে সই ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য হলেন। (মুসনাদে আহমদ) এ ধরনের ইনসাফ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুপম বিচারনীতির নিদর্শন। তিনিই পৃথিবীতে রসূল হিসেবে

৪৬০. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'হযরত রসূলে করীম (সা)-এর সুমহান চরিত্র মাধুর্য', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মীলাদুন্নবী (সা) ১৪২০, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৯, পৃ ৭-১৪।

৪৬১. মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান, 'আখলাকুন্নবী (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ৭৪-৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

> আল্লাহর তরফ থেকে শ্রেষ্ঠ মনোনীত বিচারক ছিলেন এবং তাঁর প্রতিটি বিচার-কার্য আমাদের জন্য অনুসরণীয় অনুকরণীয় সর্বোত্তম আদর্শ।[৪৬২]

মাওলানা খন্দকার মুশ্‌তাক আহমদ শরীয়তপুরী *নবী (সা) জীবনের টুকরো কথা* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন :

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সকল উন্নত ও উত্তম গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক। যে কোন শ্রেণীর মানুষ জীবনের যে কোন অবস্থা ও পরিস্থিতিতে নবী জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। সামগ্রিক মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বজনীন নীতি-আদর্শের একমাত্র উৎসই হচ্ছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যক্তিসত্তা ও নীতি-দর্শন। সে মহান ও ব্যাপক জীবনাদর্শ থেকে এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো ।

> প্রিয়নবী (সা) যখন ইন্তিকালের শয্যায় শায়িত, তখনকার কথা নবীজী (সা)-এর মনে পড়লো যে, ঘরে এখনো কিছু আশরফি বা স্বর্ণমুদ্রা রয়ে গেছে। নবীজী (সা) হুকুম করলেন ওগুলো দান করে দিতে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য এমনটি শোভনীয় নয় যে, সে তার খালিক বা স্রষ্টা আল্লাহর দরবারে হাযির হতে যাচ্ছে আর তখনো তার ঘরে আশরফি পড়ে আছে।
>
> মক্কার কুরাইশ নেতারা সকলে মিলে যখন প্রিয়নবী (সা)-কে শহীদ করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিলো এবং বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা একত্রিত হয়ে নবীজী (সা)-এর ঘরের চতুর্দিকে খোলা তরবারী নিয়ে দাঁড়িয়ে গেরো, সে সময় প্রিয়নবী (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বাড়ি গেলেন এবং তাঁকে হিজরতের কথা জানালেন। তৎক্ষণাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) দু'টি উট এনে হাযির করে বললেন, 'হিজরতের জন্যই এ দু'টি উট। একটিতে আপনি আরোহরণ করবেন আর অপরটিতে আমি আরোহরণ করবো।' এ চরম সংকটাপন্ন ও বিভীষিকাপূর্ণ মুহূর্তেও প্রিয়নবী (সা) নিজ স্বকীয়তা ও স্বনির্ভরতাকে ভুলে যাননি, বরং প্রথমে তিনি হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে তার উটটির মূল্য পরিশোধ করে দিরেন। অতঃপর তিনি তাতে আরোহরণ করলেন।[৪৬৩]

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ অনুবাদক : মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী *রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহান চরিত্র* প্রবন্ধে হযরত আলী (রা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন :

> ইমাম হুসায়ন (রা) হযরত আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বলেছিলেন : 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী, কোমলহৃদয় এবং দয়ালু। তিনি কর্কশ স্বভাব কিংবা সংকীর্ণমনা ছিলেন না। কোন খারাপ কথা কখনো তাঁর মুখ দিয়ে বের হত না। অন্যের জন্য বিরক্তিকরন হতে পারে এমন কোন কাজ তিনি

---

৪৬২. মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান, *বিচারক হিসাবে নবী করীম (সা)-এর ভূমিকা*, অগ্রপথিক, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ১৪২১ হিজরী।

৪৬৩. মাওলানা খন্দকার মুশ্‌তাক আহমদ শরীয়তপুরী, *নবী (সা) জীবনের টুকরো কথা*, অগ্রপথিক, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮ হিজরী।

Dhaka University Institutional Repository

করতেন না। কোন কথা তাঁর পছন্দ না হলে তিনি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। তিনটি বিষয় থেকে তিনি সব সময় নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতেন। সেগুলো হলো : (ক) তর্ক বিতর্ক, (খ) প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা বলা এবং (গ) অনর্থক কথার পেছনে লেগে থাকা। অন্যদের সম্পর্কেও তিনটি বিষয়ে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যেমন- (ক) কাউকে তিনি মন্দ বলতেন না, (খ) কারো ছিদ্রান্বেষণ করতেন না এবং (গ) কারো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাতেন না। তিনি শুধু সে কথা বলতেন বা সে কাজ করতেন, যা থেকে কোন না কোনভাবে উপকৃত হওয়া যেত।[৪৬৪]

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম *প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শে সৌন্দর্য-চেতনা ও পরিমিতিবোধ* বিষয়ে বলেছেন :ম

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে তশরীফ আনলেন নবী আগমনের ধারাবাহিকতায় সবার শেষে। তিনি খাতামুন নাবীয়ীন — সর্বশেষ নবী। তিনি এলেন সমগ্র মানব জাতির জন্য, তিনি এলেন সমগ্র বিশ্বের জন্য। তিনি মানুষের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রগতিশীল জীবন ব্যবস্থা এনে দিলেন যার নাম ইসলাম। ইসলাম আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা। তিনি দিলেন মানবিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করবার তাবৎ নীতি। তিনি সৌন্দর্য-চেতনায় মানুষকে উদ্ভাসিত করলেন এবং পরিমিতিবোধে তাদেরকে উজ্জীবিত করলেন।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা এসেছে। তিনি যে সৌন্দর্য-চেতনা ও পরিমিতিবোধ মানুষের জন্য স্থাপন করে গেছেন এবং তারই মাধ্যমে আমরা যে প্রগতিশীল জীবন-ব্যবস্থা পেয়েছি তা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করার মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।[৪৬৫]

এ. জেড. এম. শামসুল আলম *ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে মহানবী (সা)-এর আদর্শ* প্রবন্ধে বলেছেন :

শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা

শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা আমাদের মহানবী (সা)-এর সমগ্র জীবনের আদর্শ। তিনি শিশুকাল থেকে ওফাত পর্যন্ত বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলেছেন। বালক কিশোর মুহাম্মদ (সা)-এর সুস্পষ্ট উচ্চারণ ও ভাষাজ্ঞান লক্ষ্য করে অন্যরা জানতে চাইতেন মুহাম্মদ (সা) কোন পরিবারের সন্তান। আরব দেশে কোন রাজবংশ বা রাজপরিবার ছিল না। সারা আরবের নেতা ছিল কুরাইশ গোত্র। আর কুরাইশদের নেতা ছিলেন আবদুল মুত্তালিব। আরবে যদি রাজতন্ত্র থাকত, তবে রাজবংশ কুরাইশ গোত্রের বনূ হাশিম এবং রাজপরিবার হতো মুত্তালিব পরিবার। আবদুল মুত্তালিবের পর রাজা হতেন আবূ তালিব এবং অতঃপর মুহাম্মদ (সা)।

---

৪৬৪. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহান চরিত্র', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩১ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৩-২০।

৪৬৫. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, 'প্রিয় নবী (সা)-এর সৌন্দর্য-চেতনা ও পরিমিতিবোধ', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) স্মরণিকা ১৪২২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ৪৭-৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

হাসিমুখে কথা বলা

সদা সর্বদা হাসিমুখে থাকা আমাদের নবীর একটি সুন্নত। তিনি কখনো অট্টাহাস্য করতেন না। কিন্তু স্মিত হাসি তাঁর মুখে লেগে থাকত। প্রফুল্ল বদন ও স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি সবাইকে আপ্যায়ন করতেন, অভিনন্দন জানাতেন। হাসির মাধ্যমে তিনি পথচারী অভ্যাগতদের আকর্ষণ করতেন।

আগে সালাম দেয়া

নবী করীম (সা.)-কে আগে সালাম দেয়া সাহাবীদের পক্ষে কঠিন হতো। আগে সালাম দেওয়ায় সওয়াব বেশী এবং এটা নবীর সুন্নাহ। যিনি আগে সালাম দেন, তাঁর প্রতি সালাম গ্রহীতার সহানুভতিও ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়।

দৃঢ়তার সাথে কথা বলা

জনগণের সঙ্গে কথা বলা এবং উন্নয়নমূলক কাজে তাদরকে উদ্বুদ্ধ করার সময় অত্যন্ত বিনম্রভাবে কথা বলতে হবে। কিন্তু কথার মধ্যে দৃঢ়তা থাকতে হবে। বক্তব্যের মধ্যে জোর থাকতে হবে, যাতে শ্রোতাদের মনে এ বিশ্বাস হয় যে, বক্তব্যটি আসছে অন্তর থেকে।

তর্কে অবতীর্ণ না হওয়া

আলিম, মুবাল্লিগ ও দীনদারদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত কাউকে তর্ক-যুদ্ধে পরাজিত করা নয়, মূলত তাদেরকে জয় করা। প্রয়োজনবোধে বাহ্যত পরাজয়ও স্বীকার করে নিতে হয়, যদি তাতে অন্য পক্ষের মন জয়ের সম্ভাবনা থাকে।[৪৬৬]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আখলাক বিষয়ক আরো ক'টি প্রবন্ধ হচ্ছে : প্রিয়নবী সা. ও সামাজিক শিষ্টাচার[৪৬৭], নবুয়তপূর্ব জীবনে মহানবী সা.-এর চরিত্র মাধুর্য[৪৬৮], হযরত রসূলে করীম (সা)-এর সুমহান চরিত্র মাধুর্য, রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ : কথা বলার আদব[৪৬৯], সৌন্দর্য-চেতনা ও পরিমিতিবোধ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনন্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্য[৪৭০], আখলাকুন্নবী (সা)[৪৭১], নৈতিকতা বিকাশে মহানবী (সা)।[৪৭২]

---

৪৬৬. এ. জেড. এম শামসুল আলম, 'ব্যক্তিত্বের বিকাশে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ১২৯-১৩৪।

৪৬৭. মাহমুদাতুর রহমান, 'প্রিয়নবী সা. ও সামাজিক শিষ্টাচার', *মাসিক মদীনা*, ৪৪ বর্ষ ১২তম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, মার্চ ২০০৯, পৃ ৪০-৪৪।

৪৬৮. আমিনুল হক নো'মানী, 'নবুয়তপূর্ব জীবনে মহানবী সা.-এর চরিত্র মাধুর্য', *মাসিক মদীনা*, ৪৪ বর্ষ ১২তম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, মার্চ ২০০৯, পৃ ৬০-৬২।

৪৬৯. ঢাকা : ই ফা বা, জুন ১৯৯৯, পৃ ৭৮-৮০।

৪৭০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনন্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্য', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৩৪-৪২।

Dhaka University Institutional Repository

হুব্বে রাসূল (সা)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ভালোবাসা, ভক্তি-অনুরক্তি ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এরশাদ করেছেন : 'তোমাদের কেউ সে পর্যন্ত প্রকৃত মোমেন হতে পারবে না যে পর্যন্ত আমি তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় না হই তার পিতা থেকে, তার সন্তান-সন্ততি থেকে এবং সমস্ত মানুষ থেকে' (বুখারী, মুসলিম)। প্রকৃত মুমিন হওয়ার পূর্ব শর্ত রাসূল (সা) কে ভালোবাসা। এখানে প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধের পর্যালোচনা করা হলো :

মাওলানা আহমদ আবুল কালাম *রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সাহাবা-ই-কিরাম-এর ভালবাসা* প্রবন্ধে বলা হয়েছে :

> মদীনার আশিকে রাসূলগণ যখন শুনলেন যে রাসূলুল্লা (সা) মক্কা থেকে তাঁদের মধ্যে মদীনায় চলে আসছেন তাদের মধ্যে সীমাহীন আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। চরম প্রসন্নতার উত্তাল সমুদ্রে তারা হাবুডুবু খেতে থাকে। কত তাড়াতাড়ি তাঁর তাঁদের প্রিয় মানুষটিকে কাছে পেতে পারেন এজন্য তাঁরা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাছে পাওয়ার জন্য তাঁদের সেই ব্যাকুলতা, তাঁদের উদগ্র পদচারণা, উন্মত্ত অস্থিরতা, তাঁদের অকল্পনীয় বিস্ময়কর প্রতীক্ষা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে তাঁদের সেই বিস্ময়কর প্রতীক্ষার যে বিবরণ আছে তা এরূপ : মদীনার নও-মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মক্কা থেকে চলে আসার সংবাদ শুনে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দিন কাটায়। তারা যখন থেকেই প্রতিদিন প্রত্যুষে 'হাররায়' যেয়ে উপনীত হত এবং অপলক নেত্রে তাঁর জন্য প্রতীক্ষায় থাকত যতক্ষণ না দ্বিপ্রহরের কঠিন রৌদ্রতাপ তাদের বাড়ি প্রত্যানীত করত। এভাবে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করতে করতে এক দিন তাদের প্রতীক্ষার অবসান হল। অবশেষে তারা বাড়িতে ফিরে আসার মুহূর্তে পাহাড়ের উঁচু টিলার উপর থেকে এক ইয়াহুদী তাদের তার সংবাদ দিল যেজন্য তারা এতদিন প্রতীক্ষা করছিল। তারা অধীর আগ্রহভরে উৎসুক নয়নে সামনে তাকালে অকস্মাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) ধ্রুবতারার ন্যায় তাদের দৃষ্টিগোচর হন। তাদের দৃষ্টিগোচর হয় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গ সাহাবা-ই-কিরামও। রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহারা-ই-কিরামের দর্শনে তাদের চোখের মরীচিকা দূরীত হয়। সময়ক্ষেপণ না করেই উক্ত ইয়াহুদী জোরে চীৎকার করে বলে ওঠে, 'ওহে আরবের বহুধারিবিচ্ছিন্ন জাতি। এই তোমাদের মহাননায়ক-যার জন্যে তোমরা প্রতীক্ষা করছিলে।' রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পেয়ে নও-মুসলিমরা উত্তাল আবেগে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। হাররা'র রৌদ্রতাপের মধ্যে একে একে তাঁর সাক্ষাত রাভ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বনী আমর ইবন আউফ গোত্রে অবতরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ভ্যর্থনা জানাতে মদীনাবাসী নওমুসলিমদের এই যে আগ্রহ-

---

৪৭১. আবদুল মতীন জালালাবাদী, 'আখলাকুন্নবী (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৯৪-৯৭।

৪৭২. মাসুদ মজুমদার, 'নৈতিকতা বিকাশে মহানবী (সা)', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১০০-১০২।

Dhaka University Institutional Repository

> উদ্দীপনা, এই যে সকাল দুপুর প্রতীক্ষা তা নিশ্চিত প্রমাণ করে তারা কত মনপ্রাণ দিয়ে একদম অন্ধভাবে আল্লাহর রাসূল (সা)-কে ভালবাসতেন। ইবন সা'দের বর্ণনায় তাদের প্রতীক্ষার কথা এভাবে বলা হয়েছে, সূর্যের প্রখর তাপ যখন তাদের প্রজ্বলিত করত তাঁরা তখন বাড়ি ফিরে যেতেন। ইমাম হাকিম-এর বর্ণনায় আছে, তাঁরা প্রতীক্ষায় থাকতেন যতক্ষণ না দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতাপ তাঁদের কঠিন কষ্ট দিত। তাঁদের প্রতীক্ষার ধরন সম্পর্কে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 'হাররা'-এর এক প্রান্তে অবতরণ করলে (মদীনার) আনসাররা সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। তাঁরা দ্রুত চলে এলেন আল্লাহর নবী ও তাঁর সঙ্গী হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকটে। তাঁরা তাঁদের উভয়কে সালাম দিয়ে বললেন, ইরকাবা আমীনাইনি মুতাআইন – আপনারা উভয়ই আরোহরণ করুন নিরাপদে এবং আনুগত্যের নেতারূপে।

মোট কথা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শুভাগমনে মদীনার আকাশ-বাতাস, মাটি-বৃক্ষ, পাহাড়-পর্বত, পাথর – সবকিছু আনন্দে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। সমগ্র মদীনা উজ্জ্বল আভায় আলোকিত হয়ে ওঠে। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন : 'আমি অত আলোকোজ্জল, অত সুন্দর কোন দিন দেখতে পাইনি সেই দিনের চেয়ে, যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা) মদীনায় শুভাগমন করলেন।' হযরত বারা ইবন আযিব (রা) বলেন : 'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শুভাগমনে মদীনাবাসীরা যেরূপ আনন্দিত হয়েছেন, সেরূপ আনন্দিত হতে তাঁদরকে আর আমি কোন কিছুতেই দেখতে পাইনি।'

> রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ভালবাসার তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপরিউক্ত মন্তব্যে। তিনি ইনতিকাল করেছেন তবুও তঁর আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার নাম তাঁকে ভালবাসা। তাঁর আদর্শ তাঁর প্রত্যাশিত চাহিদা অনুযায়ী সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার নাম তাঁকে ভালবাসা। তিনি যা যা নিষেধ করেছেন সেসব থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকার নাম তাঁকে ভালবাসা। তিনি দীন-প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব কাজ করে গেছেন সেসব কাজ করার নাম তাঁকে ভালবাসা। তিনি দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব কাজ করে গেছেন সেসব কাজ করার নাম তাঁকে ভালবাসা। তিনি যা পছন্দ করতেন – চলতে ফিরতে উঠতে বসতে তথা সার্বিক আচার-আচরণে তা করার নাম তাঁকে ভালবাসা আর তিনি যা অপছন্দ করতেন তা না করার নাম তাঁকে ভালবাসা। তাঁর জীবনাদর্শের অনুকরণের নামই রাসূল-প্রেম। তাঁর নিজের জীবনাদর্শ ও তাঁর আনীত শরীআ অনুসরণের মধ্য দিয়ে তাঁকে যে ভালবাসা সমর্পণ করা হয় উক্ত ভালবাসার নামই ঈমান বা ইসলাম।[৪৭৩]

মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম *হযরত রসূলে (সা)-এর প্রতি মহব্বতের তাৎপর্য* শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন :

---

৪৭৩. মাওলানা আহমদ আবুল কালাম, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সাহাবা-ই-কিরাম এর ভালবাসা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মীলাদুন্নবী (সা) ১৪২০, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৯, পৃ ১০৭-১২০।

Dhaka University Institutional Repository

ওহুদের যুদ্ধে দুশমনরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করছিল। তিনি তখন ইরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছো যে, এ মুহূর্তে আমাকে আড়াল করে আমার সম্মুখে দাঁড়াতে পার? সংগে সংগে এক সাহাবী তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল তাঁর বক্ষে ৮৩টি তীর বিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু একটি তীরও পৃষ্ঠে বা পাঁজরে বিদ্ধ হয়নি। আর ক্ষণিকের জন্য তিনি স্থান পরিবর্তন করেন নি। এমনি মহব্বতের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। ওহোদের যুদ্ধেই দুশমনের আঘাতের কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কপাল মুবারকে লৌহ খণ্ডটি বের করলেন। এতে তাঁর দুটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কপাল মুবারক থেকে রক্ত ছুটলো। মাখি ইবনে সিনান (রা) কপাল মুবারকে চুম্বন করে রক্ত চুষে পান করতে লাগলেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, মালিক! তোমার উপর দোযখের অগ্নি হারাম হয়ে গেলো। কেননা তোমার দেহে নবীর রক্ত প্রবেশ করেছে।

এ ওহোদের যুদ্ধেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চারটি দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছিল। এ খবর পেয়ে হযরত ওয়ায়েস করনী (র) তাঁর ৩২টি দাঁত ভেঙ্গে দিলেন। লোকেরা বললো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তো চারটি দাঁত শহীদ হয়েছে। আপনি তাঁর শোকে সবগুলো দাঁত কেন ভাঙ্গলেন? তিনি বললেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কোন্ দাঁতগুলো ভেঙ্গেছে, তা আমি জানি না। তাই আমার সব দাঁত আমি ভেঙ্গে দিলাম। তাঁর অন্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কত মহব্বত ছিল তা অনুমান করার শক্তিও হয়তো আমাদের নেই।[৪৭৪]

এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম *রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ভালবাসা ঈমানের দাবি* প্রবন্ধে লিখেছেন :

আমাদের সমাজে আজ অনাচার, অবিচার, পাপাচার, জুলুম-নির্যাতন, নারীদের পণ্যরূপে বেচাকেনার মত নব্য জাহিলিয়াত, নারী নির্যাতন, বে-পর্দা, বেহায়াপনা, সুদ, ঘুষ, সন্ত্রাস, দূর্নীতি, মিথ্যাচার, কালোবাজারী, মওজুদদারী, পণ্যে ভেজাল প্রভৃতি সমাজ বিরোধী অপতৎপরতা এত ব্যাপক যে মানবতা মুখ থুবড়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মুহব্বতের দাবি হলো এসব অনাচার, অবিচার তথা ইসলাম বিরোধী, আল্লাহদ্রোহী, নবীদ্রোহী ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিরোধে এগিয়ে আসা ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। এটা তাঁদের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। কেননা, হুব্বে রাসূলের দাবি হলো 'আমর-বিল মারূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' তথা সত্যের আদেশ ও অসত্যের প্রতিরোধ।[৪৭৫]

ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ *রাসূল (সা)-কে ভালবেসে* প্রবন্ধে বলেছেন :

---

৪৭৪. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর প্রতি মহব্বতের তাৎপর্য', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃ ৭-১১।

৪৭৫. এ. এম. এম সিরাজুল ইসলাম, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ভালবাসা ঈমানের দাবি', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১২১-১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরতের সময়ে গভীর রাতে মহানবী (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর গৃহে পৌঁছে দরজায় টোকা দেন। টোকা মাত্রই সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় হযরত আবূ বকর গৃহ থেকে বের হয়ে আসলে মহানবী (সা) অবাক হন। মহানবী বললেন, আবূ বকর! তুমি পূর্বেই এতটা প্রস্তুত হয়ে আছ কিভাবে। আজ রাত হিজরত করতে হবে তা তো আমিও জানতাম না। হযরত জিবরাঈল সবেমাত্র আমাকে হিজরতের হুকুম দিলে আমি বেরিয়ে আসলাম। আবূ বকর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! বেশ কিছুদিন পূর্বে আপনি কথাচ্ছলে বলেছিলেন, আবূ বকর! মক্কার পরিস্থিতি দিনে দিনে যেভাবে অবনতির দিকে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত হয়ত আমাকেও হিজরত করে চলে যেতে হবে। আবূ বকর! আমি যখন যাত্রা করবো তখন আমার সহযাত্রী হিসেবে তোমাকে থাকতে হবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এ কথা শোনার পর কোন রাত আমি বিছানায় শয়ন করিনি। পথযাত্রার সবকিছু প্রস্তুত করে রাত ভর দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকি। আমার ভয় ছিল যে, হিজরতের হুকুম হবে। কবে হবে তা জানি না। আমাকে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। নয়তো এমনও ঘটতে পারে যে, হিজরতের হুকুম হওয়া মাত্রই শত্রুরা আপনাকে ধাওয়া করবে। আপনাকে শহীদ করতে ছুটে আসবে। এমতাবস্থায় বাড়িতে আমার প্রস্তুতি গ্রহণ জনিত কোন বিলম্ব ঘটলে কোন ভয়াবহ বিপদ আপনাকে স্পর্শ করতে পারে। তাই সব কিছু ঠিকঠাক করে রাতগুলো আমি দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।[৪৭৬]

আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী *নবী প্রেম : কয়েকটি বাস্তব নমুনা* প্রবন্ধে এ বিষয়ক অনেক উদাহরণ পেশ করেছেন।

রাতের আঁধারে মহানবী (সা) মদীনার পথে ছুটে চলেছেন। সঙ্গে একমাত্র সফরসঙ্গী হযরত আবূ বকর (রা)। রাতের আঁধারে চলতে গিয়ে পদে পদে আশঙ্কা ছিল শত্রুরা পাশ্চাদ্ধাবন করবে। মক্কা থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরবর্তী ছওর পাহাড় এলাকার পাহাড়ী কঙ্করময় পথে চলতে গিয়ে মহানবী (সা) বারবার হোঁচট খাচ্ছিলেন। পাথরের মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে তাঁর পদদ্বয় যখম হয়ে চলেছিল। হয়যত আবূ বকর (রা)-এর আর এ দৃশ্য সহ্য হলো না। তিনি প্রাণপ্রিয় নবীকে কাঁধে উঠিয়ে নিলেন। গিরিগুহা পর্যন্ত পৌঁছে তাঁকে কাঁধ থেকে নামালেন। প্রথমে নিজে একাকী অন্ধকার গিরিগুহায় ঢুকে তা পরিষ্কার করলেন। পরনের কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে গুহার মধ্যকার ফাটলসমূহ একে একে বন্ধ করলেন, পাছে কোন বিষধর সাপ বা পোকামাকড় বের হয়ে এসে প্রিয় নবীকে দংশন না করে। কিন্তু একটি ছিদ্র তারপরও বাকি রয়ে গেল। নিজের পায়ের আঙ্গুলি তাতে চেপে ধরে রেখে তিনি বসে পড়লেন আর মহানবী (সা) তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। পথ চলার ক্লান্তিতে গভীর নিদ্রায় তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। এমন সময় একটি বিষধর সর্প ঐ ছিদ্রপথে চাপা দেয়া আবূ বকর (রা)-এর পায়ের আঙ্গুলে দংশন করলো। বিষের যাতনায় তাঁর সর্বশরীর নীল হয়ে এলো, কিন্তু পাছে প্রিয়নবীর আরামের ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাই তিনি একটু 'উহ' শব্দও করলেন না বা পা একটু নাড়ালেনও না। বিষের বেদনায় তাঁরদু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু মহানবীর পবিত্র চেহারার উপর গড়িয়ে পড়লো। অমনি তাঁর

৪৭৬. ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ, 'রাসূল (সা)-কে ভালবেসে', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩১ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১০৩-১১২।

Dhaka University Institutional Repository

ঘুম ভেঙ্গে গেল। অবাক হয়ে তিনি আবূ বকরকে ব্যাপারে কি জিজ্ঞেস করলেন। সর্প দংশনের কথা বললে মহানবী (সা) তাঁর পবিত্র মুখের লালা দংশিত স্থানে লাগিয়ে দিলেন। তাতে তাঁর ব্যাথার উপশম হলো।

নবী প্রেমের এরূপ অসংখ্য স্মরণীয় কাহিনী ইসলামের ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। আমাদেরকে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও এসব সোনালী কাহিনী শুনিয়ে নবীপ্রেমে উদ্দীপ্ত উজ্জীবিত করতে হবে।[৪৭৭]

আহমদ আবুল কালাম *আবূ তালিবের কবিতায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)* প্রবন্ধে লিখেছেন :

...অন্যান্য কুরায়শ নেতা উদীয়মান জীবন বিধান ইসলামের বিনাশ সাধনে একের পর এক চক্রান্ত ও শত্রুতা চালালে আবূ তালিব তা রুখে দাঁড়ান। তিনি রসূলুল্লাহ (সা)-কে আপন পুত্রের চেয়েও অধিক ভালবাসতেন, ভালবাসতেন তাঁর অনুসারী নওমুসলিমদেরকেও। রসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন পিতার মত। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততোদিন তিনি ছিলেন রসূলুল্লহ (সা.)-এর বিশেষ আশ্রয়। কাফির মুশরিকদের পুন পুন প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি কোনভাবেই তাঁর প্রতি পিতৃব্যসুলভ কর্তব্য পালনে নিবৃত্ত হননি। ইসলাম প্রচারের সূচনাকালে কুরায়শরা রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি প্রারম্ভিক শত্রুতা শুরু করলে তা প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন আবূ তালিব। তাঁর পক্ষাবলম্বন করে রচিত তাঁর প্রশংসাগীতিতে আবূ তালিব বলেন :

কুরায়শরা গৌরব করে যদি কোনদিন
মুহাম্মদই (সা.) যথাযথ, তাদের শ্রেষ্ঠ সার্বজনীন
উস্কে দেয় মোদের প্রতি ওদের সৎ অসৎজন
ওরা বিফল, ব্যর্থ ওদের চেষ্টাপণ

রাসূলুল্লাহ (সা) কুরায়শদেরকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা জ্বলে ওঠে। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিবৃত্ত করার জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু বাধাহয়ে দাঁড়ান আবূ তালিব। অগত্য তারা আবূ তালিবকে জানিয়ে দেয়, 'হয় আপনি আপনার ভাতিজাকে থামান নতুবা তাঁর ব্যাপার আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।' তাদের এরূপ ষড়যন্ত্র ও পীড়াপীড়ির জবাবে আবূ তালিব তাঁর কবিতায় বলেন :

'বায়তুল্লাহর কসম! তোমাদের ধারণা মিথ্যা, অসংগত
মুহাম্মদ (সা)-কে ছাড়ব না মোরা প্রাণ হলেও ওষ্ঠাগত।
মর্যাদার রক্ষাকবচ তিনি, নিষ্কলুষ নিখাঁদ স্বনির্ভর
ইয়াতীম মিসকীনের আশ্রয় তিনি, ত্রাণকর্তা বিধবার।

৪৭৭. আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আজহারী, 'নবী প্রেম : কয়েকটি বাস্তব নমুনা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মীলাদুন্নবী (সা) ১৪২০, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৯, পৃ ৩২-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

পিতৃব্য আবূ তালিব একই সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা তুলে ধরে তার কবিতার শেষে বলেন :

আমার জীবনের কসম! আবদ্ধ হয়েছি আমি
আহমদ (সা) ও তাঁর ভাইদের মায়ার বন্ধনে
যেভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে স্নেহবৎসল কোন লোক।[৪৭৮]

হুব্বে রাসূলুল্লাহ (সা) বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের শিরোনাম : হুব্বে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম[৪৭৯], হযরত রসূলে করীম (সা)-এর প্রতি মহব্বতের তাৎপর্য[৪৮০], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ভালবাসা ঈমাদের দাবী[৪৮১], রসূলের মহব্বত কেন ও কিভাবে[৪৮২], মহানবী (সা)-এর প্রতি সাহাবায়ে কিরামের ভালবাসা[৪৮৩], নবীজীর সেবা ও ভালবাসায় সাহাবায়ে কিরামের ভূমিকা[৪৮৪], রাসূল (সা)- কে ভালবাসার পদ্ধতি[৪৮৫], আল্লামা ইকবালের রসূল প্রেম[৪৮৬] এবং হুব্বে মুহাম্মদ ইত্তেবায়ে মুহাম্মদ[৪৮৭], রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা[৪৮৮], হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর প্রতি

---

৪৭৮. আহমদ আবুল কালাম, আবূ তালিবের কবিতায় রাসূলুল্লাহ্ (সা), সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হিজরী।

৪৭৯. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'হুব্বে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি*, পৃ ২-৫।

৪৮০. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'হযরত রসূলে করীম (সা)-এর প্রতি মহব্বতের তাৎপর্য', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮ হিজরী সংখ্যা, পৃ ৭-১২; প্রাগুক্ত, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী সা. বিশেষ সংখ্যা, ৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল-জুন ২০০৪।

৪৮১. এ এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ভালবাসা ঈমানের দাবী', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল ২০০৭, পৃ ১২১-১২৭।

৪৮২. অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, 'রসূলের মুহব্বত কেন ও কিভাবে', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, পৃ ১১৩-১১৬।

৪৮৩. মাওলানা মুশতাক আহমদ, 'মহানবী (সা)-এর প্রতি সাহাবায়ে কিরামের ভালবাসা', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, পৃ ১২৭-১৩২।

৪৮৪. মাওলানা মুশতাক আহমদ, 'নবীজীর সেবা ও ভালবাসায় সাহাবায়ে কিরামের ভূমিকা, *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৯ হি*, প, ৭৪-৮৪।

৪৮৫. হায়াত মাহ্মূদ জাকির, 'রাসূল (সা)-কে ভালবাসার পদ্ধতি', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ২৭২-২৭৫।

৪৮৬. আবদুল ওয়াহিদ, 'আল্লামা ইকবালের রসূল প্রেম', *দীপ্তশিখা*, সীরাতুন্নবী স্মারক ১৯৯৭।

৪৮৭. এস. এম. আবদুস সালাম আজাদ, 'হুবের মুহাম্মদ ইত্তেবায়ে মুহাম্মদ (সা), *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২০ হি*, জা সী ক বা, পৃ ১৯৬-১৯৭।

৪৮৮. আহমদ বদরুদ্দীন খান, 'রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা', *মাসিক মদীনা*, ৩৭ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, জুন ২০০১, পৃ ৬৪-৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

মহব্বতের তাৎপর্য[৪৮৯], নবী প্রেম : কয়েকটি বাস্তব নমুনা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সাহাবা-ই-কিরাম এর ভালবাসা, দৈনন্দিন জীবনে সীরাতে রাসূল (সা)-এর অনুসরণ[৪৯০], হুব্বে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম[৪৯১], রসূলের মুহব্বত কেন ও কিভাবে[৪৯২], মহানবী (সা.)-এর প্রতি সাহাবায়ে কিরামের ভালবাসা[৪৯৩], নবীজীর সেবা ও ভালবাসায় সাহাবায়ে কিরামের ভূমিকা[৪৯৪], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ভালবাসা ঈমানের দাবি, রাসূল (সা)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আবশ্যকতা[৪৯৫], রাসূল (সা)-কে ভালবেসে, ইশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের পূর্বশর্ত[৪৯৬], হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর প্রতি মহব্বতের তাৎপর্য।

---

৪৮৯. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর প্রতি মহব্বতের তাৎপর্য', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ৭-২৮।

৪৯০. মাওলানা ইসহাক ফরিদী, 'দৈনন্দিন জীবনে সীরাতে রাসূল (সা)-এর অনুসরণ', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) সংখ্যা ১৪২১, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০০, পৃ ৬৩-৬৬।

৪৯১. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'হুব্বে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ ২-৫।

৪৯২. অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, 'রসূলের মুহব্বত কেন ও কিভাবে', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ১১৩-১১৬।

৪৯৩. মাওলানা মুশতাক আহমদ, 'মহানবী (সা.)-এর প্রতি সাহাবায়ে কিরামের ভালবাসা', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ১২৭-১৩২।

৪৯৪. মাওলানা মুস্তাক আহমদ, 'নবীজীর সেবা ও ভালবাসায় সাহাবায়ে কিরামের ভূমিকা', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ৭৪-৮৪।

৪৯৫. মাওলানা মুহাম্মদ আজিজুল হক মুরাদ, 'রাসূল (সা)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আবশ্যকতা', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩১ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৮৩-৮৯।

৪৯৬. মোঃ ইসমাঈল মিঞা, 'ইশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের পূর্বশর্ত', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৪৭-৫০।

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাস, সংঘর্ষ ও শান্তি

রাসূলে কারীম (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র আরব ছিল অশান্তি আর হানাহানির তীর্থক্ষেত্র। তিনি আপন দূরদর্শিতা দিয়ে পৃথিবীতে শান্তির বাতাবরণ ছড়িয়ে দেন। এ সম্পর্কে প্রাবন্ধিকগণ বিভিন্ন প্রবন্দে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।

আবদুশ শাকুর *মহানবী (সা)-র আদর্শের আলোকে সন্ত্রাস দমন* প্রবন্ধে লিখেছেন :

> এ প্রসঙ্গে মহানবীর একটি হাদীস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন, 'নিজের ক্ষতি করতে পারবে না, অপরের ক্ষতিও না।' আরেক বাণীতে তিনি বলেন ঃ 'অপরের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য কর।' মহানবীর জীবনে এ হাদীসের বাস্তবায়ন কীভাবে ঘটেছে তা দেখতে পাই আমরা একটি ঘটনায়। তিনি মসজিদে নববীতে বসে আছেন। এমন সময় এক যুবক এসে বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি ইসলামের সব কিছুই মানতে প্রস্তুত আছি, তবে ব্যভিচার ছাড়তে পারব না।' উপস্থিত সাহাবীগণ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিন্তু মহানবী (সা) তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য খুবই দরদভরা অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ঃ শোন, তুমি যার সাথে যিনা-ব্যভিচার করবে সে নিশ্চয়ই কারো বোন, কারো কন্যা বা কারো মা, খালা ফুফু হবে, তাই না? সেই উত্তর করল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে এবার বল, তুমি কি রাযী আচ যে তোমার বোনের সাথে কেউ এই কাজটি করুক? সে বলল, অবশ্যই আমি তা সহ্য করব না। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে তার কয়েক ধরনের মহিলা আত্মীয়ের কথা বললেন। সে প্রতি বারই বললো, তা আমি অবশ্যই সহ্য করব না। এক পর্যায়ে সে বলে উঠল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এখন আমার মন থেকে এই জঘন্য অপরাধের প্রবণতা দূর হয়ে গেছে।'[৪৯৭]

ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন *পরমত সহিষ্ণুতা ও বিশ্বশান্তি : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ* প্রবন্ধে লিখেছেন :

হুদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে ইয়াহুদী ও পৌত্তলিকদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রথম সন্ধি। এটি একটি অতি মূল্যবান আন্তর্জাতিক চুক্তি। এ চুক্তি অন্যান্য ধর্মানুসারীদের জন্যে একটি আদর্শিক নীতিমালা হিসেবে বিবেচিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব লোকের উপর পূর্ণ আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ, পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের স্ব স্ব ধর্ম প্রচারের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, একে অপরের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি সহমর্মিতা ও সম্মান-সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকের ধর্ম আরাদাভাবে প্রচার ও প্রসারে কেউ কারো প্রতিবন্ধক থাকলেন না। ফলে তৎকালীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্মীয়

---

৪৯৭. আবদুশ শাকুর, 'মহানবী (সা)-র আদর্শের আলোকে সন্ত্রাস দমন', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ১৬-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা ও তা প্রচারের স্বাধীনতা রক্ষিত হল। এর চেয়ে পরমত সহিষ্ণুতার আদর্শ কী হতে পারে।[৪৯৮]

ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন তাঁর *সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অবদান* প্রবন্ধে লিখেছেন :

> মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন একজন মহান বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক। তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন দ্বারা সমাজের পুঞ্জীভূত বিষাক্ত জঞ্জাল তথ্য সামাজিক অনাচার ও অবিচার, দুর্নীতি, ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়াখেলা, সামান্য কারণে উৎপীড়ন অর্থাৎ সন্তান প্রভৃতি জঘন্যতম অপরাধ দূরীভূত করে যে সাবলীল আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার তুলনা বিরল। আমাদের প্রিয় মহানবী (সা)-এর আগমনের মুহূর্তটি ছিল বিশ্বমানবতার জন্য এক অনাবিল ঈদ – মহামুক্তির মহোৎসব। তিনি এলেন, পৃথিবীর সভ্যতাকে বদলে দিলেন। শান্তি, সমৃদ্ধি ও অনুপম মানব সভ্যতা কায়েম করলেন। ইসলামের চিরন্তন বিধানের আলোকে তিনি আমাদের জন্য রেখে গেলেন এমন এক চিরায়ত আদর্শ, যার সত্যনিষ্ঠ অনুসরণ ও চর্চা সমাধান দিতে পারে আমাদের প্রতিটি সমস্যার।[৪৯৯]

ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ *দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে রাসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ* প্রবন্ধে লিখেছেন :

ইসলামী শরীয়তের বিধি-নিষেধের মূল উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের যাবতীয় কল্যাণ নিশ্চিত করা, এই যাবতীয় অকল্যাণ ও অনিষ্ট দূর করা। এলক্ষ্যে পৌঁছার জন্য রাসূলে কারীম সা. তথা ইসলামী শরীয়াত যে শক্তিশালী পদ্ধতি ও পন্থা অনুসরণ করেছে তার সারকথা তিনটি কথায় প্রকাশ করা যায় :

১. ব্যক্তির সংশোধন।
২. সমাজের সংশোধন।
৩. অপরাধীর জন্য শাস্তির বিধান।

উপরোল্লেখিত এই তিনটি পদ্ধতিতে রাসূলে কারীম (সা) অতি অল্প সময়ে মদীনায় একটি দুর্নীতি তথা অপরাধমুক্ত আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করেন।[৫০০]

ড. আবদুল জলীল *মহানবী (সা)-এর শিক্ষার আলোকে সন্ত্রাস প্রতিরোধে করণীয়* প্রবন্ধে লিখেছেন :

---

৪৯৮. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন *পরমত সহিষ্ণুতা ও বিশ্বশান্তি : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২২ হি*, জুন ২০০১, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৮৯-৯৩।

৪৯৯. ড. এ. কে. এম ইয়াকুব হোসাইন, 'সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অবদান', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ ৩৩-৪৩।

৫০০. ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, 'দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে রাসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ', *মাসিক মদীনা*, ৪৬ বর্ষ ১১তম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ ৩০-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

> শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে তিনি ঘোষণা করেন : 'তোমরা একে অন্যকে হিংসা করবে না, একে অন্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে না, একে অন্যের পিছনে দোষ খুঁজে বেড়াবে না, একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। আল্লাহর বান্দারা সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও।' (বুখারী ও মুসলিম) কোন সমাজ বা রাষ্ট্রে এ নির্দেশগুলো যথাযথভাবে পালিত হলে সে সমাজ ও রাষ্ট্রে যে মারামারি, হানাহানি দূরীভূত হয়ে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হবে সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকতে পারে না।[৫০১]

খন্দকার মনসুর আহমদ *বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মহান দিশারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম* প্রবন্ধে লিখেছেন :

> রাহমাতুললিল আলামীন তখন কেবল কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তদানীন্তন আরবের নৈরাজ্যে ভরা অবয়ব তখনই তাকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে অধীর করে তুলল। শান্তিকামী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে সমমনাদের নিয়ে তখনই গঠন করেন 'হলফুল ফুজুল'। প্রতিজ্ঞা নেন পরস্পরে আমরা দুর্বলের প্রতি সবলের জুলুম প্রতিরোধ করব, দেশের অশান্তি দূর করার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাব, দরিদ্র ও অসহায় লোকদের সাহায্য করতে আমরা কখনই কুণ্ঠিত হব না। তখন থেকেই শুরু হল সুন্দরের চেতনায় উজ্জীবিত মহানবী (সা)-এর শান্তি প্রতিষ্ঠার গৌরবদীপ্ত অভিসার। এরপর কাল পেরিয়ে সামনে যেতে থাকেন তিনি। যতই সামনে অগ্রসর হন ততই বেড়ে যেতে থাকে তাঁর সচেতন দায়িত্ববোধ। এরপর সময়ের ব্যবধানে স্কন্ধে অর্পিত হল নবুওয়াতের মহান যিম্মাদারী। এবার আসমানী প্রত্যাদেশের ভিত্তিতে শুরু হল নতুন দাওয়াত, নতুন বিপ্লব, সামগ্রিক মুক্তির মহা পয়গাম নিয়ে নতুনভাবে মানবতাকে আহবান জানাতে লাগলেন অনাবিল শান্তির চির স্নিগ্ধ ছায়ার দিকে।[৫০২]

মওঃ কাজী আবু হোরায়রা *মহানবী (সা)-এর জীবনাদর্শে যুদ্ধ ও শান্তি* প্রবন্ধে লিখেছেন :

> রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ইসলাম তথ্য ন্যায় ও হককে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এর মধ্যেই শান্তি নিহিত। ইসলাম প্রতিষ্ঠা না হলে শান্তি ও নিরাপত্তার কোন গ্যারান্টি নেই। কারণ মহান স্রষ্টা রাব্বুল আলামীন মানুষের জন্য জীবন বিধান হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন। স্রষ্টাই সৃষ্টির মঙ্গল কিসে তা ভাল জানেন। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে সাময়িক ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দেয়ার ফলে তারা নিজেদেরকেই ক্ষমতাধর বরে মনে করে। তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো শক্তির দাপট দেখায় এবং জমিনে সীমাহীন উৎপাত শুরু করে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইসলাম প্রচারের সময়ও তৎকতালীন আরবের অবস্থাও তেমনি ছিল। জান-মাল, ইযযত-আবরু

---

৫০১. ড. আবদুল জলীল, 'মহানবী (সা)-এর শিক্ষার আলোকে সন্ত্রাস প্রতিরোধে করণীয়', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৯২-৯৮।

৫০২. খন্দকার মনসুর আহমদ, 'বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহান দিশারী মহানবী সালাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ৩০৪-৩১৫।

Dhaka University Institutional Repository

কিছুরই নিরাপত্তা ছিল না আরবের জাহিলী যুগে। মেয়েদের জন্ম ছিল ঐ সমাজে মারাত্মক অপরাধ। জন্মের সংগে সংগে যে কোন মেয়েকে জীবন্ত করব দেয়া হতো। এক সৃষ্টিকর্তাকে তারা ভুলে গিয়ে তাঁর সৃষ্ট বস্তুকে দেব-দেবী বানিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র ঘরে ঐ সব দেব-দেবীকে সাজিয়ে রাখতো এবং সেগুলি পূজা করতো। সৃষ্টির সেরা জীবের তথা মানবতার করুণ ও চরম অবনতি এমনি এক মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বিশ্ব-মানবের শান্তি ও মুক্তির লক্ষ্যে ত্য দীন ও হেদায়েত নিয়ে পাঠালেন এ পৃথিবীতে। কিন্তু অতীতে আম্বিয়া (আ)-গণের সাথে পৌত্তলিক ও খোদাদ্রোহী শক্তি যে আচরণ করেছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সংগেও মক্কার পৌত্তলিকরা সে একই আচরণ করল। তবে পার্থক্য ছিল এতটুকু যে, রাসূল (সা)-কে তারা সত্য দীন প্রচারের আগে 'আল-আমীন' উপাধি দিয়েছিল। তারা তাঁকে সবচেয়ে সত্যবাদী , আমানতদার এবং সৎ ও বিশ্বস্ত হিসেবে জানতো। সে একই ব্যক্তি যখন সত্য দীনকে তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করে এক আল্লাহর দাসত্ব এবং নবীর আনুগত্য করার আহবান জানালেন, তখন তারা সত্য দীনকে তো মেনে নিলই না বরং তিনি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি নির্যাতন ও জুলুমের ষ্টিম রোলার চালিয়ে দিল।[৫০৩]

ড. আনিসুজ্জামান *বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)-এর অবদান* প্রবন্ধে লিখেছেন :

মানুষ মাত্রই জীবনের প্রতি মুহূর্তে শান্তিকামনা করে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে শান্তির চেয়ে যেন অশান্তিই বেশি বিদ্যমান। আজকের সভ্যাতিহাসেও দেখা যায় দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ-ব্রিহ অতীতের মতোই অব্যাহত।

মানব জীবনের পরম কাঙ্খিত জিনিস হলো শান্তি, অথচ পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, জাতিতে জাতিতে অতীতে যেমন যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছিল, তেমনি বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। বলা বাহুল্য, এমনি অবস্থা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বড় প্রতিবন্ধক। একথা সত্যি যে, যুগে যুগে বহু মনীষী একটি শান্তিপূর্ণ মানব সমাজ ও যুদ্ধ-মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন এবং সে লক্ষ্যে তাঁদের অবদানও সংযোজন করেছেন। এ প্রবন্ধে আমি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের প্রিয় রাসূল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অবদান সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলবো। কারণ, এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে এ সম্বন্ধে কোন প্রকার তুলনামূলক ও যুক্তি নির্ভর দীর্ঘ আলোচনা সম্ভব নয়।

বিশ্বশান্তির পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হরো মানবতার মাঝে বিভাজন। বিশ্ব মানবতাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে খণ্ডিত আকারে দেখা হয়েছে। স্বয়ং স্রষ্টাকে পর্যন্ত কেবল একটি বিশেষ জাতির সাথে সম্পৃক্ত করে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যেমন ইহুদি ধর্মে যিহোভাকে ইহুদিদের ঈশ্বর এবং ইহুদি জাতিকে তার বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত জাতি বলে অন্যদের থেকে বিশেষ মর্যাদা ও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কোন কোন ধর্ম ও দর্শনে মানুষের মাঝে বিশেষ শ্রেণীতে উচ্চতর মর্যাদা দেওয়াহয়েছে।

---

৫০৩. মওঃ কাজী আবু হোরায়রা *মহানবী (সা)-এর জীবনাদর্শে যুদ্ধ ও শান্তি*, অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হিজরী।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মণরা ঈশ্বরের মুখ থেকে এবং শূদ্ররা তাঁর পা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে ভাবা হয়েছে। কেউ কেউ ঈশ্বরকে কালোরূপে কেবল কালোদের জন্য আবার কেউবা পরম সত্তাকে নারীরূপে কল্পনা করেছে এবং সেভাবে তাঁর সাথে সাজুয্য অনুযায়ী নৈকট্যের দাবি করেছে।

বিশ্বনবী (সা) এ ধরনের চিন্তাধারাকে বিশ্ব মানবতার ঐক্যের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, স্রষ্টা কোন বিশেষ নর গোষ্ঠীয় নন। তিনি নর বা নারী নন, এ জাতীয় বিশেষণ ও বৈশিষ্ট্য তাঁর মহান সত্তার প্রতি প্রযোজ্য নয়। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি বা তিনি কারো জাতও নন। তাঁর কাছে নৈকট্যের মানদণ্ড সৎ, বিশ্বাস ও শুভ কর্ম। যে কেউ তাঁর প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখবে ও সৎকাজ করবে, সে যে জাতিরই হোক যে ভাষাতেই কথা বলুক, তার গাত্রবর্ণ যেরূপই হোক, সে নারী বা পুরুষ যাই হোক এতে করে তার কর্মের সুফল লাভে বা সে অনুযায়ী মর্যাদা পেতে কোন অসুবিধা হবে না।[৫০৪]

ড. কাজী দীন মুহাম্মদ *হযরত মুহাম্মদ (সা), ইসলাম ও আমরা* প্রবন্ধে লিখেছেন :

শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তো তিনি নবী বলে পরিচিত হন নি। তখনো তিনি সমাজের একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল সেই অসাধারণ বিশেষ ক্ষমতা ও বিশেষ জ্ঞান, যার বলে তিনি নীতি-বিগর্হিত কোন কাজ করেন নি। বরং অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করেছেন। আশৈশব লালিত এ নিস্ঠা ও বলিষ্ঠ চরিত্র শক্তিই তাঁকে একদা নবুয়ত প্রাপ্তির যোগ্য করে তুলেছিল। তিনি যদি নবী নাও হতেন, আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁকে বিশ্বের মানব কল্যাণের জন্য রাসূলরূপে মনোনীত না-ও করতেন, তবুও তাঁর চরিত্রে এ বৈশিষ্ট্য তাঁকে মহামানবের পর্যায়ে উন্নীত করত, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

মানবতা যখন এভাবে অবজ্ঞায় অবহেলিত, একপাশে পরিত্যক্ত, তখন আজ থেকে আয় দেড় হাজার বছর আগে এসেছিলেন এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। তিনি যাবতীয় সমস্যার সমস্যার সামগ্রিকত সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। ব্যক্তি জীবনে ও সমষ্টি জীবনে যাবতীয় অসমতা দূর করে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন 'তোমার, আমার, তার' প্রত্যেকের জন্য শান্তি। তাঁর কালের ও অনাগত ভবিষ্যতের কওমের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেলেন সুদৃঢ় সুষ্ঠু জীবন ব্যবস্থা। তিনি নিজের জীবনে, দেশ-রাষ্ট্র-জাতি-সমাজ-ধর্ম-অর্থ – সকল ক্ষেত্রে নীতির আদর্শ প্রয়োগ করে বড়-ছোট, ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু, সাদা-কাল, নর-নারী সকলের জন্য রেখে গেছেন তাঁর অমোঘ শিক্ষা। তাঁর অতুলনীয় চরিত্রে ঘটেছ যার বিকাশ, তারই অনুশীলন করে সমাজকে কলুষমুক্ত করতে চেয়েছেন তিনি।[৫০৫]

---

৫০৪. ড. আনিসুজ্জামান, 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)-এর অবদান', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩১ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৪৫-৪৮।

৫০৫. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, হযরত মুহাম্মদ (সা), **ইসলাম ও আমরা**, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২২ হিজরী।

Dhaka University Institutional Repository

এ ধারার কয়েকটি প্রবন্ধ হচ্ছে : সন্ত্রাস নির্মূল : রাসূল (সা)-এর অনন্য অবদান[৫০৬], মহানবী (সা) ইসলামী রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া[৫০৭], রাসূল (সা) এর আদর্শ ও বিশ্বশান্তি[৫০৮], সন্ত্রাস দমনে মহানবীর (সা) আদর্শ[৫০৯], দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে রাসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ, ঐক্যের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)[৫১০], বর্তমান সংস্কৃতি ও বিশ্বশান্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সা.)[৫১১], সন্ত্রাস দমনে হযরত মুহাম্মদের (সা.) ভূমিকা, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহান দিশারী মহানবী সালাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)-এর অবদান, শান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা)[৫১২], মহানবী (সা)-র আদর্শের আলোকে সন্ত্রাস দমন, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অবদান, সন্ত্রাস নির্মূল ও উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)-এর আদর্শ[৫১৩], বিশ্ব সংঘাত নিরসনে মহানবী (সা)-এর আদর্শ[৫১৪], সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও অপরাধ প্রতিরোধে মহানবী (সা)-এর শিক্ষা[৫১৫], বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)-

---

৫০৬ ড. আ. ছ. ম তরিকুল ইসলাম, 'সন্ত্রাস নির্মূল : রাসূল (সা)-এর অনন্য অবদান', *মাসিক মুসলিম জাহান*, বর্ষ ৯ সংখ্যা ১২, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ১৪২০ হিজরী/২৩-২৯ জুন ১৯৯৯, পৃ ১৫-১৬।

৫০৭ মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন, 'মহানবী (সা) ইসলামী রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া', *মাসিক মুসলিম জাহান*, বর্ষ ৯ সংখ্যা ১২, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ১৪২০ হিজরী/২৩-২৯ জুন ১৯৯৯, পৃ ২৮-২৯।

৫০৮. আ. ফ. ম খালিদ হোসেন, 'রাসূল (সা) এর আদর্শ ও বিশ্বশান্তি', *মাসিক মুসলিম জাহান*, বর্ষ ৯ সংখ্যা ১২, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ১৪২০ হিজরী/২৩-২৯ জুন ১৯৯৯, পৃ ৬২-৬৩।

৫০৯. উবায়দুল্লাহ আশরাফ, 'সন্ত্রাস দমনে মহানবীর (সা) আদর্শ', *মাসিক মদীনা*, ৩৮ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, জুন ২০০২, পৃ ৯৩-৯৫।

৫১০. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, 'ঐক্যের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ৭০-৭৩।

৫১১. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, 'বর্তমান সংস্কৃতি ও বিশ্বশান্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সা.)', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ১২৫-১২৮।

৫১২. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, 'শান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ ৩৮-৪২।

৫১৩. মুহাম্মদ আবদুল গফুর হামিদী, 'সন্ত্রাস নির্মূল ও উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)-এর আদর্শ', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) স্মরণিকা ১৪২২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ১১৯-১২৭।

৫১৪. মাওলানা কাজী আবু হোরায়রা, 'বিশ্ব সংঘাত নিরসনে মহানবী (সা)-এর আদর্শ', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১১৫-১১৮।

৫১৫. শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, 'সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও অপরাধ প্রতিরোধে মহানবী (সা)-এর শিক্ষা', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৫৩-১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

এর অবদান, জননিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)-এর শিক্ষা ও আদর্শ[৫১৬], অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে মহানবী (সা)-এর আদর্শ[৫১৭], মহানবী (সা)-এর শিক্ষার আলোকে সন্ত্রাস প্রতিরোধে করণীয়।

মানবাধিকার

আইয়ামে জাহিলিয়ার যুগে হানাহানি আর রক্তপাত যখন তুঙ্গে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারে মানবতা যখন ভুলুণ্ঠিত, সভ্যতা যখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠিক তখনই রাসূল (সা)-এর আবির্ভাব। তিনি কুরআনিক নির্দেশনায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান করলেন। অশান্তির উৎসস্থলে শান্তির বাতাবরণ ছড়িয়ে দিলেন। প্রাবন্ধিকদের আলোচনায় এ বিষয়ে রাসূল (সা)-এর অবদান সুস্পষ্ট হয়েছে। এখানে কয়েকটি প্রবন্ধের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো।

আহমদ আলী *মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা)* প্রবন্ধে লিখেছেন :

হযরত মুহাম্মদ (সা) মানুষকে পূর্ণ মানুষ করার লক্ষ্যে এবং মানুষের সমাজ তথা রাষ্ট্রে ব্যবস্থাকে পূর্ণ সুস্থতাদানের উদ্দেশ্যে মানবীয় মূল্যবোধ ও মৌলিক অধিকারের নীতিসমূহের যে সমন্বয় সাধন করেছেন, তার পর্যালোচনা ও মূল্যায়ণ সুশীল সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সা) মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেসব উদাহরণ ও নির্দেশনা রেখে গিয়েছেন তারই কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো।

১. জীবনের নিরাপত্তা লাভের অধিকার; ২. ধনসম্পদ অর্জন ও রক্ষার অধিকার; ৩. বঞ্চিত ও অক্ষমদের সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার; ৪. ইযযত-অব্রুর নিরাপত্তা লাভের অধিকার; ৫. ধর্মবিশ্বাস পালনের অধিকার; ৬. স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও মন্দ কাজের সমারোচনা করার অধিকার (বাক স্বাধীনতা); ৭. সুবিচার লাভের অধিকার

৮. সামাজিক সাম্য ও সমান অধিকার। পৃথিবীর ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই সর্বপ্রথম যথার্থ রূপে মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৫১৮]

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান *শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)* প্রবন্ধে বলেছেন :

---

৫১৬. মুফতী ওয়ালীয়ুর রহমান খান আযহারী, 'জননিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)-এর শিক্ষা ও আদর্শ', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১০৫-১০৯

৫১৭. প্রফেসর ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন, 'অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে মহানবী (সা)-এর আদর্শ', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩৩ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৪৩-৪৭।

৫১৮. আহমদ আলী, 'মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) ১৪২২, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ৮৮-১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সা) পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে। একজন ব্যক্তি জন্মগত বা পেশাগতভাবে যত নিচু মানের হোক না কেন, সে নিজের প্রতিভা ও কর্মের মাধ্যমে সমাজে স্বীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার নিশ্চয়তা লাভ করবে। সকল ভুয়া মিথ্যা আভিজাত্য বোধের উপর কুঠারাঘাত হেনে নবী করিম (সা) ঘোষণা কররেন, সকল মানুষ আল্লাহর বান্দা ও এক আদমের সন্ত ান। আল্লাহর নিকট মনিব, চাকর, উঁচু-নিচু, রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব সকলেই সমান। তবে মানুষের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে পরহেজগারী ও সৎকর্মে। ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিরই হতে হবে শ্রমজীবী। পর-শ্রমজীবিকা ইসলামে নিষিদ্ধ। প্রতিটি মানুষকে ইসলামে প্রতি মুহূর্তের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। জীবনের একটি মুহূর্তের অপচয় বা অপব্যবহার বা নষ্ট করার অধিকার আল্লাহ মানুষকে দেননি। প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান মোতাবেক মানুষকে দুনিয়ার কল্যাণ ও পরকালের মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে।[৫১৯]

মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান *শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে মহানবী (সা)*-এ লিখেছেন :

নবী করীম (সা)-এর দৃষ্টিতে আমীর-ফকীর, ছোট বড়-র মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। সকলকেই তিনি এক নযরে দেখতেন। হযরত সালমান, হযরত সোহাইব এবং হযরত বেলাল (রা) পূর্ববর্তী জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু রাসূলে করীম (সা)-এর দরবারে তাঁতের মর্যাদা কুরাইশ সর্দারগণের সমতুল্য ছিল। একবার হযরত সালমান ও হযরত বেলাল (রা) কুরাইশ-নেতা আবূ সুফিয়ান সম্পর্কে বলতে লাগলেন, 'এখনও সত্যের তরবারী আল্লাহর এই দুশমনদের গর্দান নাগার পেলনা।' এই কথা শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাদেরকে বললেন, 'কুরাইশ সর্দার সম্পর্কে তোমরা এতবড় কথা বলছ, এরপর তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে নবী করীম (সা)-কে অবহিত করলেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'আবূ বকর! আপনি তাদেরকে নারায করেননি তো? কেননা তারা যদি নারায হয় তবে আল্লাহও আপনার উপর নারায হবেন।' এই কথা শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত বেলাল ও সালমান (রা)-এর কাছে ফিরে গেলেন এবং বিনীতভাবে তাঁদেরকে বললেন, আপনারা আমার কথায় অসন্তুষ্ট হননি তো? তাঁরা বললেন, 'না, আমরা আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম।' (সহীহ মুসলিম)

পৃথিবী থেকে শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে আল কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়ন করাই ছিল নবী করীম (সা)-এর দয়িত্বসমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাঁর সুন্নাহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর জীবনের এই দয়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সাথে পালন করেছেন।[৫২০]

---

৫১৯. অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান, 'শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ১৮৪-১৯৫।

৫২০. মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান, 'শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে মহানবী (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) স্মরণিকা ১৪২২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ৩৬-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুফতী ওয়ালীয়ুর রহমান খান আযহারী *জননিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)-এর শিক্ষা ও আদর্শ* প্রবন্ধে বলেন :

> ইয়ারমুকের যুদ্ধে আহত হয়ে মুমূর্ষ অবস্থায় একজন মুসলিম সৈনিক পানি পানি বলে আর্তনাদ করলেন। একজন সাহায্যকর্মী এক পেয়ালা পানি নিয়ে আহত সৈনিকটির দিকে যখন আসছেন তখনই কিছু দূরে আরেকজন মুমূর্ষ ব্যক্তি পানি চেয়ে চিৎকার করে উঠলেন। এ আওয়াজ শুনে প্রথম ব্যক্তি কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন পানি তার কাছে নিয়ে যাও। তার প্রয়োজন হয়তো আমার চেয়েও বেশি। স্বেচ্ছাসেবক পানি নিয়ে দ্বিতীয় আর্তনাদকারীর দিকে ছুটে যাচ্ছেন এমন সময় খানিকটা দূরে আরেকজন লোক পানি চাই বলে আওয়াজ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে উঠলেন, আমাকে পরে দও, আগে উনাকে দিয়ে আস, উনার সম্ভবত বেশি কষ্ট হচ্ছে। পানি হাতে সেবক কী করবেন? একদিকে মুমূর্ষুর প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ অন্যদিকে অন্তিক সময়ে কঠিন পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থায়ও মুসলিম সৈনিকদের এই মহত্ততা তাকে অবাক-বিমোহিত করে ফেলেছে। মুহূর্তের ভাবনাকে ঝেড়ে ফেলে পেয়ালা হাতে সেবক দৌড়ে গেলেন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে। পানি পান করানোর জন্য শিয়রের কাছে বসলেন। কিন্তু না, পৃথিবীর এই পানিটুকু পানের জন্য অপেক্ষা না করে আল্লাহর পথে আত্মোৎসর্গকারী সৈনিক শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছেন বিলম্ব না করে সেবক দ্রুত চলে আসলেন দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে, তারপর প্রথম পানি বরে যিনি চিৎকার করেছিলেন তার কাছে। ততক্ষণে উভয়ই শহীদী মিছিলে শামিল হয়ে পড়েছেন। এভাবে মৃত্যুর কঠিন সময়েও অন্য ভাইকে প্রাধান্য দেওয়ার নযীর পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।
>
> অপর ভাইয়ের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা মানুষের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করা এবং কোনভাবেই অন্যের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুব সামান্য ক্ষতি না করা ইসলাম তথা মহনবী (সা)-এর আদর্শ। তিনি কতই না সুন্দর করে বলেছেন। 'দীন হলো কল্যাণ কামনা করা, প্রাপ্য আদায় করা। কল্যাণ কামনা আল্লাহর, তাঁর রাসূল (সা)-এর, মুসলিম নেতৃবৃন্দের এবং অন্য সকলের জন্য।' (মুসলিমও তিরমিযী) মানুষের জীবন, সম্পদ, সম্মান, স্বাধীনতা, সম্ভ্রম, অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম তথা মহানবী (সা)-এর শিক্ষা ও আদর্শের কোন বিকল্প নেই।[৫২১]

মানবাধিকার বিষয়ক আরো কয়েকটি সমৃদ্ধ প্রবন্ধ হচ্ছে : বৈষম্য দূরীকরণে রাসূল (সা)[৫২২], মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহর (সা) অবদান[৫২৩], রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শের আলোকে শ্রম ও

---

৫২১. মুফতী ওয়ালীয়ুর রহমান খান আযহারী *জননিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)-এর শিক্ষা ও আদর্শ*, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪৩২ হিজরী।

৫২২. মাওঃ এমদাদুল হক আড়াইহাজারী, 'বৈষম্য দূরীকরণে রাসূল (সা)', *মাসিক মুসলিম জাহান*, বর্ষ ৯ সংখ্যা ১২, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ১৪২০ হিজরী/২৩-২৯ জুন ১৯৯৯, পৃ ৫৯।

৫২৩. মুহাম্মদ আজিজুল হক ইসলামাবাদী, 'মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহর (সা) অবদান,' *মাসিক মদীনা*, ৩৫ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, জুন ১৯৯৯, পৃ ৬১-৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিক[৫২৪], হযরত রাসূলে কারীম (সা)-এর বিদায় হজ্বের ভাষণ ও মানবাধিকার[৫২৫], শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.), মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বনবীর (সা.) অবদান[৫২৬], মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী[৫২৭], অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)[৫২৮], মদীনা সনদের আলোকে মানবাধিকার ঘোষণা[৫২৯], মদীনা সনদের আলোকে মানবাধিকার ঘোষণা[৫৩০], মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা), সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় মহানবী (স)[৫৩১], বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ও মানব কল্যাণে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবদান[৫৩২], শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে মহানবী (সা), ইসলামী রাষ্ট্রে শ্রমিকের অধিকার[৫৩৩], মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)[৫৩৪], মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অবদান[৫৩৫], রাসূলুল্লাহ (সা) ও মৌলিক মানবাধিকার[৫৩৬]।

---

৫২৪. ড. সাঈদল্লাহ কাযী, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শের আলোকে শ্রম ও শ্রমিক', *মাসিক মদীনা*, ৩৮ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, জুন ২০০২, পৃ ৮৩-৮৬।

৫২৫. মোহাম্মদ শাকিরুল ইসলাম, 'হযরত রাসূলে কারীম (সা)-এর বিদায় হজ্বের ভাষণ ও মানবাধিকার', *মাসিক মদীনা*, ৪২ বর্ষ ১ম সংখ্যা, সীরাতুননবী (সা) সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৬, পৃ ৪০-৪১।

৫২৬. এডভোকেট মুজীবুর রহমান, 'মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বনবীর (সা.) অবদান', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ২৮৯-২৯৭।

৫২৭. মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, 'মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২১হি/২০০০, পৃ ১৮-২৩।

৫২৮. ড. এ এইচ এ মোস্তাইন বিল্লাহ, 'অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)', *সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪২১হি/২০০০, পৃ ২৩১-২৩৬।

৫২৯. ড. এ. বি. এম শামসুদ্দীন আহমদ, 'মদীনা সনদের আলোকে মানবাধিকার ঘোষণা', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হি সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ৭৭-৮১।

৫৩০. ড. এ বি এম শামসুদ্দীন আহমদ, 'মদীনা সনদের আলোকে মানবাধিকার ঘোষণা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) সংখ্যা ১৪২১, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০০, পৃ ৯২-৯৮।

৫৩১. শেখ ফজলুর রহমান, 'সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় মহানবী (স)', *সীরাতুন্নবী স. স্মরণিকা ১৪০৭ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, ১৪ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ ১৭-২০।

৫৩২. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ও মানব কল্যাণে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবদান', *ঈদে মিলাদুন্নবী সা. স্মরণিকা ১৪২১ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০০, পৃ ২৮-৩৪।

৫৩৩. এ. জেড. এম শামসুল আলম, 'ইসলামী রাষ্ট্রে শ্রমিকের অধিকার', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৩১-৩৩।

৫৩৪. মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক, 'মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৪ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১০০-১০৪।

৫৩৫. আ. ন. ম আবদুর রাজ্জাক, 'মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অবদান', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১৪৯-১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

মু'জিযা

মু'জিযা (معجزة) শব্দটি ই'জায (اعجاز) ক্রিয়ামূলের কর্তৃবাচক শব্দরূপ। শব্দটির মূল ধাতু হল 'আজযুন (عجز)। এর অর্থ হল কোন কার্য সম্পাদনে অপারগ ও অক্ষম হয়ে পড়া। এটি ক্ষমতার বিপরীত শব্দ। কেননা কাউকে অক্ষম ও অপারগ করে দিতে পারলে ক্ষমতাশীল ব্যক্তির ক্ষমতা (قدرة) এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে যায়।[৫৩৭]

সুতরাং মু'জিযা' এর অর্থ–এমন কর্ম বা বিষয় যা অন্যকে অপারগ বা অক্ষম করে দেয়। ইসলামের পরিভাষায় মু'জিযা বলা হয় রাসূলগণ কর্তৃক সম্পাদিত এমন অলৌকিক ও অসাধারণ কার্যাবলীকে যার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সমসাময়িক যুগের লোকেরা ব্যর্থ হয়।[৫৩৮] রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুরো জীবনই ছিল মু'জিযা। এখানে এ ধারার কয়েকটি প্রবন্দ পর্যালোচনা করা হলো।

ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন *রাসূল (সা)-এর নবুওয়ত-পূর্ব মু'জিযা* প্রবন্ধে লিখেছেন :

> **হযরত আমিনার স্বপ্ন**
>
> সাহাবীগণ একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার নিজ অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আমি আমার পিতা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের দু'আ, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের সুসংবাদ এবং আমার আম্মাজানের স্বপ্ন। আমি যখন আমার আম্মা হযরত আমিনার গর্ভে ছিলাম তখন তিনি স্বপ্নযোগে এমন একটা আলো দেখতে পেয়েছিলেন যার কারণে সিরিয়ার প্রাসাদ আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। হযরত ইবরায ইবন সারিয়া বলেন, আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াস সাল্লাম বলেন ঃ আমি তখন হতেই আল্লাহর বান্দা এবং সর্বশেষ নবী যখন আমার পিতা আদম আলায়হিস্ সালাম পানি ও মাটিতে ছিলেন অর্থাৎ কানার খামিররূপে ছিলেন। আমি এটা সবিস্তারে বর্ণনা করছি – আমি আমার পিতা হযরত ইবরাহীমের দু'আ, হযরত ঈসার সুসংবাদ এবং আমার আম্মা আমিনার স্বপ্ন; নবীগণের মায়েরা এভাবেই স্বপ্ন দেখে থাকন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আম্মা তাঁর জন্মকালে একটি নূর দেখতে পেয়েছিলেন যার কারণে সিরিয়ার প্রাসাদ আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। তৎপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত পাঠ করলেন : 'হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহর আদেশে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি।'

---

৫৩৬. মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ্ রাহমানী, মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন অনূদিত, 'রাসূলুল্লাহ (সা) ও মৌলিক মানবাধিকার', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ১০৭-১১৭।

৫৩৭. মান্না 'আল-কাত্তান, *আল্-মাবাহিস ফী 'উলুমিল কুর'আন*, বৈরূত: মু'আস্সাসা আর্‌রিসালা, ১৯৮৭, পৃ ২৬৫।

৫৩৮. আহমদ ইব্ন 'আলী হাজার আল-'আসকালানী, *ফতহুল বারী*, ৬ষ্ঠ খ, রওযা : আল্-মাকতাবা'আস সালাফিয়া ওয়া মাকতাবতুহা, ১৯৫৭, পৃ ৫৮১–৫৮২।

Dhaka University Institutional Repository

দেবালয়ে গায়বী আওয়ায

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মের পর পৌত্তলিকরা তাদের দেব মন্দিরসমূহে গায়বী আওয়ায শুনতে পেত , 'এখন দেবমন্দিরসমূহ উজাড় হওয়ার সময় এসেছে, সত্যের প্রচারক জন্মগ্রহণ করেছেন ।' এসব গায়বী আওয়ায শুনে পৌত্তলিকরা অবাক হয়ে থাকত ।[৫৩৯]

মওলানা ইমদাদুল হক *মহানবী (সা)-এর মু'জিযা : চন্দ্র বিদারণ* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন :

...আল্লাহর হাবীব মহানবী (সা.)-এর কিছু মু'জিযা উর্ধ্বজগতেও সংঘটিত হয়েছে । সশরীরে মি'রাজ গমন, স্বচক্ষে জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন এবং মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে একান্তে কথোপকথন – এগুলো উর্ধ্বাকাশে সংঘটিত হওয়া তাৎপর্যপূর্ণ মু'জিযা । এজন্যই কোন কোন বস্তুবাদী লোক সশরীরে উর্ধ্বাকাশ গমনকে অসম্ভব ধারণা করে অস্বীকার করেছেন । অনুরূপ চন্দ্র বিদারণকেও মক্কার কাফিররা অস্বীকার করেছিল । তারাও একে অসম্ভব মনে করেছিল । এরই প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এ তো চিরাচরিত যাদু!'[৫৪০]

---

৫৩৯. ড. এ এইচ এম মুজতবা হোসাইন, 'রাসূল (সা)-এর নবুওয়ত পূর্ব মু'জিযা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) সংখ্যা ১৪২১, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০০, পৃ ৫৮-৬২ ।

৫৪০. মওলানা ইমদাদুল হক, 'মহানবী (সা.)-এর মু'জিযা: চন্দ্র বিদারণ', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ৫৭-৬২ ।

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যায়ন

রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআন মজিদের মূর্ত প্রতীক। তাঁর আদর্শ ও চরিত্র কুর'আন মজিদের বাস্তব বিশ্লেষণ। আহমদ আবুল কালাম *আত্ম-পরিচয়ে রাসূলে করীম (সা)* প্রবন্ধে নিজের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মূল্যায়নধর্মী কথা উল্লেখ করে বলেছেন :

> প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনুল করীমের মূর্ত প্রতীক। কুরআন মজীদের বাস্তব বিশ্লেষণ তাঁর আদর্শ ও চরিত্র। বস্তুত কুরআনকে সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুটিত করে তোলার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : 'আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি লোকদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।'
>
> প্রিয়নবী (সা)-এর ভাষায়, 'আমি তো আল্লাহর নিকটে সেই সময় থেকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকৃত ও বিধিবদ্ধ-যখন আদম (আ) (মানুষ) ছিলেন সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় আবৃত'। আদম (আ) যখন পানি ও মাটির মধ্যে বিলীন ছিলেন-তখনও আমি নবী ছিলাম।' আমার নবুওয়াত বিধিবদ্ধ হয় আদম (আ) শরীর ও প্রাণের মধ্যে বিভক্ত থাকা কালেই।'
>
> রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেন, 'আমি আদম সন্তানদের উত্তম যুগগুলোতে যুগ যুগ ধরে প্রেরিত হতে থাকি। অবশেষে সেই যুগে এসেই আমার আবির্ভাব ঘটে-যে যুগে আমি বর্তমান আছি।'
>
> হযরত আবূযর গিফারী (রা.) বলেন, 'আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রসূল। কিভাবে আপনি নিশ্চিতভাবে জানলেন যে, আপনি একজন নবী?' তখন রসূলে করীম (সা) বললেন : 'হে আবূ যর! (আমি নবূয়তের ব্যাপারে অবগত হই এভাবে) মক্কার কোন কংকরময় স্থানে অবস্থানকালে আমার নিকট দু'জন ফেরেশতা এল। তাদের একজন ভূপৃষ্ঠে পদার্পণ করল এবং অপরজন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে স্থির হলো। তারা একে অপরকে বলল, 'ইনি কি সেই' (প্রতিশ্রুত নবী)? অপরজন বলল, 'অবশ্যই।' তাদের একজন বলল, 'তো তাঁকে (মুহাম্মদ (সা)-কে) আরেকজন লোকের সঙ্গে তুলনা কর।' আমাকে তুলনা করা হলো। আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিলাম। অতঃপর সে (ফিরিশতা) বলল, তাকে (মুহাম্মদ (সা)-কে) দশজনের সংগে তুলনা কর।' আমাকে তুলনা করা হলো। আমি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিলাম। পরে সে (ফিরিশতা) বলল : 'তাকে (মুহাম্মদ (সা) একশ' জনের সংগে তুলনা করা।' আমাকে তুলনা করা হলো। আমি তাদের উপর প্রাধান্য লাভ করলাম। পরে সে (ফেরেশতা) বলল ঃ 'তাঁকে (মুহাম্মদ (সা.)-কে) সহস্রজনের সংগে তুলনা কর।' আমাকে তুলনা করা হলো। আমি তাদের উপর প্রাধান্য লাভ করলাম। তখন আমি যেন দেখছি তারা (সহস্রজন) সম্মিলিতভাবে আমার শ্রেষ্ঠত্বের বহিঃপ্রকাশে হতভম্ব হয়ে পড়ে। এতে সে (ফিরিশতা) তার সাথীকে বললো, 'যদি তাঁকে (মুহাম্মদ (সা)-কে) তাঁর সমগ্র উম্মতের সংগেও তুলনা করা হয় তবুও তিনি তাদের সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করবেন।'
>
> আলোচ্য ঘটনাটি রসূলে করীম (সা)-এর নবূওতের প্রমাণ বহনকারী বহুসংখ্যক ঘটনাবলী ও নিদর্শনাবলীর থেকে একটা ঘটনা বৈ আর কিছুই নয়। রাসূলে করীম (সা.) যে একজন নবী তা তিনি

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্নভাবে অবগত হলেও তাঁর উপর প্রত্যাশিত (আল্লাহর) ওহী তাঁকে চূড়ান্ত নিশ্চয়তায় উপনীত করে। প্রিয়নবী (সা) ইরশাদ করেন, 'আমি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ্ আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন।'

কাজী আবু হোরায়রা *ঘনিষ্ঠ সাথীদের দৃষ্টিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম* প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে ঘনিষ্ঠদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

রাসূল (সা)-এর প্রথম সহধর্মিনী রূপে হযরত খাদীজা (রা) তাঁর নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ পনের বছর তাঁর সংগে অতিবাহিত করেন। এতদিনে একজন লোকের চরিত্র ও চলাচল সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। আর হযরত খাদীজা (রা) এ সময়ে নবী চরিত্র ও মাধুর্য সম্পর্কে এত বেশী ওয়াকিফহাল হন যে, নবূওয়াত প্রাপ্তির সংবাদ শোনা মাত্রই খাদীজা (রা) বিশ্বাস করে ফেললেন এবং বললেন যে, 'ইনিই হতে পারেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল।'

'আল-ইসতিয়াব' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, 'মুশরিকদের প্রত্যাখ্যান ও অবিশ্বাসের কারণে রাসূল (সা) যে ব্যথা অনুভব করতেন, খাদীজার (রা.) কাছে এলে তা দূর হয়ে যেত। কারণ তিনি রসূল (সা)-কে সান্ত্বনা দিতেন, সাহস ও উৎসাহ যোগাতেন, মুশরিকদের অমার্জিত আচরণকে খাদীজা (রা) তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতেন। আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি, আরবের সেই ঘোর অন্ধকার দিনে কিভাবে এক মহিলা নিঃসংকোচে পবিত্র কাবাঘর থেকে তিন মাইল দক্ষিণে কংকরময় পথ ও পাহাড় অতিক্রম করে পায়ে হেঁটে হেরা গুহায় আত্ম সমাহিত প্রিয়নবীর জন্য প্রায় এক কিলোমিটার পর্বতশৃংগে খাবার নিয়ে উঠতেন, আবার ঘরে ফিরে যেতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তাঁর প্রাধান্যের দিক থেকে হযরত খাদীজার পরই হযরত আয়শার স্থান। তিনি দীর্ঘ নয় বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে রসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য্যে ছিলেন। মুসলিমকুল জননী হযরত আয়েশা (রা)-এর সাক্ষ্য হল- 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাউকে তিরস্কার করতেন না, দুর্ব্যবহারের দ্বারা তিনি দুর্ব্যবহারের জবাব দিতেন না, বরং ক্ষমা প্রদর্শন করতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)। আরবের জাহিলী যুগে রসূল (সা)-এর নবূওয়াত লাভের খবর শুনে বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করেই তাঁর নিকট যে চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল তার সবটাই ইসলামের জন্য ওয়াকফ্ করে দেন। রাসূলুল্লাহর মিরাজের খবর শুনে সকলেই যখন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝে দোল খাচ্ছিল, তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, 'আপনি আল্লাহর সত্য নবী। আপনি কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না।' রাসূল (সা) তখন তাঁকে সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করেন।

যায়দ ইবনে হারিসা (রা) রাসূল (সা)-এর খাদেম ছিলেন। বাল্যকালে ডাকাত দলের হাতে লুণ্ঠিত হয়ে দাস হিসেবে বিক্রিত অবস্থায় ঘটনাক্রমে তিনি হযরত খাদীজা (রা)-এর ঘরে আসেন। হযরত খাদীজা (রা) রসূল (সা.)-এর সংগে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর যায়দকে দিলেন রসূলের

Dhaka University Institutional Repository

খেদমতের জন্যে। এদিকে ডাকাত দল যায়দকে রেখেছে, না মেরে ফেলেছে সে আশংকায় তার মা-বাবা শোকাতুর হয়ে খোঁজ পেলেন যে, যায়দ রসূল (সা)-এর নিকট আছে। তারা মুক্তিপণ নিয়ে রসূলের খেদমতে হাজির হলেন এবং বললেন, তাকে মুক্তি দিন। আল্লাহর নবী বললেন, 'আপনার কোন্ ছেলের কথা বলছেন?' তারা বললেন, 'কেন আপনার দাস যায়দ ইবনে হারিসা?' হুযুর বললেন, 'ঠিক আছে, আমি তাকে আপনাদের নিকট ডাকছি। স্বেচ্ছায় সে ঠিক করুক সে আমার সাথে থাকবে না আপনাদের সাথে যাবে। যদি আপনাদের সাথে যেতে চায়, মুক্তিপণ ছাড়াই তাকে নিয়ে যাবেন। আর আমার সাথে থাকতে চাইলে আমার কিছুই করার নেই।' তারা সায় দিয়ে বলল : 'আপনি অত্যন্ত ন্যায়-বিচারের কথা বলেছেন।' রাসূল (সা) যায়দকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এ দু'ব্যক্তি কারা?' বললেন, 'ইনি আমার পিতা হারিসা ইবনে শুরাহবীল। আর উনি আমার চাচা কা'ব।' হুযূর বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে তাঁদের সাথে যেতে পার, আর ইচ্ছা করলে আমার সাথেও থেকে যেতে পার।' কোন রকম ইতস্তত না করে সংগে সংগে তিনি বললেন, 'আমি আপনার সাথেই থাকবো।' পিতা বললেন, 'যায়দ তোমার সর্বনাশ হোক, পিতা-মাতাকে ছেড়ে তুমি দাসত্ব বেছে নিলে?' যায়দ বললেন, 'আমি রাসূল (সা)-এর মাঝে এমন কিছু দেখছি যাতে আমি পৃথিবীর কোন কিছুর বিনিময়েও তাঁকে ছেড়ে যেতে পারি না।' যায়দের এ সিদ্ধান্তের পর রাসূল (সা) তাঁর হাত ধরে কা'বার কাছে নিয়ে আসেন এবং হাজরে আসওয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে ঘোষণা করলেন, 'ওহে কুরাইশ জনমণ্ডলী, তোমরা সাক্ষী থাক, আজ থেকে যায়দ আমার ছেয়ে। সে হবে আমার এবং আমি হবো তার উত্তরাধিকারী। সে এখন স্বাধীন।' এই ছিল রাসূল (সা)-এর আদর্শ।[৫৪১]

মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী *সমসাময়িক মহিলাদের ভাষ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)* সম্পর্কে লিখেছেন :

> উম্মে মা'বাদ নামক এক মহিলা বললেন, "আমি চিত্তহারী অপূর্ব চেহারার এক মানুষ দেখেছি। তাঁর মুখমণ্ডল যেমন উজ্জ্বল, আচরণ তেমনি শোভন। যখন তিনি কথা বলেন, মনে হয় চতুর্দিক তাঁর কণ্ঠস্বরে আবৃত হয়ে আছে। তাঁর ভাষণ সুস্পষ্ট এবং মিষ্ট। তাঁর ভাষণ যেমন অনাড়ম্বর নয়, তেমনি নয় আড়ম্বরপূর্ণ। দূর হতে শুনলে মনে হয় তাঁর কণ্ঠস্বর দরাজ, কিন্তু মনোহর এবং নিকট হতে শুনলে মনে হয় তা মধুর এবং স্বাদ-গন্ধময়। তিনি ছিলেন মধ্যাকৃতির মানুষ, এত বেশি লম্বা ছিলেন না, যাতে অসুন্দর দেখায়, আবার এত খাটোও ছিলেন না যাতে কুৎসিত দেখায়।
>
> হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, সূরা মুয্যাম্মিলেন প্রাথমিক আয়াতগুলো তাহাজ্জুদের হুকুম নাযিল হওয়ার পর নবী করীম (সা) সারারাত জেগে নামায পতে শুরু করেন। রাত্রি জাগরণ এবং দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পড়তে তার পা মুবারক ফুলে বা ফেটে গিয়েছিল। এ অবস্থা দেখে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, হে রাসূল (সা)! আপনি এত কষ্ট করেছেন কেন, আল্লাহ্ তাআলা তো আপনার

---

৫৪১. কাজী আবু হোরায়রা, 'ঘনিষ্ঠ সাথীদের দৃষ্টিতে মহানবী (সা)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ ৭২-৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

> জীবনের পূর্বাপর সমুদয় গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। এ কথা শুনে তিনি বলেছিলেন, আমি কি আল্লাহর শোকরগুযার বান্দা হবো না?
>
> মানব-চরিত্রের সর্বাপেক্ষা একটি মহৎ গুণ শত্রুর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা। এক্ষেত্রেও মহানবী (সা) ছিলেন অদ্বিতীয়। আবূ সূফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা ওহুদের ময়দান হযরত হামযা (রা)-এর কলিজা চিবাতে চিবাতে নৃত্য করেছিল। মক্কা বিজয়ের দিন নেকাবে মুখ ঢেকে সে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দরবারে এসে হাজির হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে চিনে ফেললেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। এ মহৎ উদারনৈতিক আচরণ প্রত্যক্ষ করে সে কঠিন-হৃদয়ে নারীর মন বিগলিত হয়ে গেল। সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত আমার চোখে আপনার তাঁবুর চাইতে ঘৃণ্য আর কোন তাঁবু ছিল না। কিন্তু এখন আপনার সে তাঁবুর চাইতে প্রিয়তম কোন তাঁবু আমার চোখে আর একটিও নেই।[৫৪২]

আবদুল্লাহ্ আল-আমীন *মাইকেল হার্টের 'দি হানড্রেড'* দৃষ্টিকোণে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মূল্যায়ন উপস্থাপন করেছেন। মহানবী (সা)-এর জীবনী পর্যালোচনা করতে গিয়ে ইদানীং অনেক লেখকই মাইকেল হার্ট রচিত 'দি হানড্রেড' গ্রন্থটির উল্লেখ করে থাকে। লেখক মাইকেল হার্ট নিজেও একজন একাধিক গুণে গুণান্বিত মার্কিন নাগরিক। তিনি একাধারে জ্যোতির্বিদ, অংকশাস্ত্রবিদ, বিজ্ঞানী এবং আইনজীবী।

মাইকেল হার্ট রচিত গবেষণালব্ধ পুস্তক 'দি হানড্রেড' ১৯৭৮ সালে ক্যারল পাবলিশিং কর্তৃক নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়। বইটিতে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রভাব বিস্তারকারী প্রথম একশত ব্যক্তির একটি ক্রমতালিকা প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর বাছাইকৃত এই একশত মনীষীর জীবনীও ব্যাখ্যা সহকারে তুলে ধরেন। লেখকের বিচারে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীরা হলেন যথাক্রমে হযরত মুহাম্মদ (সা), বিজ্ঞানী নিউটন এবং যীশু খৃষ্ট তথাঈসা (আ)। তিনি যে মানদণ্ডের ভিত্তিতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে পৃথিবীর ইতিহাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থানে বসিয়েছেন তা হচ্ছে- ইতিহাসে কে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে গেলেন তার ভিত্তিতে।

> পৃথিবীর সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে মুহাম্মদকেই আমি প্রথম স্থানে আসীন করেছি। আমার এই সিদ্ধান্তটি হয়তো কিছু পাঠকক্ষে বিস্মিত করবে, অন্যরা হয়তো প্রশ্ন উথাপন করবেন। কিন্তু আমার মতে, মুহাম্মদ ছিলেন একমাত্র ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, যিনি ধর্মীয় এবং জাগতিক — উভয় ক্ষেত্রেই পরম সাফল্য লাভ করেছিলেন। অত্যন্ত বিনয়ী স্বভাবের অধিকারী মুহাম্মদ পৃথিবীর অন্যতম একটি মহান ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং সে সূত্রে একজন নিরংকুশভাবে কার্যক্ষম রাজনৈতিক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর তেরো শতাব্দী পর আজো ব্যাপকভাবে পরিব্যাপ্ত তাঁর বলিষ্ঠ প্রভাব অক্ষুণ্ন রয়েছে। আমার এই বইটিতে আলোচিত বেশির ভাগ

---

৫৪২. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, 'সমসাময়িক মহিলাদের ভাষ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) স্মরণিকা ১৪২২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ৫৪-৬০।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন — তাঁরা জন্মেছিলেন এবং প্রতিপালিত হয়েছিলেন এমন সব জায়গায় যেখানে সভ্যতা পরম বিকাশ লাভ করেছিল অথবা রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জাতির উত্থান হয়েছিল।

উপরোক্ত অবস্থাগুলোর আলোকে কিভাবে একজন ব্যক্তি মানব ইতিহাসের উপর মুহাম্মদের সার্বিক প্রভাবকে যাচাই করবে? অন্য সব ধর্মের মত ইসলাম তার অনুসারীদের জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। আর এই কারণেই পৃথিবীর অন্যান্য মহান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাদের সবাইকে এই বইতে অকপটভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু পৃথিবীতে খৃষ্টানদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ (মনে রাখবেন, 'দি হানড্রেড' গ্রন্থের রচনাকার ১৯৭৮ সাল। তখনকার তুলনায় বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সংখ্যার ব্যবধান অনেক কমে এসেছে — অনুবাদক)। সেহেতু মুহাম্মদকে যীশুখৃষ্টের উপরে মর্যাদার স্থান দেয়াকে প্রথম প্রথম অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে মূলত দু'টি কারণ। প্রথমত, যীশুখৃষ্ট ধর্মের বিকাশের জন্য যে পরিমাণ ভূমিকা রেখেছিলেন, সে তুলনায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য মুহাম্মদের অবদান ছিল অনেক বেশি। যদিও যীশুখৃষ্ট ধর্মের মুখ্য নৈতিক ও হিতোপদেশমূলক অনুশাসনগুলো (অন্তত যেগুলো ইহুদী ধর্ম থেকে ভিন্নতর ছিল) রচনা করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তথাপি প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী পল ছিলেন খৃষ্ট ধর্মতত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা, ধর্মান্তরকরণ কাজের পরিচালক এবং বাইবেলের নতুন টেষ্টামেন্টের একটি বৃহৎ অংশের গ্রন্থকার।

অন্যদিকে মুহাম্মদ শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মতত্ত্বের প্রবক্তাই ছিলেন না বরং একই সাথে এর মূখ্য নৈতিক ও হিতোপদেশমূলক অনুশাসনগুলোর ভিত্তি রচনার দায়িত্বেও ছিলেন। তদুপরি তিনি ইসলাম ধর্মের অনুশাসনগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।.... যীশুখৃষ্ট অপেক্ষা মুহাম্মদ ছিলেন একজন শ্রেয়তর ইহজাগতিক ও ধর্মীয় নেতা। প্রকৃতপক্ষে, মুহাম্মদ ছিলেন যুদ্ধবিজয়গুলোর পেছনে প্রেরণাদায়ক শক্তি। এজন্য তাঁকে সর্বকালের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার আসনে অধিষ্ঠিত করা যেতে পারে।[৫৪৩]

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম *পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের নজরে হযরত মুহাম্মদ (সা)* প্রবন্ধে অনেকের মূল্যায়ন তুলে ধরেছেন। এখানে দু'একজনের মন্তব্য উপস্থাপন করা হলো।

'ইসলাম হার মরাল এ্যান্ড স্পিরিচুয়্যাল ভ্যালু' গ্রন্থে মেজর আর্থার গ্লায়ন লিউনার্ড বলেছেন :

> Great not simply as a Prophet but as a patriot and statesman; a material as well as as a spiritual builder, who constructed a great nation, a great empire, and more even than all three, a still greater Faith; True, moreover, because he was true to himself, his people, and above all to his God.

---

৫৪৩. আবদুল্লাহ্ আল-আমীন, *মাইকেল হার্টের 'দি হানড্রেড'*, অগ্রপথিক, ১৪২২।

Dhaka University Institutional Repository

> একজন নবী হিসাবেই তিনি কেবল শ্রেষ্ঠ নন, বরং একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে, রাষ্ট্র পরিচালনায় সুযোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক নির্মাতা হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনি সংস্থাপন করেছেন একটি শ্রেষ্ঠ জাতিও সাম্রাজ্য। এই তিন মাহাত্ম্য ছাড়াও তাঁর সংস্থাপিত বিশ্বাস আজও শ্রেষ্ঠতর। তা ছাড়া তিনি যে সত্য কায়েম করেন তা যথার্থ কারণ তিনি নিজের নিকট সত্য ছিলেন। তাঁর জনগণের নিকট বিশ্বস্ত ছিলেন, সর্বোপরি তাঁর বর-এর অনুগত ছিলেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় মুখর হয়েছেন পাশ্চাত্যের বহু মনীষী। জর্জ বার্নাড শ' তাঁর একাধিক লেখায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আদর্শই কেবল পৃথিবীতে সুখ ও শান্তি দিতে পারে বলে দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি আগাম বাণী রাখছি যে, আগামীতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দীন ইউরোপের কাছে গ্রহণীয় হবে। বর্তমানে ইউরোপের কাছে তা গ্রহণীয় হতে শুরু করেছে।[৫৪৪] তাঁর আদর্শ ও চারিত্রিক মূল্যায়নধর্মী কয়েকটি প্রবন্ধ এখানে আলোচনা করা হলো। মূল্যায়নধর্মী ক'টি প্রবন্ধের শিরোনাম এখনে উল্লেখ করা হল : সমকালীন বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে রাসূল (সা)[৫৪৫], অমুসলিমদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা)[৫৪৬], বিশ্বনবী (সা)-এর প্রতি বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্বের শ্রদ্ধা ও অভিমত[৫৪৭], হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা[৫৪৮] এবং মাইকেল হার্টের দি হানড্রেড[৫৪৯], মুহাম্মদ (সা.) : দি গ্রেটেস্ট[৫৫০], আত্ম পরিচয়ে রসূলে করীম (সা)[৫৫১], সমকালীন বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে রাসূল (সা)[৫৫২], হযরত মুহাম্মদ (সা)– ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা আলোচিত ব্যক্তিত্ব[৫৫৩]।

---

৫৪৪. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম, *পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের নজরে হযরত মুহাম্মদ (সা)* সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হিজরী।

৫৪৫. ড. মোঃ আবুবকর সিদ্দিক,'সমকালীন বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে রাসূল (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২০ হি*, পৃ ৮৪-৯৩।

৫৪৬. মোঃ শফিউদ্দিন, 'অমুসলিমদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ১৪২২ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ২০০১, পৃ ২৯-৩০।

৫৪৭. মাওলানা শাহ আবুদস সাত্তার, 'বিশ্বনবী (সা)-এর প্রতি বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্বের শ্রদ্ধা অভিমত', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮ হিজরী সংখ্যা, পৃ ৬৬-৭১।

৫৪৮. খালেক বিন জয়েনউদ্দীন, 'হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ২৮১-২৮৩।

৫৪৯. আবদুল্লাহ আল-আমীন, 'মাইকেল হার্টের দি হানড্রেড', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ২৬১-২৬৮।

৫৫০. আহমদ দীদাত, ছালেহ উদ্দীন আহমদ অনূদিত, 'মুহাম্মদ (সা) : দি গ্রেটেস্ট', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক*, ঢাকা : জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি, পৃ ১০৪-১০৮।

৫৫১. আহমদ আবুল কালাম, 'আত্ম পরিচয়ে রসূলে করীম (সা)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ ৫৫-৬৩।

৫৫২. ড. মো: আবু বকর সিদ্দীক, 'সমকালীন বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে রাসূল (সা)', *ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) স্মরণিকা ১৪২০ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুন ১৯৯৯, পৃ ৮৪-৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

সীরাত চর্চা

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন ব্যক্তি-মানুষ ও সমষ্টি-মানুষের জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগ সমন্বিত। নবী করীম (সা)-এর জীবনীর এই সর্বব্যাপক ও সর্বাত্মক সমন্বয়তা ইতিহাসে অতুলনীয়, দৃষ্টান্তহীন। পৃথিবীর সব ভাষার কবি-সাহিত্যিক, পণ্ডিত-গবেষকগণ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাঁদের মূল্যবান রচনায়। ইংরেজী, জার্মান, ল্যাটিন, ফরাসী, রুশ ও হিন্দী ইত্যাদি ভাষায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনী সাধারণত অমুসলিম সাহিত্যিকগণ রচনা করেছেন। 'আরবী, উর্দু, ফারসী, তুর্কী, বাংলা ইত্যাদি ভাষায় প্রধানত মুসলিম কবি-সাহিত্যিকরাই তাঁর সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং লিখেছেন অসংখ্য গ্রন্থ। আজ পর্যন্ত বিশ্বের দেশে দেশে হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন দেশে, জাতি-ধর্ম এবং শত্রু, মিত্র নির্বিশেষে সীরাত চর্চা অব্যাহত রয়েছে। প্রাবন্ধিকগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন শিরোনামে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করেছেন।

মুহাম্মদ তাহের মানজুর *সীরাত সাহিত্যের ক্রমবিকাশ* প্রবন্ধে রসূল (সা)-এর জীবন ও কর্ম সীরাত সাহিত্যে যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে তার একটি প্রামাণ্য ক্রমধারা তুলে ধরা ।

আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর *পাশ্চাত্যে সীরাত চর্চা* প্রবন্ধে *পাশ্চাত্যে* সীরাত চর্চার ক্রমবিকাশ ও সীরাত গ্রন্থনায় প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম *বাংলা সাহিত্যে প্রিয়নবী (সা)* তথ্যবহুল প্রবন্ধে লিখেছেন :

> বাংলা সাহিত্যের প্রিয়নবী (সা)-এর পবিত্র নাম 'মুহাম্মদ' প্রথম ব্যবহার হয় চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রামাই পণ্ডিতের পুঁথি শূন্য পুরানের কলেমা জাল্লাল বা রুদ্র বাক্য (নিরঞ্জনের রুম্মা)-তে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পুঁথি রচনা শুরু হয়।[৫৫৪] এখানে সীরাত চর্চা বিষয়ক কিছু প্রবন্ধের শিরোনাম দেয়া হল : মহানবী (সা) ও ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের অজ্ঞতা এবং বিদ্বিষ্ট সীরাতচর্চা[৫৫৫], মহানবীর জীবনী অধ্যয়ন[৫৫৬], বিশ্ব সভ্যতায় হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর সীরাতের

---

৫৫৩. সৈয়দ আশরাফ আলী, 'হযরত মুহাম্মদ (সা)– ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা আলোচিত ব্যক্তিত্ব', *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২৯ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ ৫৪-৬৩।

৫৫৪. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম, 'বাংলা সাহিত্যে প্রিয় নবী (সা)', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪০৭ হি*, পৃ ৩৬-৪১।

৫৫৫. আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী, 'মহানবী (সা) ও ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের অজ্ঞতা এবং বিদ্বিষ্ট সীরাতচর্চা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪২ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, জানুয়ারী-এপ্রিল ২০০৩, পৃ ১৫-৫৮।

৫৫৬. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, 'মহানবীর জীবনী অধ্যয়ন', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ২২ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩, পৃ ১৯৫-১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব[৫৫৭], সীরাতে রাসূল (সা) অধ্যয়নের পদ্ধতি[৫৫৮], সীরাত সাহিত্যের বিকাশ[৫৫৯], রাসূল (সা) চর্চা : সূচনা ও বিকাশের ধারা[৫৬০], সীরাত সাহিত্যের ক্রমবিকাশ[৫৬১], সীরাত সাহিত্য : পরিধি, সংকলনের ভিত্তি ও উপাদান[৫৬২], সীরাত আলোচনা : কেন ও কিভাবে[৫৬৩], আরবী ভাষায় রচিত সীরাত গ্রন্থাবলী[৫৬৪], তৎকালীন আরবী কবিতা এবং রসূল প্রশাস্তির সূচনা পর্ব[৫৬৫], আবূ তালিবের কবিতায় রসূলুল্লাহ (সা)[৫৬৬], আধুনিক আরবী কবি আহমদ শাওকীর কবিতায় মহানবী (সা)-এর প্রশস্তি[৫৬৭], অনুবাদ সাহিত্যে শেষনবী (সা) প্রসঙ্গ[৫৬৮], কাব্য সাহিত্যে রাসূল (সা) প্রসঙ্গ[৫৬৯], নির্বাচিত সীরাত গ্রন্থালোচনা : সীরাতে ইব্ন হিশাম[৫৭০], তুর্কী সাহিত্যে মহানবী (সা)[৫৭১], পাশ্চাত্যে সীরাত চর্চা[৫৭২],

---

৫৫৭. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'বিশ্ব-সভ্যতায় হযরত রসূলে করীম (সা)-এর সীরাতের প্রভাব', অগ্রপথিক, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ১৪২১ হিজরী সংখ্যা, পৃ ৯-১৪ ।

৫৫৮. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, 'সীরাতে রাসূল সা. অধ্যায়নের পদ্ধতি', সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক ১৪২০ হি, জা সী ক বা, পৃ ২৯৪-২৯৯ ।

৫৫৯. ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী, 'সীরাত সাহিত্যের বিকাশ,' ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃ ৪৯-৬৬ ।

৫৬০. মুস্তাফা মাসুদ, 'রসুল (সা) চর্চা : সূচনা ও বিকাশের ধারা', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪২১ হি*, পৃ ১২৬-১৩৪ ।

৫৬১. আবু তাহের মুহাম্মদ মান্জুর, 'সীরাত সাহিত্যের ক্রমবিকাশ', অগ্রপথিক, *পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪২০ হিজরী সংখ্যা*, পৃ ১৬৫-১৭৪ ।

৫৬২. আবু তাহের মুহাম্মদ মান্জুর, 'সীরাত সাহিত্য : পরিধি, সঙ্কলনের ভিত্তি ও উপাদান', *অগ্রপথিক*, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ ৭১-৮০ ।

৫৬৩. নঈম সিদ্দিকী, 'সীরাত আলোচনা : কেন ও কিভাবে', অনুবাদ : অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ২২ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন ১৯৮৩, পৃ ২৩৪-২৪২ ।

৫৬৪. মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, 'আরবী ভাষায় রচিত সীরাত গ্রন্থাবলী', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮ হিজরী সংখ্যা, পৃ ৪০-৬৫ এবং অগ্রপথিক, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ২১-২৮ ।

৫৬৫. মুকুল চৌধুরী, 'তৎকালীন আরবী কবিতা এবং রসূল প্রশস্তির সূচনা পর্ব', *সীরাত স্মরণিকা* ১৪১৭ হি, পৃ ১০৩-১১১ ।

৫৬৬. আহমদ আবুল কালাম, 'আবূ তালিবের কবিতায় রসুলুল্লাহ (সা)', *সীরাত স্মরণিকা* ১৪১৭ হি, পৃ ১৩৩-১৩৭ ।

৫৬৭. মুহাম্মদ ইউনুস, 'আধুনিক আরবী কবি আহমদ শাওকীর কবিতায় মহানবী (সা)-এর প্রশস্তি', *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা* ১৪২০ হি, পৃ ১৪৬-১৫১ ।

৫৬৮. মোঃ আবুল কাশেম ভূঞা, 'অনুবাদ সাহিত্যে শেষ নবী (সা) প্রসঙ্গ', *মাসিক মদীনা*, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ ।

৫৬৯. নাঈমুল ইসলাম, 'কাব্য সাহিত্যে রসূল (সা) প্রসঙ্গ', মাসিক মদীনা, *সীরাতুন্নবী (সা)* সংখ্যা, আগস্ট, ১৯৯৫ ।

৫৭০. মুস্তাফা মাসুদ, 'নির্বাচিত সীরাত গ্রন্থালোচনা : সীরাতে ইব্ন হিশাম', *সীরাত স্মরণিকা* ১৪১৬ হি, পৃ ১৭১-১৭৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

উপমহাদেশে সীরাত সাহিত্য : আলোকপাত-২[৫৭৩], নবী চরিত কয়েকখানি অনন্যগ্রন্থ[৫৭৪], উপমহাদেশে সীরাত সাহিত্য : আলোকপাত-১[৫৭৫], উপমহাদেশে সীরাত সাহিত্য : মালায়লাম ও উড়িয়া[৫৭৬], উপমহাদেশে বিশ্বনবী (সা)-এর ইংরেজী জীবনী ও সালার জং মিউজিয়ামে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি[৫৭৭], বাংলা-কাব্যে রসূল (সা)[৫৭৮], ষাটোত্তর বাংলা কবিতায় রসূল (সা)[৫৭৯], বাংলা ও ফার্সী কাব্যে না'তে রাসূল[৫৮০], সিলেটী নাগরী সাহিত্যে রসূল (সা)[৫৮১], শতাধিক বছর পূর্বে রচিত মুনসী ছাদেক 'আলীর হালতুন্নবী'[৫৮২], বাংলা কবিতায় রসূল প্রশস্তি এবং ঐতিহ্যবাদের নয়া প্রবণতা[৫৮৩], বাংলা সাহিত্যে প্রিয় নবী (সা), বাংলা সাহিত্যে রসূলুল্লাহ (সা)[৫৮৪], বাংলা ভাষায় সীরাতে রসূলুল্লাহ (সা) চর্চা[৫৮৫], বাংলা শিশু সাহিত্যে রসূলুল্লাহ (সা)[৫৮৬], বাঙালী অমুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের রচনায়

---

৫৭১. মুহাম্মদ নূরুল আমীন হাবিলদার, 'তুর্কী সাহিত্যের মহানবী (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মীলাদুন্নবী (সা) ১৪২০ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৩৩-১৪৭।

৫৭২. আবু তাহের মুহাম্মদ মান্‌জুর, 'পাশ্চাত্যে সীরাত চর্চা', *সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক* ১৪২০ হি, জা সী ক বা, পৃ ২০১-২০৭।

৫৭৩. আবদুল ওয়াহিদ, 'উপমহাদেশে সীরাত সাহিত্য : আলোকপাত-২', *সীরাত স্মরণিকা* ১৪১৫ হি, পৃ ৯৬-১১৬।

৫৭৪. আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, 'নবী চরিত কয়েকখানি অনন্য গ্রন্থ', *সীরাত স্মরণিকা* ১৪১৬ হি, পৃ ১৫৭-১৭০।

৫৭৫. আবদুল মুকীত চৌধুরী, 'উপমহাদেশে সীরাত সাহিত্য, আলোকপাত-১', *সীরাত স্মরণিকা* ১৪১৫ হি, পৃ ৮৪-৯৬।

৫৭৬. আবদুল মুকীত চৌধুরী, 'উপমহাদেশে সীরাত সাহিত্য : মালায়লাম ও উড়িয়া' *সীরাত স্মরণিকা* ১৪১৭ হি, পৃ ৯৭-১০২।

৫৭৭. আবদুল মুকীত চৌধুরী, 'উপমহাদেশে বিশ্বনবী (সা)-র ইংরেজী জীবনী ও সালার জং মিউজিয়ামে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি', *সীরাত স্মরণিকা* ১৪১৮ হি, পৃ ১৪৯-১৫৯।

৫৭৮. শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ, 'বাংলা-কাব্যে রসূল (সা)', *সীরাত স্মরণিকা* ১৪১৫ হি, পৃ ১২০-১২৬।

৫৭৯. শাহাবুদ্দীন আহমদ, 'ষাটোত্তর বাংলা কবিতায় রসূল (সা)', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হিজরী সংখ্যা, ১২৬-১৩২।

৫৮০. এ. কে. এম সাইফুল ইসলাম খান, 'বাংলা ও ফার্সী কাব্যে না'তে রাসূল', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৩৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৯, পৃ ৬৭-৯৩।

৫৮১. মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী, 'সিলেটী নাগরী সাহিত্যে রসূল (সা)', *অগ্রপথিক*, অক্টোবর ১৯৯৫, পৃ ৫৭-৬০।

৫৮২. চৌধুরী গোলাম আকবর সাহিত্য ভূষণ, 'শতাধিক বছর পূর্বে রচিত মুনসী ছাদেক 'আলীর হালতুন্নবী', *মহানবী স্মরণিকা ১৩৯৮ হি*, পৃ ৮৫-৮৬।

৫৮৩. মুকুল চৌধুরী, 'বাংলা কবিতায় রসূল প্রশস্তি এবং ঐতিহ্যবাদের নয়া প্রবণতা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮ হিজরী সংখ্যা, পৃ ২৩৯-২৫০।

৫৮৪. শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ, 'বাংলা সাহিত্যে রসূলুল্লাহ (সা)', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৬ হিজরী সংখ্যা, পৃ ৮২-৮৯।

৫৮৫. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম, *বাংলা ভাষায় সীরাতে রাসুলুল্লাহ (সা) চর্চা*, সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি, পৃ ১০০-১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সা)[৫৮৭], বাংলা গদ্য সাহিত্যে মুহাম্মদ (সা)[৫৮৮], মওলানা আকরম খাঁ : সীরাত সাহিত্যে তাঁর অবদান[৫৮৯], বাংলাদেশে সীরাত প্রকাশনা[৫৯০], ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত সীরাত গ্রন্থাবলী[৫৯১] এবং বাংলাদেশের প্রচার ও প্রকাশনা মাধ্যমে সীরাত চর্চা,[৫৯২] তুর্কী সাহিত্যে মহানবী (সা)[৫৯৩], উপমহাদেশে সীরাত সাহিত্য : আলোকপাত-১[৫৯৪], উপমহাদেশে সীরাত সাহিত্য : আলোকপাত-২[৫৯৫], বাংলা-কাব্যে রাসূল (সা)[৫৯৬], বাংলা ভাষায় সীরাতে রাসূল (সা.) চর্চা[৫৯৭], বাংলা শিশু-সাহিত্যে রাসূলুল্লাহ (সা)[৫৯৮], উপমহাদেশে সীরাত সাহিত্য : মালায়ালাম ও উড়িয়া[৫৯৯], রাসূল

---

৫৮৬. মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, 'বাংলা শিশু সাহিত্যে রসূলুল্লাহ (সা)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, পৃ ১১৭-১২৫ ।

৫৮৭. মোঃ আবুল কাসেম ভুঞা, 'বাঙালী অমুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় মহানবী (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র ঈদ-ই- মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৮ হিজরী সংখ্যা, পৃ ১৫০-১৫৬ ।

৫৮৮. মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন তুসী, 'বাংলা গদ্য সাহিত্যে মুহাম্মদ (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ২৮৪-২৯৭ ।

৫৮৯. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, 'মওলানা আকরম খাঁ : সীরাত সাহিত্যে তাঁর অবদান', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৩৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা- ৩৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৪-সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃ ১২০-১২৭ ।

৫৯০. খালেক বিন জয়েন উদ্দীন, 'বাংলাদেশে সীরাত প্রকাশনা', *অগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১৭ হিজরী সংখ্যা, ২৬৩-২৭০ ।

৫৯১. অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, 'ই ফা বা প্রকাশিত সীরাত গ্রন্থাবলী', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৪ হি* ।

৫৯২. আবু তাহের মুহাম্মদ মান্‌জুর, 'বাংলাদেশের প্রচার ও প্রকাশনা মাধ্যমে সীরাত চর্চা', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা) ১৪১৯ হিজরী সংখ্যা, পৃ ২৯৮-৩০৫ ।

৫৯৩. মুহাম্মদ নুরুল আমীন হাবিলদার, 'তুর্কী সাহিত্যে মহানবী (সা)', *অগ্রপথিক*, পবিত্র মীলাদুন্নবী (সা) ১৪২০, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৯, পৃ ১৩৩-১৪৭ ।

৫৯৪. আবদুল মুকীত চৌধুরী, 'উপমহাদেশে সীরাত সাহিত্য : আলোকপাত-১', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ ৮৪-৯৫ ।

৫৯৫. আবদুল ওয়াহিদ, 'উপমহাদেশে সীরাত সাহিত্য : আলোকপাত-২', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ ৯৬-১১৬ ।

৫৯৬. শাহাবুদ্দীন আহমদ, 'বাংলা-কাব্যে রাসূল (সা)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ ১২০-১২৬ ।

৫৯৭. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, 'বাংলা ভাষায় সীরাতে রসূল (সা.) চর্চা', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ১০০-১০৮ ।

৫৯৮. মোহাম্মদ আবুল কাশেম ভূঞা, 'বাংলা শিশু-সাহিত্যে রসূলুল্লাহ (সা.)', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ ১১৭-১২৫ ।

৫৯৯. আবদুল মুকীত চৌধুরী, 'উপমহাদেশে সীরাত সাহিত্য : মালায়ালাম ও উড়িয়া', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ৯৭-১০২ ।

Dhaka University Institutional Repository

(সা)-এরর উপর লিখিত কয়েকটি জীবনীগ্রন্থ : সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য[৬০০], পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা[৬০১], বাংলা ভাষায় রাসূল (সা) বিষয়ক গ্রন্থ[৬০২]।

৬০০. শাহাবুদ্দীন আহমদ, 'রসূল (সা)-র উপর লিখিত কয়েকটি জীবনীগ্রন্থ : সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য', *সীরাত স্মরণিকা ১৪১৮ হি*, ঢাকা : ই ফা বা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ ৭৮-৮৪।

৬০১. ড. খোন্দকার আবু নসর মুহম্মদ আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, 'পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃ ৪১-৫৯।

৬০২. নাসির হেলাল, 'বাংলা ভাষায় রাসূল (সা) বিষয়ক গ্রন্থ', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : ই ফা বা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃ ১০১-১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : তিন
বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চা মূল্যায়ন ও দিকনির্দেশনা

বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়ক লেখালেখি বর্তমানে উল্লেখযোগ্য ভালো অবস্থায় পৌঁছেছে। মূলতঃ সীরাত বিষয়ক লেখালেখির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বাংলায় ভাষার ধর্মীয় সাহিত্যপত্র মাসিক মদীনার মাধ্যমে ১৯৬১ সালে শুরু হয়। ষাটের দশকের শুরুর দিকে গড়ে ওঠা বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়ক প্রকাশনা ও সংবাদপত্রে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের এ ধারা খুব দ্রুতই সম্প্রসারিত হয়েছে। অসংখ্য সাধারণ শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত, দীনী আলেম, ছাত্র, তরুণ, গৃহিণী কিংবা অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ যে হারে যে রূপে সীরাত সম্পর্কীয় লেখালেখি করছেন নিঃসন্দেহে তা খুবই প্রশংসনীয় ও আশাব্যঞ্জক। পার্থিব কোন প্রাপ্তির আশা ছাড়াই প্রিয়নবী (সা)-এর প্রীতি ও আবেগময় সম্পর্কের টানে যে বিপুল সংখ্যক লেখক সীরাতচর্চা অব্যাহত রেখেছেন তাদের সংখ্যা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অন্য যে কোন বিষয়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এটা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের লেখকগণের ঈমানের উত্তাপ আর নবীপ্রেমের সজীবতারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ব্যাপক বৈচিত্র্যপূর্ণ শিরোনামে অভিনব ও সৃষ্টিশীল নানা বিষয়ে সীরাত উপস্থাপন বাংলা ভাষার লেখকগণ ইদানীং করছেন যা আরবী, ফারসী ছাড়াও সীরাত চর্চার অন্যতম মাধ্যম উর্দুতেও সাম্প্রতিক সময়ে খুব বেশি দেখা যায় না। এত দেরীতে শুরু হয়ে অল্প সময়ের ব্যাবধানে বাংলা ভাষায় আধুনিক সীরাত সাধনা যে বহুদূর এগিয়েছে তা আজ দ্ব্যর্থহীন ভাষায়ই বলা চলে। এমন সুন্দর, নতুন ও অনুদঘাটিত বিষয়ে লেখা হচ্ছে যা বিস্ময়কর। তবে খুব সুন্দর যাকে দেখতে চাই, তার দুরবস্থা যেমন ভীষণ ব্যথা জাগায় তেমনি সীরাত বিষয়ক লেখালেখি ও লেখকগণের কিছু মন্দ দিকও স্বপ্নভঙ্গ ঘটায়। বড়ই পীড়া দেয় এ সাফল্যের অগ্রযাত্রায় উটকো প্রতিবন্ধক বা অবাঞ্ছিত ছন্দপতন। এ সব সমস্যা এড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেলে সীরাত চর্চার বিষয়টি সর্বাঙ্গ সুন্দর আর কল্পনাতীত সফল হয়ে উঠবে।

বর্তমানে অন্তত ১০টি নিয়মিত প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা সীরাত সংখ্যা প্রকাশ করছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, জন্ম, শৈশব কৈশোর, মক্কী জীবন, মাদানী জীবন, দাওয়াত, নবুওয়ত, হিজরত, জিহাদ, ইবাদত, আখলাক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামষ্টিক জীবন, বিশ্বজনীন আহবান এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে সবিস্তার বর্ণনা করার মতো উৎসাহ ইদানীং খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক সীরাত গ্রন্থ পাঠ করে একটি প্রতিষ্ঠিত আলোচ্য বিষয়ের উপর তথ্যবহুল সমৃদ্ধ একটি লেখা তৈরির মত কষ্ট করতে অনেকেই চান না। তারা চান সৃষ্টিশীল অথচ নিম্নমানের কোন লেখার অবতারণা করে গবেষক বা ইসলামী চিন্তাবিদের স্তরে উপনীত হতে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে মানবাধিকার, নারী স্বাধীনতা, বিশ্বশান্তি, রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সীরাত প্রবন্ধ যে হারে রচিত বা সংকলিত হচ্ছে মৌলিক সীরাত চর্চার ঐতিহ্যগত শিরোনামে এর এক দশমাংশও হচ্ছে না। এটি নিঃসন্দেহে একটি শিকড় বিচ্ছিন্নতা ও বিভ্রান্তির ধীর সূচনা। সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িকী পর্যালোচনা করে এও দেখা গেছে, অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা এমনকি সম্পাদকীয় নিবন্ধ পর্যন্ত বিনা অনুমতিতে, মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ অবয়ব ও বিকৃতরূপে অযত্ন অবহেলায় নিজেদের পত্রিকা বা সংকলনে ছেপে দেন একশ্রেণীর লোক। এটা পরিশ্রমী লেখক, সম্পাদকদের মর্মপীড়ার কারণ এবং প্রকাশনা সংক্রান্ত নৈতিকতারও লঙ্ঘন।

মাদরাসা শিক্ষিত একশ্রেণীর তরুণ যখন সীরাত প্রবন্ধ লিখবেন তখন 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চরিত্র মাধুরী' বিষয়টি ছাড়া তাদের মাথায় যেন আর কোন বিষয়ই আসে না। একদল আছেন যারা অবশ্যই 'প্রিয়নবী (সা)-এর কাব্য ও কবি প্রীতি' নিয়েই লিখবেন। একশ্রেণীর লেখক কেবলই 'বিশ্বনবী (সা)-এর বহুবিবাহ' প্রসঙ্গ নিয়ে লিখবেন। বিগত প্রায় ২০ বছরের স্মারক সংকলন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, কারো একটি মাত্র প্রবন্ধই (হয়তো এই একটি লেখাই তার সম্বল) বার বার মুদ্রিত হচ্ছে। প্রতি বছর 'অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে মহানবী (সা)', অথবা 'মহানবীর বিদায় হজ্জের ভাষণ', 'বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান : মদীনা সনদ' ইত্যাদি নামে এসব লেখকের লেখা প্রকাশিত হচ্ছে।

সীরাত বিষয়ক লেখায় খুব ব্যাপক পড়াশোনা, নিজ দৃষ্টিভঙ্গি বিশুদ্ধতার উপর দৃঢ় আস্থা, প্রমিত বিশ্লেষণ ক্ষমতা আর প্রকাশ ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকলেই ব্যতিক্রমী, অভিনব ও সৃষ্টিশীল কোন বিষয়ের উপর কলম ধরা উচিত। তা না হলে দুঃসাহসী কোন সৃষ্টি প্রয়াসের ফলে ঈমানের গায়ে আঘাত আসাও বিচিত্র নয়। একজন লেখক যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)কে 'মূর্খ নবী' বলে উল্লেখ করেন, যখন একজন চিন্তাবিদ পর্যায়ের প্রাবন্ধিক লিখেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে মহানবী (সা) পড়ালেখা করার সুযোগ না পেয়ে অশিক্ষিত ও নিরক্ষর থেকে গেলেও নৈতিক ও চারিত্রিক অন্যান্য গুণের দ্বারা তিনি তার এ দুর্বলতাটুকু অতিক্রম করে যান' ইত্যাদি (নাউযুবিল্লাহ)। এসব খুবই পীড়াদায়ক। এখানে কোন প্রাবন্ধিকের সমালোচনা না করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনী উপস্থাপনায় তাদের ভ্রান্তিসমূহের মূল্যায়নধর্মী আলোচনা ও প্রবন্ধ সাহিত্যকে গতিশীল করার লক্ষ্যে কতিপয় সমস্যা চিহ্নিত করে এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করা হলো।

ইসলাম পূর্ব যুগ

দীর্ঘকাল ধরে মহানবী (সা)-এর জীবন ও আদর্শ প্রসঙ্গে লেখায় 'ইসলাম-পূর্ব যুগ' শব্দযুগল ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রশ্ন হচ্ছে, 'ইসলাম-পূর্ব' যুগ বলে কোন যুগ মানবেতিহাসে ছিলো কী না! যাঁরা এ শব্দ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র আগমন-পূর্বেকার সময় বুঝাতে এর সহজ প্রয়োগে অভ্যস্ত, তাঁরা বিষয়টিকে গভীরভাবে ভাবলে ভালো হয়। এটা স্বীকার্য, এ শব্দগুলোকে এভাবে প্রয়োগ করা নিছক বিভ্রান্তিকর। কারণ, 'ইসলাম-পূর্ব যুগ' বলা হলে এর দ্বারা আদম (আ) থেকে ঈসা (আ) পর্যন্ত নবী-রাসূলগণের

Dhaka University Institutional Repository

আগমনের ক্রমধারা ও ইসলাম প্রচার (সীমিত পরিসরে হলেও) প্রকারান্তরে অস্বীকার করা হয়। অন্যদিকে সাধারণ পাঠকের অনুভূতিতে একটি ধারণা (অবচেতনে হলেও) পল্লবিত হয় যে, ইসলাম হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকেই প্রচারিত হয়েছে। পূর্বেকার নবী-রাসূলগণের বিষয়ে জানা থাকলেও এ ধরনের শব্দচয়ন বিভ্রান্তিকর চিন্তার আবহ সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে এ ধরনের বক্তব্য রীতিমতো আত্মঘাতী বিবেচিত হতে পারে। কারণ, সামগ্রিক মুসলিম ইতিহাসের ক্রমধারা সম্পর্কে এদের অনেকেরই ধারণা অস্পষ্ট থাকতে পারে; এমনকি, কোন কোন ক্ষেত্রে নাও জানা থাকতে পারে। ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ এমন লিখেছেন বলেই এর গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নসাপেক্ষ হবে না, এমন নয়। অন্ধভাবে মেনে নেয়া বা কোন স্পষ্ট ভুল-ভ্রান্তির আনুগত্য অনুসরণ সঠিক কাজ হতে পারে না। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আগমন-পূর্ব যুগকে ইতিহাসবিদ বা ইতিহাস-বিশেষজ্ঞগণের অনেকেই 'আইয়ামে জাহিলিয়াত'–'অজ্ঞতার যুগ' বলেছেন। এ 'অজ্ঞতার যুগ' বলে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের আগেকার নিকট সময় বুঝানো কঠিন ব্যাপার নয়। এটা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না যে, এ অজ্ঞতা ও অনাচার কমবেশি প্রসারিত ছিলো মরু আরব থেকে আজমের প্রত্যন্ত অঞ্চল তথা ভূগোলকের সব প্রান্ত পর্যন্ত। তদানীন্তন বিশ্বের বিলীয়মান প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্মানুসারীদের অধিকাংশেরই মানবতা থেকে বিচ্যুতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয় সামগ্রিক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিত তৈরি করেছিল। সুতরাং 'অজ্ঞতার যুগ' বলতে আরব ভূখণ্ড তো অবশ্যই পৃথিবীর অজ্ঞতার যুগও বুঝানো হবে। তা না হলে মহানবী (সা)-এর নবুওয়াতের বিশ্বজনীনতার প্রেক্ষিত-ক্ষেত্র প্রতিকূল দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত প্রশ্নসাপেক্ষ হওয়ার অবকাশ সৃষ্টি হবে।

মানবীয়তা ও নবুওয়তী বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন প্রসঙ্গ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনী বিশ্লেষণে মানুষ হিসেবে তাঁর মানবীয়তা ও নবী হিসেবে নবুওয়তের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে লেখার ক্ষেত্রে যথাযথ সচেতনতা ও সাবধানতা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে পরিমিত ভারসাম্য না থাকলে হয় মানবীয়তা অতিরিক্ত আরোপিত হয়ে নবুওয়তের বৈশিষ্ট্যের ধারণাকে ম্লান করে ফেলতে পারে; না হয় নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য, মু'জিযা, অলৌকিকত্ব, শ্রেষ্ঠ রাসূলের মর্যাদা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী যথাযথের চেয়ে অধিক মাত্রায় এসে মানবীয়তার চিন্তাধারা ম্লান হয়ে যেতে পারে। উভয় দিকই গভীর আন্তরিকতা তো বটেই, বিশেষ সচেতনতা অবলম্বন খুবই আবশ্যক।

'অনন্য ও অনুপম' শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গ

মহানবী (সা)-এর অবস্থান বিশ্লেষণ অভিধানের কিছু বিশেষণ শব্দ দিয়েই করতে হবে। বিকল্প নেই, এটা সত্য। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, বিশেষণগুলোর কোন কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাও আছে। এ থেকে উত্তরণ কাম্য। পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের জন্য যে ধরনের বিশেষণে বিশেষত্ব দেখানো হয়, সে সব বিশেষণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যদি হয়ই, তা হলেও পরিবেশনের

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টি যথাযথ, শোভন ও সাবধানতার সাথে সম্পন্ন হওয়াই প্রত্যাশিত। এটা আমরা জানি এবং বিশেষভাবে বিশ্বাস করি, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কোন তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। এ জন্য 'অনন্য' 'অনুপম' পর্যায়ের শব্দাবলীই এ প্রসঙ্গে উপস্থাপিত হবে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে পাঠক-শ্রোতারা শ্রেষ্ঠ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মর্যাদা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবেন না।

বিষয়টি সম্পর্কে লেখকদের মতভিন্নতা না থাকলেও উপস্থাপনের পদ্ধতিগত সতর্কতার ক্ষেত্রে কেউ কেউ 'কিংকর্তব্য' ধরনের দোদুল্যমানতায় নিক্ষিপ্ত হতে পারেন। কিন্তু, মনোভাবের এ পর্যায় শেষ কথা হওয়া উচিত নয়। বাংলা অভিধানে যথোপযুক্ত শব্দের অভাব নেই। আর বিশ্বনবী (সা)-এর জন্য উপযুক্ত মানসম্মত শ্রদ্ধা প্রদর্শনমূলক শব্দাবলী নির্বাচনের জন্য ঘাটাঘাটি প্রয়োজন হলেও তাঁকে প্রকারান্তরে অবমূল্যায়নের চেয়ে তা নিশ্চয়ই শ্রেয়।

যুদ্ধ ও জিহাদ প্রসঙ্গ

মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনে ও সংশ্লিষ্টতায় সংঘটিত সশস্ত্র জিহাদসমূহকে প্রাবন্ধিকদের অধিকাংশই কেউ কেউ 'যুদ্ধ' শব্দ প্রয়োগে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রয়োগ-ধারা অনেক পূর্ব থেকেই প্রচলিত রয়েছে–কিছু ব্যাতিক্রম বাদে। বিষয়টি সৃষ্টি করতে ইসলামে 'জিহাদ'-এর ধারণা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। 'যুদ্ধ' শব্দকে অর্থবহ করতে মহানবী (সা)-এর 'গাযওয়া' ও 'জিহাদ' বুঝাতে যাওয়া ঠিক নয়। 'যুদ্ধে' মানুষের অবাঞ্ছিত শক্তি-মদমত্ততার ভিত্তিতে মানবীয় সার্বভৌমত্বের মত অনাকাঙ্খিত পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলে। এর মাধ্যমে ক্ষমতা বিস্তৃততর করা ও মানুষের উপর প্রভুত্ব করার প্রক্রিয়াই ঘটে আসছে। মোটকথা, মানুষের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে অত্যাচার-নির্যাতনের ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়, হোক সে কোন সম্রাট, রাজা-মহারাজা, সুলতান-বাদশাহ বা স্বৈরশাসক দ্বারা। কোন গাযওয়া বা জিহাদে (এখানে সশস্ত্র) এ চিন্তার অবকাশ নেই। ইসলামের জিহাদ ছিল প্রতিরোধমূলক; কখনো তা আক্রমণাত্মক নয়। এর উদ্দেশ্য, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের সার্বভৌমত্বের ধারণার অবস্থান সংহত করে মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের প্রসার, শোষিত, নির্যাতিত মানুষকে রক্ষা ও সামগ্রিকভাবে মানবিক মর্যাদায় উত্তরণের জন্য খোদ স্রষ্টা নির্দেশিত ব্যবস্থাপনা সম্পন্নকরণ। 'যুদ্ধ' ও 'জিহাদ'-এর কনসেপ্ট-এর পরস্পর বিরোধী ভিন্ন মেরুতে অবস্থান।

ইতিহাসের বীর যোদ্ধা, সেনাপতি, রাজা-মহারাজাদের রাজ্য-সাম্রাজ্য বিস্তৃতির লক্ষ্যে পরিচালিত 'যুদ্ধ' এবং মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম-এর 'সশস্ত্র জিহাদ' এক মানদণ্ডে পরিমাপ করা উচিত নয়। 'জাগতিক' এবং আরো কঠোরভাবে বললে 'বৈষয়িক' লক্ষ্য হাসিল করে 'ভোগের পেয়ালা' ষোলকলায় পূর্ণ করার 'যুদ্ধ' চেতনার সাথে ইসলামের শ্রেষ্ঠ নবীর 'জিহাদ'-কে এক করে দেখার এ ধারাবাহিকতা পাঠকদের ধারণাকে বড় বেশি 'পার্থিব'তায় পর্যবসিত করেছে, করবেও। লেখকদের পক্ষ থেকে (বেখেয়ালে হলেও) মূলত অবমূল্যায়ন থেকে স্বাভাবিকভাবে অন্যরা প্রভাবিত হবেন। সুতরাং বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

'আইন প্রণেতা' প্রসঙ্গে

প্রাবন্ধিকদের কেউ কেউ মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবন ও আদর্শ আলোচনায় তাঁকে 'আইন প্রণেতা' অভিধায় মূল্যায়ন করেন। এ ধরনের বক্তব্য গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। 'আইন প্রণয়ন' বা রচনা সংশ্লিষ্টের নিজস্ব সৃজনশীলতার ব্যাপার। আভিধানিকভাবে সেটাই বিবেচ্য। এ প্রেক্ষিতে প্রণয়ন-সংশ্লিষ্টতা আরোপ করলে ইসলামী আইন-বিধান রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সৃষ্টি বলে প্রতীয়মান হবে। কিন্তু মহানবী (সা)-এর আইন প্রণয়নের বিষয়টি যথাযথ তথ্য নয়, সে জন্য এভাবে বলা ঠিক হবে না।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর আইন-বিধান যেভাবে পাঠিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সেভাবেই পেশ করেছেন। সৃজনের দিকটিতে ইলাহী সত্তা। আবার, 'রাসূলুল্লাহ আইন প্রণেতা' এভাবে না বললে শানে রিসালত ক্ষুণ্ন হচ্ছে কি না, এটাও বিবেচ্য। তা হবে না। কারণ, মাহবুবে ইলাহী হযরত মুহাম্মদ (সা) মাবুদের পক্ষ থেকেই মানবজাতি তথা গোটা সৃষ্টিজগতের কাছে সে বিধান পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, অবশ্যই 'একক'ত্বও। এখানেই তাঁর 'শানে রিসালত'। এ মর্যাদা আর কেউ পাননি।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর শ্রেষ্ঠ রাসূলের মধ্যে মানবিক কল্যাণমূলক জ্ঞান সম্পদের মালিকানা বা মৌলিকতা সংক্রান্ত কোন দ্বিমত নেই, অসম্ভব। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দ্বারা ইসলামী আইন-বিধান প্রণয়ন বিষয়ে বলার মধ্যে আভিধানিকভাবে বা মর্যাদাগত কোন সমর্থনের দিকটি অযৌক্তিক। পয়গাম্বরের দায়িত্ব সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা এ বিষয়টির উৎসে থাকতে পারে। মানুষের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেয়া ও নিজস্ব জ্ঞান-প্রসূত সৃজনকুশলতার মধ্যে সুস্পষ্ট ফারাক রয়েছে। লেখকদের সে রেখা দৃষ্টিসীমায় রেখে শব্দচয়ন করাই সঠিক হবে। তা না হলে খোদ স্রষ্টার বিধান সম্পর্কে ভিন্নতর মূল্যায়নের অবকাশ দেখা দিবে।

বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনা

কুর'আন মাজীদে 'হে মানবজাতি' বলে বিভিন্ন স্থানে সম্বোধন করা হয়েছে। মহানবী (সা)-কে 'বিশ্বজগতের জন্য রহমত' আখ্যায়িত করা হয়েছে। যে নবী এভাবে সারা সৃষ্টিজগতের কল্যাণের বার্তা বহন করে এনেছেন, তাঁকে শুধু মুসলিম সমাজের জন্যই দেখানোর কোন সামগ্রিকতা নেই। বক্তব্য শুধু মুসলিম জীবন-সংশ্লিষ্ট হলে কথা নেই। কিন্তু যখনি জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিকতার দিকে লেখক অগ্রসর হবেন, তখনি মানব জাতির সমগ্রতাকে প্রসারিত করে বিশ্বজগতের দিকে নিয়ে যেতে হবে। সে দৃষ্টিকোণে মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবন-আদর্শ আলোচনায় নেয়া দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বিশ্বনবী প্রসঙ্গে আমরা কখনো কখনো নানাভাবে নানা সীমাবদ্ধতায় উপস্থাপন করে থাকি। বিষয়টিকে পর্যায়ভিত্তিক সামগ্রিক আলোকে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শুধু মুসলমান বা শুধু মানব জাতির কল্যাণে মহানবী (সা)-এর জীবনকথা আলোচনা-পর্যালোচনা-বিশ্লেষণে কিছু সীমিত ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সত্য-উন্মুখ মানুষের মনে। বিশ্বজনীনতার যে কল্যাণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাখলুকের জন্যও প্রযোজ্য, তার আয়তন ও পরিসরকে অসাবধানতায় সংকুচিত করার ফলে উৎসাহ-আগ্রহের কমতিই ঘটছে। যে তরুণ সমাজ মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও সামগ্রিকতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে আগ্রহী, তারা কিছুটা হলেও সীমিত ধারণায় আবর্তিত হচ্ছে। যারা মহানবী (সা)-এর মানবতার ছায়ায় সবার নিরাপত্তা ও শান্তির বিষয়টিকে যথাসম্ভব সংকুচিত দেখতে উৎসাহী, তারা পরোক্ষে তৃপ্ত হচ্ছে। এ ব্যাপারে সুবিস্তৃত বিশ্বপরিসর ও বিশ্বজনীন মানবিকতার অনুপম বার্তার দিকটি সামনে রাখা প্রয়োজন।

'ধার্মিক ও সাম্প্রদায়িক' প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র জীবনের আলোকে কোন মহৎ ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে আমরা কখনো কখনো এটা বলতে অভ্যস্ত যে, 'তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন; কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না।' কখনো কখনো খোদ রাসূলে করীম (সা) সম্পর্কেই এ ধরনের বক্তব্য পরিবেশিত হয়। জীবনদর্শন ও চিন্তাধারারূপে ধার্মিকত্বের সাথে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার যোজন যোজন দূরত্ব; এ পরস্পর বিপরীত চিন্তাকে একাত্ম করে ভাবার কোন অবকাশই নেই। সেখানে সুন্নাহ্‌র কোন অনুসারী (যিনি ধার্মিক বিধায় অসাম্প্রদায়িকতা তাঁর ঔরসজাত ও মজ্জাগত), তাঁকে 'কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না' বলে মূলত ধার্মিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা সহাবস্থানকারী বা একই বলয়ভুক্ত বলা হচ্ছে।

বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে লেখকের সরল ধারণা হতে আসে। কিংবা একটি হীনমন্যতাও সক্রিয় থাকতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি আদৌ বিশ্বাস করতে পারি, বা এ ভাবনার কোন সঙ্গত কারণ আছে যে, 'ধার্মিকতা' মানে 'সাম্প্রদায়িক হওয়া'? নিশ্চয়ই নয়। আমরা জানি, মহানবী (সা)-এর জীবন-দর্শন আমাদেরকে শুধু মানব জাতি নয়, সৃষ্টিজগতেরও কল্যাণে যথাসাধ্য নিয়োজিত হতে এবং কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে শিক্ষাদানকারী। সুমহান আদর্শ ও উজ্জ্বলতম উদাহরণের প্রেক্ষিত সত্ত্বেও এ ধরনের বাক্য পরিবেশন ইতিহাস-ঐতিহ্যের সম্পর্কে অপধারণা সৃষ্টি করবে। কৈফিয়তধর্মী বক্তব্য ধারার বিলম্বিত লয়ে উম্মাহ্‌র উজ্জ্বলতা ম্লান হচ্ছে। মুসলমানদের একাংশ এখন বিষয়টাকে এভাবে চিন্তা ও মূল্যায়নে অভ্যস্ত হয়ে গেছে; বাইরের মানুষ তো হবেই। এজন্য হীনমন্যতার ঊর্ধ্বে থেকে স্বচ্ছ ধারণা দানের জন্য এসবের ব্যবহার থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

'অসাধারণ' 'বিরল' শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে

শব্দগত পরিমিতিহীনতার উদাহরণ 'অসাধারণ বা 'বিরল' । এ শব্দগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র-মাহাত্ম্য বুঝাতে প্রাবন্ধিকরা ব্যবহার করে থাকেন । শব্দগুলো কোন ব্যক্তিত্বের মহিমাকে অবশ্যই উর্ধ্বে তুলে ধরে, এ ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ নেই । যিনি 'অসাধারণ' বা যাঁর উদাহরণ 'বিরল', তিনি নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট; তবে তিনি অন্যতম বিশিষ্ট বা প্রধান; আভিধানিক শব্দবিশ্লেষণে কোন বিবেচনায়ই তিনি 'একক' বা 'অনন্য' নন । তা হলে কি দাঁড়াচ্ছে? রাসূলুল্লাহ (সা) অমুক ক্ষেত্রে 'অসাধারণ' ছিলেন বা 'তাঁর দৃষ্টান্ত বিরল' মানে হচ্ছে তিনি 'সাধারণ কয়েকজনের মত ছিলেন না' বা 'তাঁর উদাহরণ অল্পই খুঁজে পাওয়া যাবে' । অর্থাৎ লেখকরা বেখেয়ালে তাঁদের বিষয়ের বিপরীতে অবস্থান নিচ্ছেন । রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁরা অনন্য, একক, সর্বোচ্চ মহিমাসম্পন্ন দেখাতে চান; কিন্তু অসাবধানী শব্দচয়নে তাঁকে পৃথিবীর আরো কতিপয় ব্যক্তিত্বের সমপর্যায়ভুক্ত করলেন! একটু গভীরভাবে বিষয়টি ভাবলেই উপস্থাপনের ত্রুটি ধরা পড়বে । এ সব শব্দ অবাধ গতিতে আমাদের রাসূলুল্লাহচরিত বর্ণনা বিশ্লেষণে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছে, আর আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠতম ও প্রিয়তম সৃষ্টির মাহাত্ম্যকে অবনমিত করছে! শুধু সচেতনতা, শুধু সাবধানতাই আমাদের শব্দ নির্বাচনে সহায়ক হতে পারে, 'অনুপম' রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যথাসাধ্য সেভাবেই উপস্থাপন করতে হবে ।

রাসূলুল্লাহ (সা) চরিত উপস্থাপনায় যথার্থবোধ প্রসঙ্গে

এমনিভাবে আরো কতিপয় উদাহরণ দেয়া যায় :

ক. হযরত মুহাম্মদ (সা) আরব জাতির অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অত্যাচার-অনাচারের চরম অবক্ষয় মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ।

খ. হযরত মুহাম্মদ (সা) হেরা গুহায় দীর্ঘদিন কঠোর সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন ।

গ. হযরত মুহাম্মদ (সা) একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, রাষ্ট্রনায়ক, অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, সমাজ সংস্কারক ছিলেন ।

ঘ. হাদীসটি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে গৃহীত ।

ঙ. নবী (সা) বললো ।

এগুলোকে আমরা এভাবে লিখতে পারি :

ক. 'আরব জাতির অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অত্যাচার-অনাচারের চরম অবক্ষয় মুহূর্তে কথাটি নিঃসন্দেহে সঠিক । কিন্তু সমস্যা দাঁড়াবে, যখন সারা পৃথিবীর তদানীন্তন অবস্থার প্রসঙ্গ না টেনে লেখক শুধু 'আরবের কথা বলবেন । আরব তো বটেই, সারা পৃথিবীতে তখন ছিল উত্তরণের জন্য হাহাকার ও আর্তি, যা বিশ্বনবী (সা)-এর আগমন-পূর্ব প্রেক্ষিত হিসেবে সামগ্রিক ।

Dhaka University Institutional Repository

খ. কঠোর সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন– কথাটি ঠিক নয়। নবুওয়তে বাধ্যতামূলক সাধনা সাপেক্ষতা নেই বা পূর্বশর্ত নয় এবং সিদ্ধি লাভের বিষয়টিও অবান্তর।

গ. একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, রাষ্ট্রনায়ক, অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, সমাজ সংস্কারক ছিলেন– পার্থিব ক্ষেত্রসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে। তবে সাথে 'একজন' শব্দ থাকায় তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিপন্ন হচ্ছেন। দ্বিতীয়ত মহানবী (সা)-কে কৃতি ব্যক্তিবর্গের মতই একই বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। যিনি সব ব্যাপারেই (অবশ্যই কল্যাণে) অনুপম, অতুলনীয়; তাঁকে এসব ক্ষেত্রে 'শ্রেষ্ঠ' বলার মধ্যে কোন যথাযোগ্যতা নেই। কথাটি এভাবে বলা যেত, 'শিক্ষা, রাষ্ট্র পরিচালনা, অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক-নির্দেশনা ও সমাজ সংস্কারে মহানবী (সা) ছিলেন অনুপম মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের মিনার শীর্ষে।' তাতে সাযূজ্যগত অবমূল্যায়নের প্রবণতা উৎসাহিত হতো না। যে শব্দমালা উচ্চারণ না করলেই নয়, তা যথাযথভাবে দেয়া যায়। এসবের প্রেক্ষিতে ক্ষেত্রবিশেষে গবেষক মানসে একটি হীনমন্যতা সক্রিয় থাকতে পারে যে, এভাবে বললে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সুন্দরভাবে দেখানো যাবে। কিন্তু এটি মূলতঃ হিসেবের ভুল, উপস্থাপনার ত্রুটি।

ঘ. হাদীসটি-এ শব্দ না লিখে সুনির্দিষ্টভাবে বলার জন্য 'হাদীসখানা' বলা যায়। হাদীসের সম্মানার্থে এ শব্দ এভাবেই সম্পন্ন হতে পারে।

ঙ. বললো-শব্দটি তুচ্ছার্থে প্রয়োগ হয়। উম্মাতে মুহাম্মদীর কোন সম্মানিত ব্যক্তি বা যে কোন সম্মানিত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এ শব্দটি প্রয়োগযোগ্য নয়। কিন্তু কোন কোন লেখক বা বক্তা প্রায়ই এ শব্দটি এই শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। এ ধারায় যাবতীয় প্রয়োগে কলম ও রসনা সংযত করে যথাযথ শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মান ও মর্যাদার জন্য নিদেনপক্ষে 'বললেন' তো উচ্চারণ করা যায় বা লেখা যায়। আর 'রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন' তো সর্বোপরি গ্রহণযোগ্য, সুতরাং প্রয়োগযোগ্য। আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে :

> হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেরা যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো, তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। যারা আল্লাহর রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাক্ওয়ার জন্য পরিশোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।[১]

---

১. আল কুর'আন, ৪৯ : ২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী জ্ঞান ও ভাষা প্রয়োগের ভারসাম্যতা প্রসঙ্গে

প্রাবন্ধিকদের কারো কারো ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে পাণ্ডিত্য থাকলেও লেখায় ভারসাম্যমূলক বক্তব্য রাখার সাবধানতা সচেতনতা না থাকায় আবেদন সীমিত হয়; ক্ষেত্রবিশেষে বস্তুনিষ্ঠ যৌক্তিক সমালোচনার অবকাশ সৃষ্টি হয়। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ উপস্থাপনে দুর্বলতার কারণে ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি বা গৌরবজনক মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি গভীর আস্থা সৃষ্টির স্থলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পাশাপাশি যদি লেখক গবেষক যথাযথ পরিমিতবোধ সম্পন্ন হন; ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্যে ঋজু থাকতে পারেন, অন্তর্দৃষ্টি, কাণ্ডজ্ঞানের চালিকাশক্তিতে শব্দ বা বাক্যচয়নে ও নির্মাণে যত্নশীল হন, তা হলে সোনায় সোহাগা। যথাযথ শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাসের সাথে সামগ্রিক বক্তব্যের ধারায় প্রতিফলিত হতে হবে।

ইসলামী জ্ঞানের সাথে বাংলা ভাষায় সমপর্যায়ের জ্ঞান একটি অনিবার্য পূর্বশর্ত। এক্ষেত্রে জ্ঞানের পাশাপাশি ভাষাগত পরিবেশন ক্ষমতা না থাকায় ভাষাগত বিচ্যুতি ঘটে। আবার মেপে কথা বলার ব্যাপারটি কারো কারো আয়ত্তে থাকে না, কোন শব্দ কি তাৎপর্য বহন করছে, এ সম্পর্কে শিথিল ধারণার জন্য ভারসাম্যহীন কথাবার্তা পল্লবিত হয় কিছু লেখায়। সর্বোপরি কৌশলের সাথে, সুন্দর ভাষায়, অসংলগ্নতার ঊর্ধ্বে থেকে ইতিবাচক আহবান সম্বলিত বক্তব্য পরিবেশন অপরিহার্য।

লেখক বা গবেষক একজন প্রচারকও। তত্ত্ব ও তথ্যে যথার্থ উৎস-নির্ভর বক্তব্য পরিবেশনের পাশাপাশি কুশলী গ্রহণযোগ্য উপস্থাপনাও অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

> তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহবান করো হিক্‌মত ও সদুপদেশ দ্বারা, আর তাদের সঙ্গে আলোচনা করো সদ্ভাবে।[২]

তা না হলে, গবেষণা-কর্ম ফলপ্রসূ না হয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে কম-বেশি। লেখকের মর্যাদা অবমূল্যায়নের অবকাশ ঘটবে, উপস্থাপিত বিষয়েও কোথাও কোথাও যৌক্তিক জিজ্ঞাসা উচ্চকণ্ঠ হবার কারণ হবে। আর আল্লাহর রাসূল (সা) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হলে তো বিভ্রান্তির পাশাপাশি গুনাহের আশংকা তো রয়েছে।

সমস্যা ও দিকনির্দেশনা

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চাকে সুসমন্বিত ও গতিশীল করতে হলে কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই আবশ্যক। এ বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হবে। প্রবন্ধ সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চার সার্থক রূপায়ণের জন্য এখানে কতিপয় সমস্যা চিহ্নিত করে এ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করা হলো।

---

২. আল কুর'আন, ১৬ : ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যাচার ও অপবাদ

ইসলাম ও ইসলাম প্রচারকগণ সম্পর্কে মিথ্যাচার ও অপবাদ সীরাতচর্চার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমন– ইসলাম সম্পর্কে বলা হয়, এটা মধ্যযুগীয় বর্বরদের পশ্চাদপদ আদর্শ, যা আধুনিক যুগে চলতে পারে না। মুসলমানদের প্রগতির পথে ইসলামই সবচেয়ে বড় বাধা, ইসলাম যুদ্ধ-বিগ্রহের ধর্ম, মুসলমানরা সবসময় মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত থাকে, ইসলাম তলোয়ারের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, মুসলমানরা ধন-সম্পদ লুট করার জন্য ইসলামকে নিয়ে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই ইসলাম ডাকাতদের ধর্ম। তেমনি বর্তমান যুগেও ইসলাম প্রচারকদেরকে বলা হচ্ছে মৌলবাদী, সন্ত্রাসী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ইত্যাদি।

এমনিভাবে ইসলাম সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এটা নারী স্বাধীনতা হরণকারী। আবার ইসলাম প্রচারকারীদেরকে বলা হচ্ছে স্বাধীনতা বিরোধী, সাম্প্রদায়িক শক্তি ইত্যাদি।

এ ধরনের অজ্ঞতাপ্রসূত ও বিভ্রান্তিমূলক অপবাদ দিয়ে ইসলাম এবং ইসলাম প্রচারকারীদের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। ফলে সাধারণ জনমত তাদের প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে এবং ইসলাম প্রচার-প্রসার ও বাস্তবায়নের কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

ইসলামবিরোধী শক্তি কর্তৃক অপবাদ দেয়ার অস্ত্রটি সুপ্রাচীন। তারা প্রত্যেক নবীকে মিথ্যাবাদী, পাগল, ফিৎনা সৃষ্টিকারী, যাদুকর ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করতো। এ সমস্ত অপবাদগুলো আল কুর'আনে বহু জায়গায় আলোচিত হয়েছে। আল কুর'আনের ভাষায় : 'এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা তাকে বলেছে, তুমি তো এক যাদুকর, না হয় উন্মাদ।'[৩]

মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল ওয়াহাবের তাওহীদি আন্দোলনকে সংস্কার আন্দোলন না বলে বলা হতো 'নজদী ওয়াহাবী আন্দোলন'। ভারতীয় উপমহাদেশে সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর স্বাধীনতা আন্দোলনকে বলা হতো 'ওয়াহাবী আন্দোলন'। ইসলামী আন্দোলনের নেতা জামালুদ্দীন আফগানীকে বলা হয় 'য়্যাহুদীদের চর', সাইয়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদীকে বলা হয় ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী, মাওলানা ইলিয়াসকে বলা হয় নবীর শানে বেয়াদবীকারী ইত্যাদি।

এভাবে বর্তমান যুগে মিসর, লিবিয়া, আলজেরিয়া, ফিলিস্তিন, ফিলিপাইন, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, ইরাক, চেচনিয়া ইত্যাদি এলাকায় ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য যারা আন্দোলন করছে, ইসলাম প্রচার-প্রসার ও বাস্তবায়নের জন্য যারা কাজ করছে, মহানবী (সা)-এর সুন্নাত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যারা কাজ করছে তাদেরকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী, মৌলবাদী, মধ্যযুগীয় বর্বর ইত্যাদি অভিধায় আখ্যা দেয়া হচ্ছে। অথচ যারা অপবাদ দিচ্ছে মূলত তারাই সন্ত্রাসী। যদিও তারা

---

৩. *আল কুর'আন*, ৫১ : ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদেরকে মানব কল্যাণকামী হিসেবে পরিচয় দেয়। আল কুর'আনের ভাষায় : 'তাদেরকে যখন বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তারা বলে আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী। সাবধান, এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু এরা বুঝতে পারে না।'[৪]

পাশ্চাত্যে বিকৃত সীরাতচর্চার প্রভাব

ইসলামের আবির্ভাব প্রাচ্যে। পাশ্চাত্যের অনেকেই প্রাচ্যের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি চর্চা করেন। পাশ্চাত্যবাসীরা তাদেরকে Orientalist বা প্রাচ্যবিদ বলে। প্রাচ্যবিদদের অধিকাংশই ইসলামবিরোধী। তারা ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিষ্কলুষ জীবনচরিতের বিকৃতি সাধন করার হীন মানসিকতায় প্রাচ্য চর্চায় রত হয়। প্রাচ্যবিদদের অধিকাংশই রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে মিথ্যা, বানোয়াট ও কটূক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। জার্মানীর অধ্যাপক মারগোলিয়থ Notdeke বিশ্বকোষে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা যে কোন বিচারেই চরম পক্ষপাতদুষ্ট। পাশ্চাত্যে সীরাতচর্চায় চরম পক্ষপাতিত্ব করেছেন এমন কয়েকজন হলেন, ইংল্যান্ডের ড. জি বি, ড. অইট (White), ওয়াশিংটন, উইলিয়াম মূর (Muir), বাসুরত স্মিথ, ওলিষ্টন, কুইল, জার্মানের ড. অইল, ড. স্পেঙ্গার, ভনক্রীমার, ক্রাইল, ফ্রান্সের বার্থহালমী, জুলিস, চার্লস ও হল্যান্ডের এইচ গ্রীম প্রমুখ। এছাড়া প্রাচ্যবিদ গোল্ডিযহার (Goldizher), পাসকেল, এন্ড্রী (Andree), লামাক (Lamak), লরেন্স ব্রাউন (Lourance Brown), মন্টোগোমারী ওয়াট (Montgomary watt), হিউগস (Huges) বেল রিচার্ড (Bell Richard), পেরেট (Paret), হ্যামিল্টন (Hamilton), মেসিগনন (Masiganon) প্রমুখ প্রাচ্যবিদ সীরাতচর্চার নামে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনচরিতের উপর কলংক আরোপের চেষ্টা করেছেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে এমন সব কটূক্তি করেছে যার দৃষ্টান্ত মক্কার কাফিরদের মাঝেও খুঁজে পাওয়া যায় না। কাফিরগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যুদ্ধ করেছে, অস্ত্রের ভাষায় কথা বলেছে, শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র গুণাবলীকে অস্বীকার করেনি। সততা, দয়া, ক্ষমা, অনুকম্পা, বীরত্ব, উদারতা, আমানতদারীতা অর্থাৎ মানবীয় সকল গুণের আকর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সৎ গুণাবলীকে কাফিররাও শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্বীকার করেছে এবং সম্মান প্রদর্শন করেছে। এমনকি তারাই 'আল আমীন' উপাধির প্রবক্তা।

সুতরাং প্রাচ্যবিদদের বিকৃত সীরাতচর্চা এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের মাঝেও নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে। এটাও বাংলাদেশে সীরাতচর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

অপসংস্কৃতির প্রভাব

পরিকল্পিতভাবে কোন জাতির সাংস্কৃতিক ভিত্তি এবং কার্যক্রমকে দুর্বল করা, বাধাগ্রস্ত করা এবং আগ্রাসী জাতির সংস্কৃতিকে সে জাতির উপর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে চাপিয়ে দেয়াকে 'সাংস্কৃতিক আগ্রাসন' বলা হয়।

---

৪. *আল কুর'আন*, ২ : ১১।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ আজ বিভিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার। যেমন দেশে আজ বাঙালী হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটিয়ে ইসলামী সংস্কৃতিকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। একশ্রেণীর সংস্কৃতি কর্মীরা অতীত সংস্কৃতি লালনের দোহাই দিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির উপর আঘাত হানার চেষ্টা চালাচ্ছে। আরেক শ্রেণীর সাংস্কৃতিক কর্মী আছে, যারা পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে বাংলাদেশে আমদানীর চেষ্টা করছে। এটাকে বলা হয় 'পাশ্চাত্যায়ন' প্রক্রিয়া (Westernization)। এ ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মীরা পাশ্চাত্য প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান আমদানীর কথা কিছুই বলছে না। তারা পাশ্চাত্যের নোংরা, অশ্লীল ও মানব সমাজ সভ্যতা বিধ্বংসী এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শের পরিপন্থী সংস্কৃতিকে মানবতা ও প্রগতির নামে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত। এর প্রচার ও প্রসারে সর্বশক্তি ও মেধা ব্যয় করছে। তারা ইসলামী জীবনধারা ও মুসলিম জীবনবোধকে সম্পূর্ণ ধ্বসিয়ে দিতে পরিকল্পিত পন্থায় এগুচ্ছে। ইসলামী শিক্ষা, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলাদেশের নাটক, সিনেমাসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে কোন খারাপ চরিত্রে রূপ দিতে হলে দাড়ি, টুপি, শেরওয়ানী পরিহিত কোন ব্যক্তির অবয়ব দেখানো হয়। মুসলিম ঐতিহ্যধারী পোশাককে সমাজের সকল অপকর্মের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়। এতে সাধারণ মানুষের অবচেতন মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

এভাবে সুকৌশলে ইসলামবিদ্বেষী সাংস্কৃতিক কর্মীরা ইসলামী কৃষ্টি-কালচারের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। তারা কাব্য সাহিত্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প, চারুকলা তথা প্রতিটি শিল্পকর্মের মাধ্যমে জীবনবিমুখ বস্তুবাদী ও ভোগবাদী নগ্ন পর্ণোগ্রাফী দর্শনের প্রসার ঘটাতে সতত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, সিনেমা, ভিডিও, টিভির বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এসব ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে যুব চরিত্র। বাড়ছে মাদকতা, অপরাধ প্রবণতা। এরা ছড়াচ্ছে মরণঘাতী রোগ, আমদানী করছে এইডস।

উল্লেখ্য যে, মানবতাবিরোধী জীবনবিমুখ অশ্লীল সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রভাব মানব সমাজে অতীতেও ছিল, কিন্তু তখন বর্তমান সময়ের মত এমন গণরূপ লাভ করেনি। তাছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এগুলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার মত এরূপ আধুনিক প্রচার মাধ্যম ও প্রযুক্তি ছিল না। তাই বর্তমান অবস্থা ভয়াবহ। ইসলামবিরোধীরা মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে বাস করে আগ্রাসন চালাচ্ছে। তেমনিভাবে বহিঃর্বিশ্ব থেকেও শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে শয়নে জাগরণে সর্বাবস্থায় আক্রমণ করছে। তাই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ইসলাম তথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শের প্রচার-প্রসার ও বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

সমাজে কাজ-কর্ম পরিচালনায় ও লেনদেন ক্রিয়াকর্মে পরস্পরের মাঝে মেলামেশার প্রয়োজন আছে। কিন্তু নারী-পুরুষের মেলামেশার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকা উচিত। অথচ সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বিকৃত যৌনতা, পর্দাহীনতা, সাংসারিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতি নারী সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমান্বয়ে অনীহা বৃদ্ধি, নারী আন্দোলনের নামে ইসলামী মূল্যবোধের বিরোধিতা, বাণিজ্যিক ফ্যাশন ও সংস্কৃতি চর্চার নামে নারীদের পণ্যদ্রব্য হিসেবে ব্যবহার ইত্যাদি দিকগুলো যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা রাসূলুল্লাহ (সা) চর্চার কার্যক্রমের পথে বাধা সৃষ্টি করছে।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধকল্পে জনসচেতনতা সৃষ্টি, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদর্শিত ইসলামী মূল্যবোধ তুলে ধরা এবং সে আলোকে চিত্ত-বিনোদনের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

সামাজিক কুসংস্কার

বাংলাদেশে কিছু সামাজিক কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রদর্শিত আদর্শ ও মূল্যবোধ বিরোধী। যেমন সমাজে কবর পূজা, ফকিরদের পরিত্রাণকারী মনে করা, যাত্রাক্ষণ (যেমন শনি যাত্রা না করা) মেনে চলা, ফাঁকা কলসীর সামনে পড়াকে কুলক্ষণ মনে করা, কপালে টিপ দেয়া, শস্য ক্ষেত্রে ঝাড়ু ও মূর্তি দাঁড় করানো, ভাগ্য ব্যাখ্যায় গণক ও জ্যোতির্বিদদের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি কুপ্রথা অহরহই দেখা যাচ্ছে।

বর্তমানে বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে মনসা বাজানো, জীব-জানোয়ারের মুখোশ পরা ইত্যাদি কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত যার অধিকাংশই পৌত্তলিকতা ও অতীত ঐতিহ্যবোধ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও স্বার্থান্ধতা থেকে সৃষ্ট। জাতীয়তাবোধ ও রুচির কথা বলে প্রকৃত ইসলামের ভাবধারা ও মূল্যবোধকে অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত করে। এ জন্য অতীতে ইসলাম প্রচারকদের উদ্দেশ্যে পৌত্তলিকদের বলতে শোনা যায়। যেমন- আল কুর'আনে এসেছে : 'তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এবং রাসূলের দিকে এসো। তখন তারা বলে, আমাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি।'[৫]

গণসচেতনা সৃষ্টি

বাংলাদেশে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন চরিতচর্চা এবং এর প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের প্রিন্ট মিডিয়া যেমন সাময়িকী, সংবাদপাত্রসমূহ এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, যেমন রেডিও টেলিভিশন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক যেমন– সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, রাষ্ট্র প্রশাসন, সরকার গঠন আন্তর্জাতিক কূটনীতি, চুক্তি-সন্ধি, মানবাধিকার, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি দিক জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারে। এ ছাড়া ইসলাম সম্পর্কে জনগণের মাঝে যে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও 'আকীদাগত ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে তা দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। দেশের আড়াই লক্ষ মসজিদের ইমাম এবং মাদরাসার 'আলিম সমাজ বছরব্যাপী এই গণসচেতনতামূরক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। ইসলাম যে নিছক ধর্ম

---

৫. *আল কুর'আন*, ৫ : ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

নয় বরং এটা পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ তা জনগণের সামনে উদ্ভাসিত হলে এ দেশে সীরাত চর্চায় নবদিগন্তের উন্মোচন ঘটবে।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব

ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারিদী ইবনুল মু'তাযের বলেছেন, ধর্মের মাধ্যমে রাজা টিকে থাকে, আর রাজার শক্তির মাধ্যমে ধর্ম শক্তিশালী হয়।[৬] সুতরাং রাষ্ট্রীয় শক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। খ্রিষ্টান মিশনারিরা পশ্চিমা রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে সারা বিশ্বব্যাপী তাদের ধর্ম প্রচারে ছড়িয়ে পড়েছিল, ইসলামের যে ধরনের আদর্শিক শক্তি আছে, খ্রিষ্টান ধর্মের যদি সে ধরনের আদর্শিক শক্তি থাকতো তাহলে সারা বিশ্বের মানুষকে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা তাদের জন্য কোন ব্যাপারই ছিল না।

বাংলাদেশে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসে বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে সীমিত পরিসরে অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন সীরাত স্মরণিকা প্রকাশ করে। রাষ্ট্রশক্তির নিকট থেকে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে দেশে মুহাম্মদ (সা) জীবন চরিতচর্চায় নবদিগন্তের সূচনা ঘটতো।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আরোহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোন কোন রাজনৈতিক দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুহাম্মদ (সা) জীবন চরিত পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মানুষকে ধর্মহীনতার দিকে ঠেলে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিতচর্চা ও এর প্রচার-প্রসার ও বাস্তবায়নের পথকে রোধ করার প্রয়াস চালায়। আবার কখনো কখনো রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করার উদ্যোগ গ্রহণ করতেও দেখা যায়। রাষ্ট্রশক্তির নির্লিপ্ততার সুযোগে এ দেশের কোন কোন সংবাদপত্র, সাময়িকী ও প্রচার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনচরিতকে ভূলুণ্ঠিত করার জন্য বিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কার্টুন ইত্যাদি প্রকাশ করতে দেখা যায়।

সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের এই দেশে সীরাতচর্চার যথাযথ বিকাশকল্পে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণের সকল কার্যক্রম পরিচালনা অনস্বীকার্য।

মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন

মুসলমানদের মাঝে ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। আর সেটা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রদর্শিত জীবনব্যবস্থা ইসলামকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার মাঝেই নিহিত। মুসলমানদের আল্লাহ এক, সকলেরই নেতা একমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। আল-কুর'আন তাদের একমাত্র সংবিধান। তাদের কিবলা এক। এ সমস্ত দিক তুলে ধরে ঐক্য প্রক্রিয়া আরো জোরদার করতে হবে।

---

৬. আবুল হাসান আল-মাওয়ারিদী, *আদাবুদ্ দুনইয়া ওয়াদ্ দ্বীন*, পৃ ১৩৭-১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

শিয়া-সুন্নী বা বিভিন্ন ফিক্‌হ মাযহাব কিংবা আঞ্চলিকতা ও বস্তুতান্ত্রিক আদর্শ বা জাতীয় মুসলিম জনতার মাঝে বিভক্তি নিরসনে প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শ প্রচার-প্রসার ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত ব্যক্তি বা সমষ্টি কিংবা সংগঠন ও সংস্থার মাঝে ঐক্য প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। কেননা ঐক্য ও সংহতি এনে দেয় শক্তি, দৃঢ়তা ও গতি। যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শ বাস্তবায়নের কাজে সফলতার জন্য খুবই প্রয়োজন। ঐক্য ও সংহতি স্থাপনে কয়েকটি কার্যক্রম গ্রহণ করা বাঞ্চনীয় :

ক. বিভিন্ন ইসলামী দল, সংগঠন বা ব্যক্তির দ্বীনী কাজকে স্বীকৃতি দান ও শ্রদ্ধা করতে হবে। কেননা কেউ হযতো রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন, কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং আখিরাতের কামিয়াবীর জয্‌বা ব্যক্তি জীবনে সৃষ্টি করার কাজে নিয়োজিত, কেউ হয়তো মাদরাসা বা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে, ওয়ায নসীহত করে, কেউ ইসলামী পুস্তক লিখে, কেউ তা ছাপিয়ে ইসলামের খিদমত করছেন। সকলের এই কর্মপ্রচেষ্টা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শ প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা কাজের অন্তর্ভুক্ত। তাই কারো কাজকে অশ্রদ্ধ করা যাবে না। হতে পারে কেউ তা করছেন দ্বীনের খিদমতের নামে, কিংবা দ্বীন কায়েমের নামে। সুতরাং মতপার্থক্য অনেকটা মাধ্যম বা ক্ষেত্রগত। মূল উদ্দেশ্য তো একই। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পদ্ধতিগত পার্থক্য কোন বড় ধরনের ক্ষতি করবে না।

খ. আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে ক্রমান্বয়ে মতপার্থক্য কমিয়ে আনতে হবে।

গ. দলকেন্দ্রিকতা, দলীয় বা সিলসিলা কেন্দ্রিক সংকীর্ণতা পরিহার করতে হবে।

ঘ. খুঁটিনাটি মাস'আলা-মাসায়েল ও মাযহাব সংক্রান্ত পার্থক্য দূর করা বা কমপক্ষে সহনশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনচরিত চর্চা ও তাঁর জীবনাদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে। যেন সকলের কর্মপ্রচেষ্টা পরস্পরের পরিপূরক হয়।

বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়ক ওয়েব সাইট

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে। বিশেষতঃ ইন্টারনেটের ব্যাপক প্রসার এক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সকল ভাষার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও গ্রন্থাবলী পড়ার জন্য আর লাইব্রেরী থেকে লাইব্রেরীতে ঘুরে বেড়াতে হয় না। ইন্টারনেটের মাধ্যমেই একজন পাঠক তার আরাধ্য দুর্লভ তথ্য কিংবা গ্রন্থটি পেয়ে যাচ্ছেন হাতের নাগালে। বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতও দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের তরুণ শিক্ষার্থীরা ক্রমশঃ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ইন্টারনেটসহ তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহারও লক্ষ্যণীয়। অথচ বাংলা ভাষায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনচরিত ভিত্তিক কোন

Dhaka University Institutional Repository

ওয়েব সাইট না থাকায় দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী এ মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শ জানতে পারছে না। তাই বাংলা ভাষায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ভিত্তিক বাংলা ওয়েব সাইট খোলার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

স্বতন্ত্র সীরাত লাইব্রেরী

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনচরিত তথা সীরাত সাহিত্যের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাঁর জীবনাদর্শ নিয়ে রচিত হয়েছে বিপুল পরিমাণ সাহিত্যকর্ম। বাংলাদেশে প্রতি বছর রবি'উল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে দৈনিক পত্রিকাগুলো ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা-সংগঠন সীরাত সাময়িকী প্রকাশ করে, রেডিও-টেলিভিশন অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করে। সাময়িকী সংবাদপত্রসমূহে দেশের বিশিষ্ট 'আলিম, বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন। রেডিও-টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালায় স্বনামধন্য ইসলামী ব্যক্তিত্বগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শের আলোকে যুগসমস্যার সমাধানে দিক-নির্দেশনামূলক সারগর্ভ আলোচনা করেন। তাছাড়া রবি'উল আউয়াল মাসসহ বছরের বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিপুল পরিমাণ সীরাতগ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। স্বতন্ত্র সীরাত লাইব্রেরী না থাকায় এগুলো অনেক সময় সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। ফলে সর্বসাধারণ এবং গবেষকগণ মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চার প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত অনেক সময় চাহিদামাফিক পান না।

সীরাত সাহিত্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যপক বিস্তৃত বিষয়ের উপর যথাযথ গবেষণা এবং এ জন্য তথ্য-উপাত্ত সহজলভ্য করার নিমিত্তে একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ সীরাত লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিনের। তাই সর্বসাধারণের রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শ জানা এবং গবেষকগণের সীরাত সাহিত্যের পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পাওয়ার জন্য স্বতন্ত্র একাধিক সীরাত লাইব্রেরী স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। এতে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত সীরাত বিষয়কগ্রন্থ, সাময়িকী, সংবাদপত্র, ডকুমেন্টারী, অডিও-ভিডিও ইত্যাদির পাশাপাশি বাংলা ভাষায় রচিত, অনূদিত সীরাত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, সংবাদপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ ছাড়া সকল লাইব্রেরীতে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর জীবনী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নিদর্শনাবলী ও উপকরণাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। এ ছাড়া বিদ্যমান লাইব্রেরীগুলোতে স্বতন্ত্র সীরাত গ্রন্থ কর্নার খোলা প্রয়োজন, পাঠক যেন সহজেই প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত খুঁজে পায়। স্বতন্ত্র সীরাত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হলে সীরাত সাহিত্যের উপর গবেষণা কার্যক্রম সহজতর হবে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারগুলোতেও নবীচরিত তথা সীরাত গ্রন্থসমূহের ব্যাপক সমাবেশ ঘটানো অত্যাবশ্যক। সীরাত গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারসমূহের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

সীরাত ইন্সটিটিউটের প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক বিকাশের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও গবেষণাকর্মের সুবিধার্থে পৃথক ও বিশেষায়িত ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে। এসব বিশেষায়িত ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর যথাযথ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

মুসলমানদের জীবনে সীরাত সাহিত্যের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। সীরাত সাহিত্যের নানা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা ও আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে তার প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণ তাই খুবই প্রয়োজন। বস্তুতঃ প্রযুক্তি নির্ভরতা, বৈশ্বিক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন এবং বর্তমান মানুষের জীবনযাত্রায় অত্যধিক গতিময়তা সংযোজনের প্রেক্ষিতে কিভাবে মুসলমানরা যথার্থ এবং স্বার্থকতার সাথে মহানবী (সা)-কে অনুসরণ করতে পারে– এ লক্ষ্যে সীরাত বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। ঢাকায় সম্প্রতি 'ইনস্টিটিউট অব হযরত মুহাম্মদ (সা)' প্রতিষ্ঠিত হলেও তার কর্মকাণ্ড সার্বজনীনতা পায় নি।

অতএব রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনচরিত অধ্যয়ন, ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা এবং তাঁর জীবনাদর্শের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য স্বতন্ত্র একাধিক সীরাত ইনস্টিটিউট/সীরাত গবেষণা সেন্টার স্থাপন করতে হবে। দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে সীরাত ইনস্টিটিউট স্থাপন করে এগুলোর অধীনে জেলা পর্যায়ে শাখা স্থাপন করা প্রয়োজন। এসব প্রতিষ্ঠান রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে, সেমিনার-সিম্পোজিামের মাধ্যমে মুসলিম জীবনে বিরাজিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শকে কার্যকরভাবে উপস্থাপন করবে। কেন্দ্রীয় এবং বিভাগীয় ইনস্টিটিউটগুলো উচ্চতর ডিগ্রী (এম এ, এম ফিল, পিএইচ ডি এবং ডিপ্লোমা ও ৩ মাস/৬ মাস মেয়াদী কোর্স) ডিগ্রী প্রদান করবে, সর্বোপরি ব্যাপক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যে সব সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ওয়ার্কসপ পরিচালিত হয়েছে তার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নে তৎপরতা চালাবে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একদল আদর্শবান, যোগ্য, দক্ষ লোক সৃষ্টি হবে, যারা রাসূলুল্লাহ (সা) জীবনচরিত প্রচার-প্রসার ও বাস্তবায়নে কাজ করবে। তবেই জন-জীবনে এর সুদূর প্রসারী ফলাফল প্রতিফলিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

প্রবন্ধ গদ্য সাহিত্যের শাখাবিশেষ। গদ্য সাহিত্যের সূচনা ১৮০১ সালের অব্যবহিত পরই। ইংরেজদের বাংলা শেখা ও বাঙালীদের ইংরেজি শেখানো, সর্বোপরি স্থানীয়দের মাঝে খ্রিস্টধর্মের প্রচার– এসব উদ্দেশ্যেই বাংলা ভাষায় গদ্য যুগের সূচনা ঘটে। ১৮০২ থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম প্রচারে নেমে মিশনারিরা ইসলাম ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিতভাবে কুৎসাপূর্ণ বহু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে। এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয় দশক এবং বিশ শতকের শুরুতে খ্রিষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা চরমে পৌছে। তারা ইসলামের অপব্যাখ্যা প্রচার শুরু করে। অনেক আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদেরকে বিপথগামী করে খ্রিষ্টান ধর্মের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। খ্রিষ্টান পাদ্রীদের এসব হিংসাত্মক আচরণ সহ্য করতে না পেরে মুনশী মেহেরুল্লাহ 'খ্রিষ্টান ধর্মের অসারতা' নামে একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ঊনিশ শতকের ধারায় ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খ্রিষ্টান মিশনারিদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে আরও কলম ধরেছিলেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)। তিনি বাইবেলের শান্তিবাণী প্রচারের নামে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের দোসর বিদেশী মিশনারিদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জাতিকে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে গেছেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক যুক্তিপূর্ণ নিবন্ধও রচনা করেছেন। মিশনারীদের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর লেখা প্রবন্ধ "মূল বাইবেল কোথায়?" এবং 'যীশু কি নিষ্পাপ?' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শেখ আবদুর রহিম মুসলমানদের দুর্দিনে ইসলাম সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা এবং মুসলিম ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল বিষয় জনসমক্ষে প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৮৭ সালে 'হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি' রচনা করেন। আধুনিক বাংলায় মুসলমানদের রচিত এটিই প্রথম সীরাত গ্রন্থ। এ পথ চলা দিন যত গেছে ততই শক্তিশালী হয়েছে। মাওলানা আকরাম খাঁর মোস্তফা চরিত (১৯৩২), গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী (১৯৪২) ও শায়খুল হাদীস মাওলানা তফাজ্জল হোছাইন-এর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) : সমকালীন পরিবেশ ও জীবন (১৯৯৮) বাংলা গদ্য সাহিত্যের মাইলফলক রচনা।

১৯২২-২৩ খ্রিস্টাব্দে 'দৈনিক সেবক' ও 'দৈনিক মোহাম্মদী' প্রকাশিত হয়। এসব পত্রিকায় লেখনির মাধ্যমে মাওলানা আকরম খাঁ সহ সমকালের অনেক মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তি ইসলামী ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনার প্রসার ও মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করতে শুরু করেন। ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডার ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধির পথে এগুতে থাকে।

১৯৬১-৬২ সাল। প্রবন্ধ সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিত চর্চায় এক নতুন অধ্যায়ের জন্ম সাল। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা হিসেবে ডানা মেলে 'মাসিক মদীনা'। সে থেকে আজ

Dhaka University Institutional Repository

অবধি মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের সম্পাদনায় এর যাত্রা অবিরাম চলছে। ১৯৬১ সালে ত্রৈমাসিক ইসলামিক গবেষণা পত্রিকা হিসেবে 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা' হাঁটতে শুরু করে। আজো চলছে। তবে ১৯৭৫ থেকে পত্রিকাটি প্রাতিষ্ঠানিক নাম বদলের প্রেক্ষিতে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' নাম ধারণ করে অব্যাহত গতিতে সবচেয়ে ধারাবাহিক গবেষণা পত্রিকা হিসেবে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় সবুজদের জন্য 'সবুজ পাতা'। আজো শিশু-কিশোরদের ইসলামী মননশীলতা গঠনে অবদান রেখে চলেছে। সত্তর দশকের এ তিনটি পত্রিকাই হযরত মুহাম্মদ (সা) জীবনচরিত বিষয়ক প্রবন্ধ সাহিত্যধারায় শ্রেষ্ঠত্বের এক মহান অবস্থানে আসীন হয়েছে।

বর্তমানে প্রবন্ধ সাহিত্যে সীরাতের প্রসার সত্যিই বড় ধরনের ব্যাপকতা লাভ করেছে। বাংলাদেশের প্রায় সবক'টি দৈনিক ক্রোড়পত্র না হলেও অন্তত একটি সময়োপযোগী প্রবন্ধ ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) দিবসে প্রকাশ করে। কমপক্ষে ২০/২৫টি মাসিক পত্রিকা ঈদে মিলাদুন্নবী সংখ্যা প্রকাশ করে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকে শুরু করে বেসরকারি উদ্যোগে পাড়া মহল্লা, মাদরাসা-স্কুলে ঈদে মিলাদুন্নবী স্মরণিকা প্রকাশিত হয় গ্রাম-শহর তথা বাংলাদেশের সব জেলায়। প্রতি বছর কেবল রবিউল আউয়াল মাসে কত সংখ্যক প্রবন্ধ সারা বাংলাদেশে প্রকাশিত হয় তার সঠিক পরিসংখ্যান বের করা সত্যিই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডারের মূল্যায়নও তাই অনেকটা অসম্ভব কাজ।

এই গবেষণায় তাই বাংলাদেশের সেরা প্রবন্ধ সংকলনসমূহের পর্যালোচনাকে লক্ষ্য স্থির করে কাজ করা হয়েছে। এই বিবেচনায় প্রধানত ১৯৯০ থেকে গত ২০/২১ বছরের *মাসিক মদীনা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাসিক প্রকাশনা *অগ্রপথিক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা* এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা ত্রৈমাসিক *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায়* প্রকাশিত মুহাম্মদ (সা) বিষয়ক প্রবন্ধকে পর্যালোচনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক এই সময়ের প্রবন্ধ পর্যালোচনা করে গবেষক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সংখ্যার বিচারে প্রবন্ধ সাহিত্যের উৎকর্ষ ঘটলেও লেখা, লেখার মান, শিরোনামের আধুনিকায়ন ও সর্বোপরি সম্পাদনার মান প্রশ্নাতীত নয়। এ ছাড়া ধরনগত কারণে কোন এক স্মারক গ্রন্থ বা স্মরণিকায় পূর্ণাঙ্গভাবে মুহাম্মদ (সা) জীবনচরিত উপস্থাপনও সম্ভব নয়। তবে আশার কথা হচ্ছে মৌলিক সীরাত চর্চার পাশাপাশি যুগ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চার ক্রমবর্ধমান দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

আবহমানকাল থেকে দেখা গেছে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর কিছু লিখে মুহাম্মদ (সা) বিষয়ক লেখক হবার প্রবণতা লেখক মাত্রই আছে। ফলে এ ধরনের লেখকদের লেখায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবেই। তাদের দরদকে তো আর উপেক্ষা করার সুযোগ নেই! প্রবীণ আলিম, বিশিষ্ট গবেষক ও বোদ্ধাদের মুহাম্মদ (সা) বিষয়ক রচনা বিশেষ করে বিষয় বৈচিত্র্য সত্যিই প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রাণ। এ ধারা উত্তরোত্তর আরো বেগবান হবে, আলোকিত করবে সমাজ ও দেশকে– এটাই প্রত্যাশা।

Dhaka University Institutional Repository

দুই.

সাম্প্রতিক সময়ের মুহাম্মদ (সা) চরিত বিষয়ক প্রবন্ধ সাহিত্য ও সীরাত বিষয়ক বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, মুহাম্মদ (সা) চরিত আলোচনার সঠিক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা অনেক দূরে অবস্থান করছি। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুহব্বত ও শ্রদ্ধার অসংখ্য প্রদর্শনী সত্ত্বেও এবং তাঁর জীবনাদর্শের জন্য অনেক মানসিক চেষ্টা সাধনার পরেও আমাদের ইতিহাসে সে ধরনের কোন নতুন ব্যক্তি তৈরি হচ্ছেন না, যার পূর্ণাঙ্গ অবয়ব নবী করীম (সা) দুনিয়াতে রেখে গেছেন। মহানবী (সা)-এর জীবনাদর্শ আমাদের জীবনে ততদিন পর্যন্ত প্রতিফলিত হবে না যতদিন পর্যন্ত আমরা সে আদর্শের জন্য তাঁরই মত সর্বাত্মক 'ইবাদতে রত না হব, যার প্রতিষ্ঠার পেছনে কুরবান ছিল তাঁর সারাটি জীবন।

মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনাদর্শ তো কোন সাধারণ ব্যক্তি-বিশেষের জীবনাদর্শ নয়; এটা মানবীয় রূপধারী এক ঐতিহাসিক শক্তির জীবনচরিত। এটি এমন কোন দরবেশের কার্যাবলীও নয়, যিনি সমাজের বাইরে থেকে আত্মশুদ্ধিতে মশগুল থাকেন। আসলে এটা হচ্ছে সে মহান অস্তিত্বের রহস্য যা একটা সমাজ বিপ্লবের জীবন প্রাণশক্তি। এ তো একজন মানুষের নয়; মানুষের স্রষ্টারই প্রতিধ্বনি। এ জীবনীতে নিহিত রয়েছে 'যুগ' স্রষ্টার কীর্তিসমূহ। একটি পূর্ণাঙ্গ দল, একটি বিপ্লবী আন্দোলন এবং একটি সমাজ কাঠামোতেই সে কীর্তির বিশ্লেষণ সন্নিহিত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শ হেরা গুহা থেকে সুর গুহা পর্যন্ত, পবিত্র কা'বা হতে তায়েফের বাজার পর্যন্ত এবং মুমিন মাতাদের গৃহকক্ষ হতে যুদ্ধের প্রান্তর পর্যন্ত সর্বত্রই প্রসারিত ও বিরাজিত। এর চিহ্নসমূহ অসংখ্য ব্যক্তির জীবন ইতিহাসের পাতাসমূহের সৌন্দর্য হয়ে আছে। হযরত আবূ বকর, ওমর, ওসমান, আলী, আম্মার, ইয়াসির, খালিদ, খুয়ায়লিদ, বিলাল ও সোহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুম সবাই ছিলেন একই আদর্শ পুস্তকের বিভিন্ন পাতা। তাঁরা এমন একটি বাগানের উর্বরাঞ্চল যার লালা, নার্গিস ও নিস্তরণ ইত্যাদি ফুলের পাপড়িতে বাগানের মালির জীবনাদর্শ রচিত ও অংকিত রয়েছে। সে বসন্ত কাফেলা সমসাময়িক যে ভূখণ্ডের উপর দিয়ে চলে গেছেন তার প্রতিটি ধূলিকণায় স্বীয় আদর্শ চিহ্ন অংকিত করে গেছেন।

বিশ্বের সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্বকে ইতিহাসের পাতায় যদি শুধু একজন ব্যক্তি হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়, যদি ঐতিহাসিকতার প্রচলিত পদ্ধতিতে তাঁর জীবনের সুমহান কীর্তিগুলো, তাঁর উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপসমূহ এবং তাঁর চরিত্র মাধুর্য বর্ণনা করা হয় এবং তাঁর সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক সংবাদ পরিবেশন বা ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা করা হয়, তাহলে এ পবিত্র জীবনালেখ্যর সঠিক উদ্দেশ্য কিছুতেই পূর্ণ হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্ত কোন কূপের স্থির ও নিশ্চল পানির মত নয় যে, আমরা তার এক পাড়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত পানির পরিমাণ এক দৃষ্টিতেই করে ফেলতে পারি। তাঁর জীবনের উদাহরণ হল এমন এক প্রবহমান নদীর মত যাতে রয়েছে আন্দোলন, প্রবাহ, উত্তালখেলা তরঙ্গমালা, বুদবুদরাশি, ঝিনুক ও মণি মুক্তার সমাবেশ, যার পানি পেয়ে শুকনো ভূমির শস্যরাজি পাচ্ছে ক্রমাগত জীবনীশক্তি। এ নদীর গুপ্ত রহস্য জানতে হলে যাত্রা করতে হবে তার সাথে সাথে। এ যাত্রা শুরু করা যাচ্ছে না বলেই মহানবী (সা)-এর সীরাত আলোচনা ও জীবন চরিতের বই পড়ে বিরল ও দুর্লভ তথ্য উদঘাটন করা সম্ভব হচ্ছে সত্য কিন্তু আমাদের মাঝে আন্দোলনের সৃষ্টি হচ্ছে না, প্রেরণা জেগে উঠছে না, সাহস-সংকল্পের শিরা উপশিরায় নতুন রক্ত-কণিকা প্রবাহিত হচ্ছে না, কর্ম-প্রেরণায় নবোদ্যমের সৃষ্টি হচ্ছে না, আমাদের জীবনের জড়তা কাটছে না। সর্বোপরি, আমাদের মধ্যে এমন কোন দৃঢ়সংকল্প ও দুর্দমনীয় সাহসের সঞ্চার হচ্ছে না যা এক সময় উপায়-উপকরণশূন্য একমাত্র ব্যক্তিত্ব মহানবী (সা)-কে যুগ যুগান্তের স্তূপীকৃত বাতিল সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

মূলত মহানবী (সা) প্রচলিত সীমিত অর্থের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁর সীরাত এমন কোন বিরাট বা বিখ্যাত ব্যক্তির কাহিনীও নয়, যাঁকে আমরা বিভিন্ন জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ইতিহাসের পাশাপাশি রেখে আলোচনা করতে পারি। আসলে এ ব্যক্তিত্ব তো ওসব 'বিশিষ্ট ও বিখ্যাত' ব্যক্তিদের অনেক অনেক উর্ধ্বে।

পৃথিবীতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিই জন্ম নিয়েছেন আর ভবিষ্যতেও জন্ম নেবেন। বিশিষ্ট ব্যক্তি তো তাঁরাও যাঁরা কিছু ভালো শিক্ষা বা গঠনমূলক চিন্তা উপস্থাপন করেছেন। যাঁরা নৈতিকতা ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন, যাঁরা সমাজে কিছু সংস্কারমূলক কাজ করেছেন, যাঁরা কোন রাজ্য জয় করে বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস স্থাপন করেছেন, যাঁরা বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছেন, যাঁরা সাধু-সন্ন্যাসীগিরির আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, যাঁরা দুনিয়াতে ব্যক্তি চরিত্রের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। কিন্তু অনুরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, তাঁদের শক্তির সমস্ত আর্দ্রতা জীবন বৃক্ষের কোন একটি মাত্র শাখাই চুষে খেয়ে ফেলেছে, আর বাকী সমস্ত শাখা-প্রশাখা শুকিয়ে কাষ্ঠখণ্ড হয়ে গেছে। তাঁদের জীবনের একটি দিক যদি উজ্জ্বল দেখায়, তবে অন্য সব দিক থাকে তিমিরাচ্ছন্ন। একদিকে আধিক্য থাকে, তো অন্যদিকে থাকে স্বল্পতা।

মহানবী (সা)-এর জীবনচরিত এগুলো থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র– একান্তই অভূতপূর্ব ও অভিনব। তাঁর জীবনের প্রতিটি দিক ছিল পূর্ণ ভারসাম্যময়, প্রতিটি বিভাগ ছিল পূর্ণতার উজ্জ্বল প্রতীক। তাঁর জীবনে কঠোরতার পাশে রয়েছে সৌন্দর্য, ভাবের সাথে আছে বাস্তবতা, ইহকালের সাথে পরকাল, দ্বীনের সাথে জড়িত আছে দুনিয়া, আত্মমগ্নতা থাকলে তার ভেতরে নিহিত রয়েছে সচেতন আত্মোপলব্ধি, আল্লাহর দাসত্বের পাশাপাশি রয়েছে মানুষের জন্য প্রেম-প্রীতি, কঠোর সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তির

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারের পূর্ণ স্বীকৃতি, গভীর ধর্মীয় অনুভূতির সাথে রয়েছে সর্বাত্মক রাজনীতি, জাতীয় নেতৃত্বদানের ব্যস্ততার সাথে রয়েছে দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সুন্দরতম কাজ-কর্ম এবং মজলুমের ফরিয়াদ শ্রবণের সাথে সাথে রয়েছে জালিমের অত্যাচারী হস্ত দমনের সুব্যবস্থা।

তাঁর পবিত্র জীবনী হতে একজন বিচারক, একজন প্রেসিডেন্ট, একজন প্রধানমন্ত্রী, একজন সচিব, একজন আমলা, একজন মহাজন, একজন সিপাহী, একজন বণিক, একজন জজ, একজন মজুর, একজন বক্তা, একজন শিক্ষক, একজন নেতা, একজন সংস্কারক, একজন দার্শনিক এবং একজন সাহিত্যিক-প্রত্যেকেই সমমানের শিক্ষা পেতে পারেন। এতে একজন পিতা, একজন সহযাত্রী ও একজন প্রতিবেশীর জন্য রয়েছে তাদের স্ব স্ব অনুকরণীয় আদর্শ। যে কেউ একবার এ পাঠশালা হতে বায়'আত নিয়েছে, তাকে আর কখনো অন্যের দ্বারে ধর্ণা দিতে হয়নি। মানবতা সর্বোচ্চ যে স্তর পর্যন্ত উপনীত হতে পারে, তা এই একটি মাত্র ব্যক্তিত্বের মধ্যেই বিরাজিত হয়েছে। ইতিহাসে 'মহামানব' বলতে এই একমাত্র ব্যক্তিই আছেন, যাঁর জীবন-প্রদীপ 'সিরাজুম মুনিরা' হতে আমাদের জীবন প্রাসাদসমূহ যুগ যুগ ধরে আলোকিত হতে পারে। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এ প্রদীপ হতে আলো গ্রহণ করেছে। লাল লাখ প্রবীণ ব্যক্তি নিজ নিজ শিক্ষা ও কর্মের বাতি এ প্রদীপ থেকেই জ্বালিয়েছেন, বিশ্বের দিকে দিকে এরই পয়গাম প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এবং এরই শিক্ষার প্রভাব পড়েছে দেশ হতে দেশান্তরের তাহযীব-তমদ্দুনের উপর। এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে কোন না কোন প্রকারে এ মহামানবের কাছে ঋণী নয়। যদিও সে জানে না কার কাছে সে ঋণী এবং কি তাঁর পরিচয়।

বিশ্ববাসীকে তাঁর সত্তার পরিচয় দান এবং তাঁর পয়গামের বিস্তৃতি ও প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব ছিল তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত উম্মাহর উপর। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, সে উম্মাহ নিজেই এ মহান ব্যক্তি ও তাঁর পয়গাম থেকে দূরে সরে পড়েছে। তাই বর্তমানে হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিতচর্চার মৌলিক দাবি হচ্ছে নিজেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শে সমাজে উপস্থাপনের সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করা।

আল্লাহ আমাদেরকে মুহাম্মদ (সা)-এর দেখানো পথে পরিচালিত করুন, আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

: *আল কুর'আন*

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ১ম খণ্ড
কলকাতা, ৩য় সং ১৯৬০ ।

: *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৫ম খ
কলকাতা : ১৯৮৫ ।

আবদুল গফুর সম্পা. : *ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা*
ঢাকা : তমদ্দুন মজলিস, ১৯৯৯ ।

: *বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা*
১ম বর্ষ ১ম সংখ্য, ঢাকা, ১৩৭৬ ।

আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পা. : *নজরুল ইসলাম, ইসলামী কবিতা*
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৮৫ ।

আবদুল মান্নান তালিব : *আমাদের মহানবী*
ঢাকা : সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ১৯৭৬ ।

আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী : *মহানবী স্মরণিকা*
ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলাম প্রচার সমিতি, ১৯৭৮ ।

আবদুর রহমান আযযাম
আবু জাফর অনূ. : *মহানবীর শাশ্বত পয়গাম*
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৮০ ।

আবু জাফর : মাওলানা আকরাম খাঁ
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৮৬ ।

আবু তাহের মুহাম্মদ মান্‌জুর : *ইসলামের পূর্ণতা ও হযরত মুহাম্মদ (সা)*
ঢাকা : পানাম প্রেস লিমিটেড, ২০০২ ।

আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড. : *বাংগালী মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা আকরাম খাঁর অবদান*
অপ্রকাশিত পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ, ঢা বি, ১৯৮৭ ।

আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরী সম্পা. : *রাসূলের শানে কবিতা*
ঢাকা : প্রীতি প্রকাশন, ১৯৯৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

আইম নেছার উদ্দীন, ড. : *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*
ঢাকা : ইফাবা, ২০০৫ ।

আতোয়ার রহমান : *শিশু সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*
ঢাকা : বাএ, ১৯৯৪ ।

আ ত ম মুছলেহ উদ্দীন : *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৯৮ ।

আর সি মজুমদার : *বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খ*
কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স ।

আনিসুজ্জামান : *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*
ঢাকা : ১ম সং ১৯৬৯ ।

: *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*
ঢাকা : বা এ, ১৯৬৪ ।

: *সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মাওলানা আকরম খাঁ*
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৮৬ ।

আলী আহমদ সম্পা.
সৈয়দ সুলতান রচিত : *ওফাতে রসুল*
নেয়াখালী, ১ম সং ১৩৫৬ ।

আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী
আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূ. : *নবী চিরন্তন*
ঢাকা : বুক সোসাইটি, ১৯৭৯ ।

আজিজুর রহমান চৌধুরী সম্পা.
সৈয়দ হামজা রচিত : *জৈগুনের পুথি*
ঢাকা : হামিদিয়া প্রেস, তা বি ।

আহমদ শরীফ, ড. সম্পা. : *নবী বংশ, ১ম খ*
ঢাকা : বা এ, ১৯৭৮ ।

: *সওয়াল সাহিত্য*
ঢাকা : বা এ, ১৯৭৬ ।

: *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*
ঢাকা : বর্ণ মিছিল, ১ম সং ১৯৭৮ ।

: *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খ*
ঢাকা : বা এ, ১ম সং, ১৯৮৩ ।

: *সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ*
ঢাকা : বা এ, ১ম সং ১৯৭২ ।

: *বাংলায় সুফি সাহিত্য*

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা : বা এ, ১ম সং ১৯৬৯ ।

: *সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান*
ঢাকা : বা এ, ১৯৭৫ ।

: *শা'বারিদ খান গ্রন্থাবলী*
ঢাকা : বা এ, ১ম সং ১৯৬৬ ।

: *রসুল চরিত*
ঢাকা : বা এ, ১৯৭৮ ।

: *সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ*
ঢাকা : বা এ, ১ম সং ১৯৭২ ।

আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরী সম্পা. : *রাসূলের শানে কবিতা*
ঢাকা : প্রীতি প্রকাশন, ১৯৯৬ ।

ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ সম্পা. : *হযরত রাসূলে করীম (সা) জীবন ও শিক্ষা*
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৮৯ ।

ইসলামিক একাডেমী সম্পাদনা বোর্ড সম্পা. : *সহি বড় রহমতে আলম*
ঢাকা : ইসলামিক একাডেমী, ১৯৬৫ ।

ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ সম্পা. : *হযরত রাসূলে করীম (সা.) জীবন ও শিক্ষা*
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৯৭ ।

ই ফা বা সংকলিত : ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি
ঢাকা : ই ফা বা, ২০০৪ ।

ই ফা বা : *সীরাত বিশ্বকোষ*, ৮ম খ
ঢাকা : ই ফা বা, ২০০৩ ।

ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ : *হযরত রাসূলে করীম (সা) : জীবন ও শিক্ষা*
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৯৭ ।

এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, ড. : *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) : মু'জিয়ার স্বরূপ ও মু'জিযা*
ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৯ ।

ওয়াকিল আহমদ, ড. : *মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর সাহিত্য ও মন : সমীক্ষা*
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বসন্ত সংখ্যা, ১৩৮৪ ।

কাজী নজরুল ইসলাম : *মরু ভাস্কর*
ঢাকা : প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপো, ১৯৫৫ ।

কাজী দীন মুহম্মদ, ড. : *আমি তো দিয়েছি তোমাকে কাউসার*

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা : প্রীতি প্রকাশন, ১৯৯৩ ।

খান মোছলেহ উদ্দীন আহমদ : *মহানবীর সীরাত কোষ*
ঢাকা : শতদল প্রকাশনী, ১৯৯০ ।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ : *মোস্তফা চরিত*
ঢাকা : ঝিনুক পুস্তিকা, ১৯৭৫ ।

: *মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য*
কলকাতা : মোহাম্মদ বুক অগ্রণী, ১৯৩২ ।

মাওলানা নুরুদ্দীন আহমদ : *পেয়ারে মুহাম্মদ (সঃ)*
ঢাকা : রশীদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৩ ।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম : *অর্থনৈতিক সুবিচার ও হযরত মুহম্মদ (দ.)*
ঢাকা : জাতীয় পুনগর্ঠন সংস্থা, ১৯৬৯ ।

: *বিশ্ব নবীর অর্থনৈতিক সমাধান*
ঢাকা : জাতীয় পুনগর্ঠন সংস্থা, ১৯৭০ ।

: *বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্ব নবী ও ইসলাম*
ঢাকা : পলাশ পাবলিকেশন্স, ১৯৭৬ ।

: *রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত*
ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৮ ।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সম্পা. : *মাসিক মদীনা*
ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ ।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী
আবদুল মান্নান অনূ. : *খতমে নবুয়ত*
ঢাকা : ইসলামিক একাডেমী, ১৯৬২ ।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড. : *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক*
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৮০ ।

: *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক*
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৮০ ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. : *প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী*
ঢাকা : রেনেসাঁস পাবলিশার্স, ১৯৫২ ।

: *শেষ নবীর সন্ধানে*
ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬১ ।

: *নবী করিম হযরত মোহাম্মদ (দ.)*
ঢাকা : রেনেসার্স প্রিন্টার্স, ১৯৭৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ আবু তালিব সম্পা. : *লালন শাহ ও লালন গীতিকা*
ঢাকা : বা এ, ১৯৬৮ ।

মুহাম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, ড. : বাংলাদেশের গবেষণা পত্রিকা
ঢাকা : বাএ, ১৯৯২ ।

মুহাম্মদ নূরুল আমীন : *বিশ্ব সাহিত্যে বিশ্বনবী*
ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৫ ।

মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা : *বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চা*
ঢাকা : তাওহীদ প্রকাশনী, ১৯৯৮ ।

: *পুথি সাহিত্যে মহানবী (সা)*
ঢাকা : সাহিত্যাজ্ঞান, ১৯৯২ ।

: *শিশু সাহিত্যে সর্বশেষ রাসূল (সা)*
ঢাকা : তাওহীদ প্রকাশনী, ১৯৯৬ ।

: অনুবাদ সাহিত্যে শেষ নবী
ঢাকা : তাওহীদ প্রকাশনী, ১৯৯৬ ।

যায়নুল আবেদীন রাহনুমা
আবু জাফর অনূদিত : *বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা)*
ঢাকা : আল আমীন প্রকাশন, ২০০০ ।

শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন
ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন সম্পা. : *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) : সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*
ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১মপ্র ১৯৯৮ ।

শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পা. : *সীরাত স্মরণিকা*
১৪০৪ হি ।

শেখ ফজলুর রহমান সম্পা. : *সীরাত স্মরণিকা*
১৪০৭ হি ।

সম্পাদনা পরিষদ সংকলিত ও সম্পা. : *সীরাত বিশ্বকোষ, হযরত মুহাম্মাদ (স)*, ৪র্থ খ
ঢাকা : ই ফা বা, ২০০২ ।

: *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২০ খ
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৯৬ ।

: *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খ
ঢাকা : ই ফা বা, ২য় সং, ১৯৮৭ ।

হরিহর শেঠ : *পুরাতনী*
চন্দন নগর, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ ।

Dhaka University Institutional Repository

হাসান আবদুল কাইয়ুম সম্পা. : *সীরাত স্মরণিকা* ১৪১৪ হি।

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা : ২:৪ এপ্রিল-জুন, ১৯৬৪ ।
৩:৩ জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৬৪ ।
৩:৪ এপ্রিল-জুন, ১৯৬৪ ।
৪:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ ।
৪:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৬৪ ।
৬:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৬৬ ।
৬:৩ জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৬৭ ।
৮:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ ।
৮:৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭০ ।
৯:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭০ ।
১০:৩-৪ জানুয়ারী-জুন ১৯৭২ ।
১৬:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ ।
১৭:১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৭ ।
১৮:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৭৯ ।
১৯:১-২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৯ ।
২১:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ ।
২১:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮১ ।
২২:৩-৪ জানুয়ারী-জুন, ১৯৮৩ ।
২৪:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৪ ।
২৪:৩ জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৫ ।
২৬:৩ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৭ ।
৩১:২ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৩ ।
৩৭:৪ এপ্রিল-জুন, ১৯৯৮ ।
৩৮:১ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ ।
৩৮:৩ জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৯ ।
৪৩:৪ এপ্রিল-জুন, ২০০৪ ।

অগ্রপথিক
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) সংখ্যা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ : ১৪১৬ হি, আগস্ট ১৯৯৫ ।
১৪১৭ হি, জুলাই ১৯৯৬ ।
১৪১৮ হি, জুলাই ১৯৯৭ ।
১৪১৯ হি, জুলাই ১৯৯৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৪২০ হি, জুন ১৯৯৯ ।
১৪২১ হি, জুন ২০০০ ।
১৪২২ হি, জুন ২০০১ ।

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ : ১৪০৭ হি, ১৪ নভেম্বর ১৯৮৬ ।
১৪১৪ হি, আগস্ট ১৯৯৩ ।
১৪১৫ হি, আগস্ট ১৯৯৪ ।
১৪১৬ হি, আগস্ট ১৯৯৫ ।
১৪১৭ হি, জুলাই ১৯৯৬ ।
১৪১৮ হি, জুলাই ১৯৯৭ ।
১৪১৯ হি, জুলাই ১৯৯৮ ।
১৪২০ হি, জুন ১৯৯৯ ।
১৪২১ হি, জুন ২০০০ ।
১৪২২ হি, জুন ২০০১ ।
১৪২৪ হি, ২০০৩ ।
১৪২৮ হি, ২০০৭ ।
১৪২৯ হি, ২০০৮ ।
১৪৩১ হি, ২০১০ ।
১৪৩২ হি, ২০১১ ।
১৪৩৩ হি, ২০১২ ।

সীরাতুন্নবী (সা) স্মারক
জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ : ১৪১৯ হি, ২৬ জুন ১৯৯৮ ।
১৪২০ হি, ২৬ জুন ১৯৯৯ ।
১৪২১ হি, ১৩ জুন ২০০০ ।
সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ ।
আগস্ট ১৯৯৪ ।
জুলাই ১৯৯৬ ।
জুলাই ১৯৯৭ ।
জুলাই ১৯৯৮ ।
জুন ২০০০ ।

Dhaka University Institutional Repository

মাসিক মদীনা
সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা : জুন ২০০১।
জুন ২০০২।
এপ্রিল ২০০৫।
এপ্রিল ২০০৬।
মার্চ ২০০৭।
মার্চ ২০০৮।
মার্চ ২০০৯।
ফেব্রুয়ারী ২০১০।
ফেব্রুয়ারী ২০১১।
ফেব্রুয়ারী ২০১২।

বাংলা একাডেমী পত্রিকা : ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮৭।
মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬।
মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭।
বৈশাখ ১৩৬৫।

মুসলিম জাহান : বর্ষ ৯, সংখ্যা ১২, ২৩-২৯ জুন ১৯৯৯।

মহানবী স্মরণিকা : ১৩৯৮-১৪১৯ হিজরী পর্যন্ত সব ক'টি সংখ্যা।

সাহিত্য পত্রিকা : শীত ১৩৭০।
ফাল্গুন ১৪০৩।
বর্ষা ১৩৬৬ [ঢা বি]।

মাহে নও : সেপ্টেম্বর ১৯৬০, ১৩৫৭ হি।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা : বৈশাখ ১৩২৫।

বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা : ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৬।

সাহিত্যিকী : ৭ম বর্ষ, বর্ষা-শরৎ ১৩৭৬।
১৭শ বর্ষ, শরৎ-বসন্ত ১৩৮৭।

ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা : ঢাকা : ১৩৭৪।

দীপ্ত শিখা : সীরাতুন্নবী স্মারক, ১৯৯৭।

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা : ১৯৯৯, তমদ্দুন মজলিস।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী স্মরণিকা : ১৯৭৮, বাংলাদেশ ইসলাম প্রচার সমিতি।

মাসিক তাহযীব : সীরাতুন্নবী সংখ্যা, ১৩৮৪।

মাসিক সপ্তডিঙা : খুলনা, ই ফা বা, ১৯৮২।

সীরাত স্মরণিকা : ১৪০৪ হিজরী
খুলনা ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

মাসিক পরওয়ানা : মার্চ ১৯৯৩।
জুন ২০০০।
এপ্রিল ২০০৭।

বিপরীত উচ্চারণ : সীরাতুন্নবী (সা) সংকলন, ১৯৯১ ও ১৯৯৩।

উম্মাহ্ ডাইজেস্ট : সীরাতুন্নবী (সা) ১৯৮৬।

সীরাত স্মরণিকা : ১৪০০ হি, স্বদেশ সুসমাজ সমিতি।

ঈদে মিলাদুন্নবী সাহিত্য সংকলন : ১৪২০ হি, আঞ্জুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ।

ঈদে মিলাদুন্নবী সাহিত্য সংকলন : ২০০১, ১৪২২ হিজরী।

নিউজ লেটার : ইরান দূতাবাস সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৫।

আল বাছায়ের : সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, ১৯৯৮।

মুহাম্মদ (সা) স্মারক : ঢাকা ট্রাস্ট, ২০০০।

মিলাদুন্নবী (সা) : ১৯৯৯, ই ফা বা কর্মকর্তা কল্যাণ সংস্থা।

মাসিক আল হক : মার্চ-২০০০, মার্চ-২০০৭।
চট্টগ্রাম দারুল মা'আরিফ।

মাসিক আর রশীদ : সীরাত সংখ্যা, ২০০০।

মাসিক আত তাওহীদ : সীরাত সংখ্যা, ২০০০।

আবে হায়াত (সীরাত সংকলন) : ২০০০।

আলোর ফুল (সীরাত সংকলন) : ১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

মাসিক কলম : জুন-১৯৯২ ।
নভেম্বর-১৯৮৮ ।
অক্টোবর-১৯৯৪ সংখ্যা ।

মাসিক কাবার পথে (সীরাতুন্নবী সংখ্যা) : জুন-২০০০ ।

মাসিক আদর্শ নারী : মার্চ-২০০৭ ।

মাসিক রহমানী পয়গাম : জুন-১৯৯৯; ১৪২৮ হিজরী ।

মাসিক আল কালাম : ১৪২১ হিজরী ।

ত্রৈমাসিক প্রেক্ষণ : এপ্রিল-জুন, ১৯৯৯ ।

প্রত্যয় : ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫, ১৯৯৬ সংখ্যা ।

মাসিক চিন্তা ভাবনা : জুন-২০০৩ ।